পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে পি-এইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসর্ন্দভ

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্য এবং ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

(bearing registration no 10015401111000004 of 2015)

গবেষক

শান্তনু দলাই

বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

২০২০

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত বাংলা বিভাগের অধীনে পি-এইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসর্ন্দভ

গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্য এবং ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

(bearing registration no 10015401111000004 of 2015)

গবেষক

শান্তনু দলাই

বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

২০২০

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
লক্ষ্যং বিশ্বমানম্
বেরুনানপুকুরিয়া, মালিকাপুর, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১২৬
বাংলা বিভাগ

স্মারক নং ....   তারিখ ....

Certificate from the Supervisor

This is certify that the thesis entitled "বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্য এবং ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা" submitted by Santanu Dalai, who got his name registered on October 2015, for the award of Ph.D. (Arts) degree of West Bengal State University is absolutely based upon his own work under the supervision of Professor Mohini Mohan Sardar, Professor & Head, Department of Bengali, West Bengal State University, Barasat, Kolkata-700126 and that neither his thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree or any other academic award anywhere before.

Signature of the Supervisor
(MOHINI MOHAN SARDAR)
Professor & Head,
Department of Bengali
West Bengal State University
Barasat, Kolkata-700126

Phone : 033 2524 - 1975, 033 2524 - 1976 ▪ Fax : 033 2524 - 1977 ▪ Email: wbsubregistration.org.

Declaration

I, Santanu Dalai, bearing Ph.D. registration no. 10015401111000004, dated - 30.10.2015, hereby declared that the work described in this thesis entitled "**বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্য এবং ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা**" is entirely my own work. No portion of the work referred to in this thesis has been submitted in support of an application for another degree or qualification of this or any other University or Institute. Any help or source information, with has been availed in the thesis, has been duly acknowledged.

(Santanu Dalai)
Ph.D. Scholar,
Dept. of Bengali,
West Bengal State University
Barasat, Kolkata - 700126

।। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ।।

আমার এই গবেষণার কাজে ঋণের বোঝা যথেষ্ট। আমার প্রণম্য শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপক মোহিনীমোহন সরদার -এর নিরন্তর উপদেশ ও পরামর্শ ছাড়া এই গবেষণাকর্মে সাফল্য পাওয়া অনিশ্চিত ছিল। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে প্রণাম জানাই।

বিশ্বভারতীর ওড়িয়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মনোরঞ্জন প্রধান, রিজিওনাল কলেজ ফর এডুকেশন, ভুবনেশ্বর -এর ওড়িয়া সাহিত্যের অধ্যাপক বসন্তকুমার পণ্ডা, কলকাতা আনন্দমোহন কলেজের ওড়িয়া বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা-প্রমুখের সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই কাজে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

স্বর্গীয় ঁবিষ্ণুপদ পাণ্ডার ছোট ভাই ভুবনেশ্বর নিবাসী শ্রী মুক্তিপদ পাণ্ডা এবং ঁবিষ্ণুপদ পাণ্ডার পুত্রগণ শ্রী বারিদবরণ পাণ্ডা, শ্রী তিমিরবরণ পাণ্ডা ও শ্রী নির্মলবরণ পাণ্ডা প্রমুখের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও আত্মীয়বৎ আতিথেয়তা আমাকে চিরঋণী করে রেখেছে। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কাঁথি নীহার প্রেসের বর্তমান কর্মকর্তা শ্রী নীতিন্দ্রনাথ জানা তাঁর সংগ্রহে থাকা দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা ও পুথি-পত্র দিয়ে এই কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই এগরা থানার নস্করপুর গ্রামের শ্রী ভুবনমোহন জানাকে। সাহিত্য সংগ্রাহক, প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতা শ্রী জানা গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাগুলি আমার হাতে তুলে দিয়ে সাহায্য করেছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য যখন আমি তাঁর বাড়ি গিয়েছি তখন তিনি গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত **'কাঁদনাগীতি'** গানগুলি নিজের গলায় গেয়ে আমাকে শুনিয়েছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। 'বিদিশা'র গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকা শ্রী মনোরঞ্জন ভৌমিককে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি নানা সময় মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি আমাকে পড়তে দিয়ে গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছেন।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভুবনেশ্বরে ‘ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা’র কর্তৃপক্ষ এবং পুথিশালার কর্মচারীবৃন্দকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। তাঁরা আমাকে ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের পুথিগুলি দেখার ও পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এছাড়া বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের এবং বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, জাতীয় গ্রন্থাগার, কন্টাই পাবলিক লাইব্রেরি, এগরা সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমি পেয়েছি। এগরা ‘অন্বেষা সাহিত্য গোষ্ঠী’-র সভাপতি শ্রী শান্তিপদ নন্দ এবং সদস্য শ্রী প্রণবকুমার পট্টনায়ককে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। এঁরা আমাকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গবেষণা সম্বন্ধীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি এবং বইপত্র সরবরাহ করে অশেষ উপকার করেছেন।

আমার কর্মক্ষেত্র তথা এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ দীপককুমার তামিলী-মহাশয়ের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে আমার গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়ে তিনি সেমিনারের আয়োজন করার অনুমোদন দিয়েছেন এবং নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি-বিদ্যা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র ঘোড়াই তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন। তাঁকে আমি প্রণাম জানাই।

আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান শুভদীপ এবং স্নেহভাজন নির্মল বল্লভ ডি.টি.পি.-র কাজে সহযোগিতা করেছে। তাদেরকে আমার স্নেহাশিষ জানাই। এছাড়া অনেকেই এই কাজে নানা সময় নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার সহধর্মিণী সোমা তার নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও সাহচর্য দিয়ে এই কাজে মনোবল যুগিয়েছে এবং কন্যা ঐশী ও উর্বীর স্নেহের বন্ধন আমার মনকে দিয়েছে ক্লান্তিহীন প্রফুল্লতা। তাদের ভালোবাসা আমাকে এই কাজে এগিয়ে রেখেছে সবসময়।

শান্তনু দলাই
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ
এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

।। প্রাক্‌কথন ।।

সাহিত্য শুধু সাহিত্যিকের সৃজনে বেঁচে থাকে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখে পাঠক, রসিক সমাজ ও তার সংস্কৃতি। কোনো সাহিত্যের ভাষা যদি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ না থেকে প্রাদেশিক গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লাভ করে তাহলে সেই সাহিত্য বহুগুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে। তাই সাহিত্যের দেশ বলতে যেমন কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে না; তেমনি ভাষাও অনেক সময় নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে তার অঞ্চল বৃদ্ধি করে।

ওড়িশা প্রান্তবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের মৌখিক ভাষা সম্পূর্ণভাবে ওড়িয়া না হলেও এই ভাষা সম্পূর্ণ বাংলা নয়। বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্রিত **'মেদিনীপুরিয়া ওড়িয়া'** নামে প্রচলিত। ভাষাবিদেরা যাকে 'মালঝিটা' উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন।[১] ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষাকে **'সূক্ষ্মক বাঙ্গলা'** বলেছেন।[২] এই অঞ্চলের মানুষেরা ওড়িয়া ভাষাকে মননের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। এলাকাটি প্রশাসনিকভাবে বাংলার সীমানাভুক্ত থাকায় স্বাভাবিক কারণে বাংলা ভাষার প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করলেও তাঁদের শিরা-উপশিরায় ওড়িয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাঁরা এযাবৎ বহন করে চলেছেন। এই আনুগত্য শিক্ষিত মানুষেরা প্রদর্শন করলেও বৃহৎ অংশের অক্ষরজ্ঞানহীন নারী তাঁদের অন্দরমহলের ঘরোয়া আড্ডায় এবং পুকুরঘাটে একান্ত আলাপনে এখনও ওড়িয়া মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কথা বলেন। কন্যাবিদায়ে, মৃত্যুশোকে, মঙ্গলগানে, পালাগানের সুরের মধ্যে ওড়িয়া ভাষার প্রলম্বিত করুণ সুরটি এখনও ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাই এইসব মানুষেরা সাবলীলভাবে না হলেও ওড়িয়া বলতে পারেন, বুঝতে পারেন, কেউ কেউ আবার লিখতে বা পড়তেও পারেন। অনেকের বাল্যকাল কেটেছে ওড়িশার পৈত্রিক ভিটেয় বা আত্মীয়ের বাড়িতে। আবার অনেকের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছিল ওড়িশার কোনো পাঠশালায়। বয়স্ক-বয়স্কাদের মুখে এখনও শোনা যায় ওড়িয়া ভাষার পৌরাণিক পাঁচালী, ভাগবত ইত্যাদির খণ্ডাংশ। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনেও তাই। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ও বৈবাহিক লোকাচার সর্বক্ষেত্রেই সেই উৎকলীয় রীতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ উপরোক্ত নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমগ্র সংস্কৃতিতেই আছে ওড়িয়া ভাষার নিদর্শন।

এই রকম আবহে বেঁচে আছে দ্বাদশ স্কন্দে মুদ্রিত বাংলা হরফের একটি ওড়িয়া ভাগবত গ্রন্থ, যার রচয়িতা জগন্নাথ দাস। এছাড়া প্রায় দু'শর মতো নানাবিধ ছোটো ছোটো মুদ্রিত পুস্তিকা আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘদিন এইসকল রচনা তালপাতার পুথিতে লিখিত ছিল। কাঁথিতে অবস্থিত **'নীহার'** নামক একটি ছাপাখানা সেইসব তালপাতার পুথি সংগ্রহ করে সেগুলিকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করে চলেছে। আমাদের আগ্রহ মূলত এই সমস্ত বাংলা হরফে লিখিত ওড়িয়া সাহিত্যের নিদর্শন উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ করা। এই অভিসন্দর্ভে যথাসাধ্য তা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি।

শুধু বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্য নয়, ওড়িশা সন্নিকটস্থ মেদিনীপুরের প্রান্তীয় অঞ্চলে ও সীমান্তবর্তী ওড়িশার মূল ভূভাগে ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন— রামানন্দের ভনিতায় **'ব্রজবুলি গীতা'**, **'কৃষ্ণলীলা'** ইত্যাদি। জগন্নাথ দাসের ভণিতায় **'গঙ্গা মাহাত্ম্য'**, অনন্ত দাস রচিত **'ভজন তত্ত্ব'**, বলরাম দাস রচিত **'জগমোহন রামায়ণ'**, ধনঞ্জয় ভঞ্জ রচিত **'দ্বারিকা পালা'**, দ্বারিকা দাসের **'মনসামঙ্গল'** এবং কবি কর্ণের বেশ কয়েকটি পালা। এছাড়া পাওয়া যায় দ্বিজ রঘুরাম রচিত **'জয়ানন্দ পালা'**, কবি রঘুনাথ দাস রচিত **'ভুবনমঙ্গল'**, সনাতন কবি ভণিতায় রচিত **'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন'**, পিণ্ডিক শ্রীচন্দন রচিত **'বসন্তরাস'** ইত্যাদি কাব্য। বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভে এই জাতীয় ওড়িয়া হরফে রচিত বাংলা সাহিত্যেরও অনুসন্ধান এবং তার পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের তুলনামূলক চর্চা অসম্পূর্ণ বলে আমরা মনে করি। তাই আমাদের কাজের পরিধির মধ্যে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যে রবীন্দ্রচর্চা কীভাবে হয়ে আসছে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ, রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা ওড়িয়া ভাষায় কীরূপে ও কীভাবে চলছে এই অভিসন্দর্ভে তার একটি বিবরণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। মূলত বিশ্বকবির নোবেল প্রাপ্তির পর থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি আমরা।

ওড়িয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার অন্যতম কারণ দুটি ভিন্ন লিপি। ওড়িয়া কাব্যাংশ ও উদ্ধৃতিগুলিকে বাংলা হরফে প্রকাশ করতে গিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমাদের সুবিধার জন্য সরলীকরণ করা হয়েছে। এতে ওড়িয়া পাঠকের অসুবিধা হলেও বাঙালি পাঠক প্রাঞ্জলতা অনুভব করবেন। সরলীকরণটি হল- ওড়িয়া ভাষায় দুটি 'ল'- কার আছে, একটি আমাদের পরিচিত 'দন্ত্য' ল -কার আরেকটি ওড়িয়া ভাষায় বিশিষ্ট অতিরিক্ত 'মূর্ধন্য' ল-কার। 'মূর্ধন্য' ল-কারের জন্য পৃথক হরফের ব্যবস্থা বাংলা হরফে নেই বলে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত ওড়িয়া ভাষার কাব্যাংশে ও উদ্ধৃতাংশে দুই 'ল'-কারের পার্থক্য করা যায়নি। এছাড়া দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে ওড়িয়া কাব্যাংশগুলির সমান্তরালে ছন্দ ও মাত্রার সমতা রেখে গবেষকের দ্বারা বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে এবং বাঙালি পাঠকের কাছে সুবোধ্য করে তোলার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ওড়িয়াতে লেখা উদ্ধৃতাংশকে বঙ্গানুবাদ করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে 'সংসদ বাংলা অভিধান' নির্ভর আধুনিক বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে।

জন্মসূত্রে ওড়িশার সন্নিহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম ও তার সংস্কৃতি আমাদের পূর্ব পরিচিত। এই অঞ্চলের সংস্কৃতিকে যতই দেখেছি, যতই ভাব-ভালোবাসা ও মনন দিয়ে বুঝেছি ততই এই অঞ্চলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা মায়ের প্রতি ভালোবাসার মতো নিবিড় হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র রূপে সাহিত্যের এইরূপ একটি অনালোচিত ধারা চর্চার তাগিদ অনুভব করেছি বার বার। সাহিত্যবাসরে এইরূপ একটি ধারার পরিচয়টি যাতে মোহরাঙ্কিত হতে পারে সেই ইচ্ছায় এই গবেষণা কর্মে ব্রতী হয়েছি আমরা।

তাং ঃ

শান্তনু দলাই
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ
এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্য এবং ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ **বঙ্গ ও ওড়িয়া সংস্কৃতির আবহে সৃষ্ট সাহিত্য ঃ অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা** ৬ - ২৯

ক. মৌখিক ভাষা

খ. অতীত ইতিহাস

গ. ভাষা আন্দোলন, ধর্ম ও সাহিত্য

ঘ. নীহার প্রেস ও প্রকাশনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ **বাংলা হরফে ওড়িয়া অনুবাদ সাহিত্য ঃ পরিচয় অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণ** ৩০ - ৯৫

ক. রামায়ণের অনুবাদ

খ. মহাভারতের অনুবাদ

গ. ভাগবতের অনুবাদ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ **বাংলা হরফে ওড়িয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা ঃ বিবরণ উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা** ৯৬ - ১৩৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ **বাংলা হরফে প্রাপ্ত ওড়িয়া লৌকিক বিষয়বস্তু নির্ভর সাহিত্য ঃ লোকসাহিত্যের ভিন্নধারার লিখিত রূপের পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ** ১৪০ - ২২৬

ক. সমসাময়িক ঘটনা, অবৈধ সম্পর্ক ও প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য।

খ. জনপ্রিয় পূজা ও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সাহিত্য।

গ. নারির সমস্যাকেন্দ্রিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ **ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্য ঃ পরিচয় উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা** **২২৭ -২৮১**

ক. ষোড়শ শতকের কবি ও কাব্য

খ. সপ্তদশ শতকের কবি ও কাব্য

গ. অষ্টাদশ শতকের কবি ও কাব্য

ঘ. উনবিংশ শতকের কবি ও কাব্য

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ **ওড়িয়া হরফে রবীন্দ্রসাহিত্য ঃ বিবরণ উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ** **২৮২ - ৩১৭**

ক. ওড়িশায় রবীন্দ্রনাথ

খ. ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব

গ. রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ

ঘ. ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল্যায়ন

ঙ. ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলির কালানুক্রমিক তালিকা

চ. ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থাবলির কালানুক্রমিক তালিকা

ছ. ওড়িয়া ‘সবুজ যুগ’ -এর সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব

সপ্তম অধ্যায় ঃ **ফলকথা ঃ এইকালে এই জাতীয় সাহিত্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা** **৩১৮ - ৩২৭**

পরিশিষ্ট ঃ **(গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের প্রতিলিপি, আলোকচিত্র, ফটোকপি ইত্যাদি)** **৩২৮ - ৩৫৩**

গ্রন্থপঞ্জি ঃ **(আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা)** **৩৫৪ - ৩৬৮**

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গ ও ওড়িয়া সংস্কৃতির আবহে সৃষ্ট সাহিত্য ঃ অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

ক. মৌখিক ভাষা

খ. অতীত ইতিহাস

গ. ভাষা আন্দোলন, ধর্ম ও সাহিত্য

ঘ. নীহার প্রেস ও প্রকাশনা

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গ ও ওড়িয়া সংস্কৃতির আবহে সৃষ্ট সাহিত্য : অনুসন্ধান ও তার পর্যালোচনা

(ক)

(মৌখিক ভাষা)

বঙ্গ ভূখণ্ডে ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষের অবস্থান আছে — একথা অধিক সংখ্যক বাঙালি অবগত আছেন। প্রান্তবঙ্গের একটি জেলা মেদিনীপুর। ওড়িশা সংলগ্ন জেলা বলে এই জেলার অভ্যন্তরে ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষের বসবাস লক্ষ্যণীয়। যেহেতু এই জনগোষ্ঠীর ভাষা ওড়িয়া সুতরাং বাংলার মূল ভূখণ্ডেও ভিন্ন এক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আছে প্রথমে এটা স্বীকার করে নিতে হয়। এই ভিন্ন স্বাদের সংস্কৃতির মধ্যে সাহিত্যের যে একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে আমরা আলোচ্য গবেষণাকার্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারি। আমরা জানি দুটি প্রতিবেশী ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার আদান-প্রদান চলতে থাকে। একে অপরের ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে এবং নিজেকে প্রকাশ করে। বাংলা ভাষার সহোদরা হল ওড়িয়া ভাষা। সাধারণভাবে দুই সন্তানের বিচরণ ভূমি একই হওয়া কোন দোষের নয়। ভাই-এ ভাই-এ পৈত্রিক ভিটে যতই বেড়া দেওয়া থাকুক না কেন — আসলে একই বাস্তুভিটের দুটি অংশ ভাগ। সুতরাং বাংলা ও ওড়িশার ভৌগোলিক বিভাজন বর্তমান কালে প্রকট হলেও একটি সময় পর্যন্ত উভয় ভূখণ্ডের অভিন্ন মানচিত্র ছিল। আমরা বাংলা ভাষিকবৃত্তে বাস করে বাংলাকে মাতৃভাষা রূপে মেনে চলতে বাধ্য হয়েছি। প্রান্তিক মেদিনীপুরকে যদি খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করা যায়, তাহলে ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুর তথা কাঁথি, রামনগর, এগরা ইত্যাদি প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ একটি স্বতন্ত্র ভাষাবৃত্তে লালন-পালন হয়ে আসছে। সরকারিভাবে প্রশাসনিক অনুশাসনে বাংলাকে মাতৃভাষা রূপে মেনে চলতে হয়। রুজি-রোজগার, শিক্ষা-দীক্ষা, পেশা-প্রাপ্তি নির্বাহের জন্য বাংলা এই অঞ্চলের মাতৃভাষা ঠিক যশোদা মায়ের মতো। কিন্তু নাড়ির যোগ যে ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে। তাকে এত সহজে ভোলা যায় না। নিয়তির বিড়ম্বনায় (প্রশাসনিক নির্দেশে) বহুবার বাংলা ও ওড়িশার মধ্যে সীমানা নাড়ানাড়ি হয়েছে, সীমারেখা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশিত হয়েছে — কিন্তু মানুষের মন ও মুখ থেকে মাতৃভাষাকে নিঃশেষ করতে পারেনি। কোন সরকারি পদক্ষেপ মানুষের মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিতে পারেনি— ইতিহাস তার প্রমাণ। সুতরাং এই বঙ্গভাষিক বৃত্তের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তিক সত্তা এখনও বিরাজমান।

কোন ভাষার প্রান্তিক বিমিশ্রণকে স্বীকার করে নিয়ে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিমত দিয়েছেন এইরূপ—

> *"আজকাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন, — সম্পূর্ণ স্বাজাত্যবোধ আসা একরকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জনসমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে একরাজ্য পাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষাগত বৈষম্য থাকিলে, ওতপ্রোতভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনে সংঘবদ্ধ বিবিধ ভাষাভাষী একাধিক জন-সমষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহেনা বা পারেনা।"*[১]

সুতরাং বাংলা ভাষার এই প্রান্তিক সত্তা ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের ভাষার মধ্যে বিরাজমান। ওড়িশা প্রান্তবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের মৌখিক ভাষা সম্পূর্ণভাবে ওড়িয়া না হলেও পুরোপুরি বাংলা নয়। বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্রিত '**মেদিনীপুরিয়া ওড়িয়া**' নামে প্রচলিত।

এই অধ্যায়ে ওড়িশা প্রান্তবঙ্গের অঞ্চলসমূহের অতীত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সাহিত্যচর্চার স্বরূপ আলোচিত হবে। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বিন্যাস করে নিম্নোক্ত আলোচনায় তার পর্যায়ক্রমিক বিবরণ ফুটিয়ে তুলতে চাই।

(খ)
(অতীত ইতিহাস)

বাংলা ও ওড়িশার যোগসূত্র সুদূর অতীতকাল থেকে অদ্যবধি বহমান। এই যোগসূত্র রাজনৈতিক আক্রমণ, রাজ্য স্থাপন, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ, বসতি স্থাপন, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ — প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার প্রান্তীয় মেদিনীপুর অঞ্চল স্বাভাবিকভাবে ওড়িয়া সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট এবং একটি নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক।

"পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা পাঁজি' বা 'মাদলা পঞ্জী' যা কটকের প্রাচী প্রকাশনী থেকে আর্তবল্লভ মহান্তির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন গজপতি সম্রাটদের রাজত্বকালে উড়িষ্যা ৩১টি দণ্ডপাটে ও ১১০টি বিশিতে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে উত্তর উড়িষ্যার ৬টি দণ্ডপাট যথা (১) টানিয়া, (২) জৌলুতি (৩) নারায়ণপুর (৪) নুঁয়াগাঁ (৫) মালঝিটা ও (৬) ভঞ্জভূম-বারিপাদা—এই ৬টি দণ্ডপাট অধুনা মেদিনীপুরের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রচলিত আছে রাজা অনঙ্গভীমদেব কংসাবতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে খাজনা আদায় করতেন।"[২ক]

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই চারশ' বছর ওড়িশার গঙ্গোবংশ ও সূর্যবংশ রাজত্ব করেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর তথা গাঙ্গেয় মেদিনীপুর এই গঙ্গো এবং সূর্যবংশের অধীনে ছিল। ১৫৬৮ খ্রিঃ সুরেমান কররানির ওড়িশা জয়ের পর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে মেদিনীপুর জেলা থেকে ওড়িয়া আধিপত্য উঠে যায়। পরবর্তীকালে মোগল সম্রাট আকবর থেকে জাহাঙ্গীর-এর রাজত্বকাল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার বেশিরভাগ এলাকা ওড়িশার সুবার অন্তর্ভূক্ত ছিল। আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমল বাংলা, বিহার ও ওড়িশাকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি মহালে ভাগ করেন। ওড়িশার ৫টি সরকারের মধ্যে জলেশ্বর সরকার ছিল অন্যতম। এবং জলেশ্বর সরকারের ২৮টি মহালের মধ্যে অন্তত ২৩-২৪টি মহাল জলেশ্বর সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ছিল।

আকবরের আমলে রাজস্থানী অর্থমন্ত্রী টোডরমল ১৫৮২ খ্রিঃ যে খাজনা বিলি বন্দোবস্ত করেন তাতে এইরূপ সরকার ও মহাল বিন্যাসের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের **'আইন-ই-আকবরী'** গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে। আকবর থেকে জাহাঙ্গীর পর্যন্ত বাংলা ও ওড়িশার ভৌগোলিক মানচিত্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে কোন পরিবর্তন বা বদল হয়নি। **'আইন-ই-আকবরী'** গ্রন্থেও অন্তত এইরূপ তথ্য পাওয়া যায়। সেই সূত্রে আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মেদিনীপুরের কোন সীমানা পরিবর্তন হয়নি।[২খ]

এরপর বাংলা ও ওড়িশার সীমানা পরিবর্তন হয়েছিল শাহজাহানের সময়। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র কুমার মুহম্মদ সুজা ১৬৪৬ - ৫৮ (মতান্তরে ১৬৩৯ - ৫৯) বাংলা ও ওড়িশার শাসনকর্তা

হলেন। এতদিন ওড়িশা দিল্লির বাদশাহের শাসনাধীনে থাকার পর এই প্রথম ওড়িশার জলেশ্বর সরকারকে (আকবর শাসনকলে প্রচলিত জলেশ্বর সরকার) ৬টি ক্ষুদ্রায়তন সরকারে বিভক্ত করা হয়। তারমধ্যে অন্যতম ৩টি সরকারকে নিয়ে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ গঠিত হয়, যথা– (১) মালঝিটা (২) মুজকুরি ও (৩) জলেশ্বর। **মালঝিটা :** কাঁথি মহকুমার উত্তর-পূর্বাংশ কাঁথি ও খেজুরী থানা, **মুজকুরি :** রামনগর থানা ও বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ, **জলেশ্বর :** দাঁতন ও এগরা থানা ও বালেশ্বর জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। মেদিনীপুরের সীমানার মধ্যে অতীতে জলেশ্বর অন্তর্ভূক্ত ছিল (**দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ২ মানচিত্র 'ক'**)। এইরূপ পাঠান ও মোগল যুগে ওড়িশা ও বাংলার প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে নিয়ে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয়। সমগ্র বাংলা কিংবা ওড়িশার একটি ক্ষুদ্র প্রান্তিক অঞ্চল রূপে থাকার ফলে প্রশাসকের যত্নহীন অবস্থায় এই অঞ্চল দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকে।

এরপর ১৭২২ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১১-২৭) রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনে সমগ্র বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও প্রতি চাকলাকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পূর্বাংশ হিজলী চাকলায় এবং মধ্য অংশ মেদিনীপুর চাকলার মধ্যে পড়ে। হিজলী চাকলায় অন্তর্ভূক্ত হয় মুজকুরি ও জলেশ্বর সরকারের অবশিষ্টাংশ।

১৭৫১ সালে আলিবর্দির আমলে মেদিনীপুরের প্রান্তবঙ্গীয় অঞ্চল তথা ওড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পুনরায় ওড়িশাকে প্রত্যার্পণ করা হয়। তখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ইতিহাসে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। মারাঠা দস্যুর আক্রমণ এবং মারাঠাদের ঠেকাতে গিয়ে আলিবর্দির সঙ্গে মারাঠাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণে ওড়িশায় মারাঠারা আধিপত্য করবে এবং নদীর উত্তরাঞ্চল আলিবর্দির শাসনাধীনে থাকবে। আলিবর্দি খাঁ প্রতি বছর বাংলাদেশের চৌথ হিসেবে ১২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও করেন। মারাঠারা এই চুক্তি স্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কোম্পানির আমলে মারাঠারাও কোম্পানির অধিকারে ঢুকে লুণ্ঠন চালাত। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের রাজা ও স্থানীয় ভূস্বামীরা এই লুণ্ঠনে সহায়ক ছিল। অবশেষে ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে মীরকাশিমের নবাবী লাভের শর্তে ওড়িশা অন্তর্ভূক্ত মেদিনীপুর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ১৭৭৬ রেনেলের মানচিত্র অনুযায়ী জানা যায় মেদিনীপুরের সীমারেখা ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত

ছিল। অধুনা জলেশ্বর ও বলেশ্বরের বৃহৎ অংশকে নিয়ে কোম্পানির আমলে মেদিনীপুর জেলা বিস্তৃত ছিল (**দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ২ মানচিত্র 'ক'**)।

নবাবী আমলে মেদিনীপুরের পূর্বভাগ ছিল চাকলা হিজলী, মধ্যভাগ চাকলা মেদিনীপুর এবং পশ্চিমভাগ চাকলা ঝাড়গ্রাম বলে পরিচিত ছিল। এই চাকলাগুলোকে অনুকরণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে জেলা গঠিত হয়। সেই সূত্রে হিজলী ও মেদিনীপুর দুটি পৃথক জেলা ছিল। ১৮৬৩ সালে হিজলী জেলা মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং আরো পরবর্তীকালে ঝাড়গ্রামও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে।

এই অখণ্ড মেদিনীপুরের মধ্যে ১৮৫২ সালে কাঁথি মহকুমার সৃষ্টি হয়। কাঁথি, রামনগর, পটাশপুর, ভগবানপুর, খেজুরী ও এগরা — এই ৬টি থানা নিয়ে কাঁথি মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সালে রামনগর থানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দীঘা থানা তৈরী হয়। ২০০০ সালে কাঁথি মহকুমা থেকে স্বতন্ত্র এগরা মহকুমা গঠিত হয়। বর্তমান ওড়িশা সংলগ্ন প্রান্তবঙ্গের কিছুটা অংশ পূর্ব মেদিনীপুর জেলাভুক্ত এবং কিছুটা অংশ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাভুক্ত। বাংলার বিস্তৃত এই অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ওড়িশার অঞ্চলের জনজীবনের আস্বাদ্য সাহিত্যের নিদর্শনগুলি নির্বাচন করে নিয়ে গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি।

(গ)
(ভাষা আন্দোলন, ধর্ম ও সাহিত্য)

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা তথা দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর এলাকাটি ওড়িশা সংলগ্ন ভূ-ভাগ। কালে কালে বাংলা ও ওড়িশায় ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

> *"বিশ শতকের তিনের দশকে মেদিনীপুরের একটি আন্দোলন দানা বাঁধে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষেরা চেয়েছিল মেদিনীপুরের ওড়িয়াভাষী অঞ্চল যা ১৭৫১ সালে আলিবর্দির আমলে ওড়িশাকে দেওয়া হয়েছিল সেই অঞ্চল ওড়িশাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক। সেই সময়ে বাদ-প্রতিবাদের ভেতর এই আন্দোলন চাপা পড়ে যায়।"*[৫]

ভাষাগত জাতীয়তাবোধ ছাই চাপা আগুনের মতো ছিল যা সম্পূর্ণ জ্বলে উঠতে পারেনি। এই আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে। এই আন্দোলনে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন ভাগবতচন্দ্র দাশ। ১৮৭৫ সালে অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার মোগলমারি বৌদ্ধবিহারের কাছে তররুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ভাগবতচন্দ্র। মেদিনীপুর কলেজে পড়ার সময় বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নানাবিধ সমাজ সংস্কারের কাজে লেগে পড়েন। আইন পাশ করে ওকালতির পেশাকে বেছে নিলেও সমাজ সেবাই ছিল তাঁর মূল ব্রত। **'ধূর্জটিপ্রসাদ বুদবুদ'** ছদ্মনামে তিনি ব্যঙ্গসাহিত্য রচনা করে সমাজের কুসংস্কারকে বিদ্রুপ করতেন। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলি প্রতিবছর ১লা বৈশাখে তিনি **'নব পঞ্জিকা'** শিরোনামে প্রকাশ করতেন।

বিশ শতকের তিনের দশকে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের অধিকার নিয়ে বাংলা ও ওড়িশার মধ্যে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ওড়িশার পক্ষ হয়ে আদালতে ওকালতি করেন ভাগবতচন্দ্র দাশ। বিশ শতকের শুরু দিকেও কাঁথি থেকে দাঁতন ও গোপীবল্লভপুর পর্যন্ত মানুষের মুখের ভাষা ছিল ওড়িয়া। ময়ূরভঞ্জ জেলার পার্শ্ববর্তী বিহারের সিংভূম জেলার বৃহৎ এলাকার মাতৃভাষা ছিল ওড়িয়া। "**এই কারণে ওড়িশার ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, কেশিয়াড়ি, দাঁতন, মোহনপুর, কাঁথি, এগরা, রামনগর প্রভৃতি থানাকে ওড়িশার অন্তর্ভূক্ত করার দাবি জানান।**"[৮] মেদিনীপুরের মাটিতে জন্মালেও ভাগবতচন্দ্র উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান এবং তাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া। তিনি ওড়িয়া কবি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোদাবরীশ মিশ্রের সাথে সখ্যতা রেখে মেদিনীপুরের উল্লিখিত অঞ্চলগুলিকে ওড়িশার মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তির জন্য জনমত তৈরী করার চেষ্টা করেন এবং নানা জায়গায় সভা করেন। তাঁর এই আন্দোলনের স্বরূপটি **'আনন্দবজার পত্রিকা-র'** প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে এইভাবে —

> ***"ওড়িশার দাবি বিচারের জন্য ব্রিটিশ সরকার স্যার স্যামুয়েল, ওডোনেল, এইচ এন মেটা এবং টি. আর. ফুকনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। অন্যদিকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করার এই দাবীর বিরোধিতা করে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। স্যামুয়েল ও ওডোনেল কমিটি মেদিনীপুরে ১৯৩১ সালে ৮, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। কমিটির সামনে ওই অঞ্চলগুলোর ওড়িশা ভুক্তির পক্ষে সওয়াল করেন ভাগবতচন্দ্র।***

বিপক্ষে সওয়াল করেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। উভয়পক্ষের কথা শোনার পর কমিটি মেদিনীপুরের বা সিংভূমের কোনও অংশ ওড়িশার সঙ্গে সংযুক্ত না করার কথা ব্রিটিশ সরকারকে জানায়। ভুবনেশ্বরের মহাফেজখানায় ভাগবতচন্দ্রের লেখা চিঠিগুলো রক্ষিত আছে। কিন্তু ভাগবতচন্দ্রকে লেখা গোদাবরীশ মিশ্রের চিঠিগুলোর হদিশ আজ আর পাওয়া যায় না।"[৫]

অপরপক্ষে ওড়িশায়ও ওড়িয়া ভাষাকে রক্ষা করার জন্য বিশ শতকের প্রথম দশকে একটি বৃহত্তর আন্দোলন দানা বাঁধে। এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র বা হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দের মতোই ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যে ফকিরমোহনের অবদান অনস্বীকার্য। উনিশ শতকে বহু উচ্চশিক্ষিত বাঙালি ওড়িশার সরকারি দপ্তরগুলিতে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। অনেক বাঙালি ওড়িয়াকে তখন পৃথক ভাষার সম্মান দিতে নারাজ। সেই সময় ফকিরমোহন কী শুনিয়েছিলেন '**আনন্দবাজার পত্রিকা**'র একটি প্রতিবেদন;

"বালেশ্বরের একপ্রভাবশালী জমিদারের কাছারি ঘরে বাঙালি বাবুদের বৈঠকে 'আজকাল' প্রধান আলোচ্য বিষয় হল কী উপায়ে সরকারি অফিসগুলো থেকে ওড়িয়া তুলে দিয়ে বাংলা ভাষার প্রচলন করা যায়। এবং বাঙালিদের সঙ্গে তর্কবিতর্কের জন্য কেমন করে তিনি বাঙালি সমাজে 'পরমশত্রু' হয়ে পড়ে ছিলেন। বাঙালি বাবুরা ঘৃণাবলে তাঁর নামটি পর্যন্ত করতেন না।"[৬]

ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী শহর তখন কলকাতা। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ বাঙালি প্রশাসনিক চাকরি নিয়ে প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে বেশ জমিয়ে বসেছিলেন। ওড়িশায় বসবাসকারী বাঙালিরাও বাংলা ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। ওড়িশায় তখন থেকে শুরু হলো ভাষা আন্দোলন। বাংলায় লেখাপড়া শিখে বাঙালির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো শক্তি ওড়িশাবাসীর সেদিন ছিলনা। ফকিরমোহন দেখলেন দেশের ঘোরতর সংকট। তিনিও যোগ দিলেন ভাষা আন্দোলনে।

"ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত ছিল ওড়িশার স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের বিরোধিতা। ইংরেজ আমলে প্রশাসনিক কাজকর্ম যে আয়ের এক

নিরাপদ উৎস তা ওড়িশাবাসীরাও বুঝতে ভুল করেননি। তাঁদের মনে হয়েছিল বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকলে ওড়িয়াদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা শক্ত হবে এবং ফলত সরকারি চাকরির দরজাও বন্ধ থাকবে। এবং বাঙালিরাই স্থায়ীভাবে তখন সর্বত্র আধিপত্য করে যাবেন।”[৭]

এই সমস্ত কারণ থেকেই ওড়িশায় ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।

ওড়িয়া ভাষা রক্ষার জন্য ফকিরমোহনের আন্দোলন শুধু যে বাংলা ভাষার আধিপত্যজনিত যন্ত্রণা থেকে তা কিন্তু নয়। বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি দেখে তিনি মাতৃভাষা ওড়িয়ার সমৃদ্ধি সাধনে আত্মনিমগ্ন হন। আমরা জানি বাংলা ও ওড়িশা এই দুই প্রতিবেশি রাজ্যের আন্তসম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাষাই কখনও উত্তাপ সৃষ্টি করেছে, আবার সেই ভাষায় রচিত সাহিত্যই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ফকিরমোহন জানিয়েছেন যে —

“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের বইপত্র প্রকাশিত হলে বাংলা ও ওড়িশার স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর হয়েছিল। আবার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’, ‘সোমপ্রকাশ’ বা ‘এডুকেশন গেজেট’ দেখে অজ্ঞাতসারে আমার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত, ভাবতাম কবে উৎকল ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তক বেরুবে।”[৮]

সুতরাং বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধতম রূপ দেখে যেমন তিনি ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন অপরদিকে ওড়িয়া ভাষার প্রতি বাঙালি বাবুদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য তাঁর মনে আর পাঁচজন ওড়িয়া যুবকের মতোই গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই দুটি কারণে ওড়িয়া ভাষা রক্ষার জন্য তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

“ফকিরমোহন কখনও বাংলাকে উপনিবেশের ভাষা বলে মনে করেননি। স্থানীয় সমস্যার প্রতিকারে ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন ফকিরমোহন। অবশ্যই বাংলা ভাষায়। উপনিবেশের প্রতিনিধি বাঙালি যখন থেকে ওড়িশায় বাংলা ভাষার উপনিবেশ গড়তে চাইলেন তখনই গোলমাল শুরু হলো। গৌরিশঙ্কর রায় বা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট বাঙালিরা

ওড়িয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন বাঙালির মুখরক্ষাই বোধ হয় করেছিলেন।”[৯]

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। অন্য একজন উৎকলবাসী বঙ্গ সন্তান গৌরীশঙ্কর রায় ছিলেন ‘উৎকলদীপিকা’ পত্রিকার সম্পাদক তিনি ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে ওড়িয়া ভাষাকে ন্যায্য সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন আর ভাষাভিত্তিক জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার যে আহ্বান শুরু হয়েছিল তার পুরোভাগে নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন। এছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ওড়িয়া ভক্তি উপাখ্যান অবলম্বনে তাঁর ‘কাঞ্চীকাবেরী’ কাব্যটি রচনা করলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূত্রে ওড়িশায় বসবাস করতেন। বাঙালির সাথে ওড়িয়া ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুনতর আত্মীকতা শুরু হয় এই সময় থেকে। এই সময় ওড়িয়া কবি রাধানাথ রায় বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করলেন। তাঁর দুই খণ্ডে রচিত বাংলা কাব্য **‘কবিতাবলী’** ১৮৭১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এই কবির আর একটি বাংলা কাব্য ‘লেখাবলী’ কাব্যটি মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য **‘বীরাঙ্গনাকাব্য’**-এর অনুকরণে রচিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে ওড়িয়া সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন কবি রাধানাথ রায়। তাঁর **‘মহাযাত্রা’** (১৮৯২) কাব্যটি মহাভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে নির্মিত। কাব্যটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আজীবন বন্ধু ওড়িয়া কবি মধুসূদন রাও মূল্যায়ণ করেছে এইরূপ—

> *“উৎকল কাব্যরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের এহি প্রথম শুভ প্রয়াস। এহি পূর্বে বঙ্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গলা পদ্যর প্রকৃতি ও নিয়ম আলোচনা করি এই ছন্দকুপ্রবর্তন করি থিলে। কবি রাধানাথঙ্কু ছাড়া অন্য কৌনসি উৎকলীয় লেখক এই ছন্দকু যথাযথ প্রয়োগ বিষয়রে দক্ষতা দেখাই পারন্তে নাহি।”*[১০]

দীনবন্ধু মিত্রের **‘সুরধনীকাব্য’** ও বঙ্কিমচন্দ্রের **‘সীতারাম’** উপন্যাসে উৎকলীয় সংস্কৃতি ও উৎকলীয় স্থাপত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন পাই। অপরদিকে ফকিরমোহন সেনাপতি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে ভোলেননি যে,

> *“আমরা বালেশ্বরবাসীরা বাঙালি বাবুদের সংশ্রবে এসে সভ্যতা, সাধু ব্যবহার, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছি।”*[১১]

এছাড়া আমাদের সকলেরই জানা যে, বিশ শতকের বাঙালি কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ওড়িয়া সাহিত্য সাধনায় অনেক অবদান রেখে গেছেন।

ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে ঠাকুরবাড়ির সদস্যগণের এবং রবীন্দ্রনাথের কতখানি অবদান ছিল তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এই গবেষণাপত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সুতরাং উনিশ শতক থেকে শুরু করে সমগ্র বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকেও বাংলা সাহিত্য ও ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতার আদান-প্রদান চলে আসছে একথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওড়িশায় বাংলা ভাষা বিরোধী আন্দোলন তথা ওড়িয়া ভাষা রক্ষার জন্য একটি আন্দোলন গড়ে উঠলেও দুই প্রদেশের মনোভূমি একাকার হয়ে আছে শ্রীক্ষেত্র সৃষ্টির কাল থেকে। এই মনোভূমিতে ষোড়শ শতকে যুগাবতার শ্রীচৈতন্যের ধর্মীয় উপপ্লবের দ্বারা নতুন করে পলির প্রস্তরণ পড়ে। ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্যদেব তথা নিমাই পণ্ডিত্যের স্পর্শে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ওড়িশাবাসী কবিকুলের লেখনীতে যেভাবে ওড়িয়া হরফে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্বাপর অনুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত ওড়িয়া ভাষিকবৃত্তে কিরূপে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছে বা ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালির সহানুমর্মিতা ও সাহিত্যপ্রীতি কতখানি তা আলোচিত হলো। কিন্তু বাংলা ভাষিকবৃত্তে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মূল ভূখণ্ডে স্থিত দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে (**দ্রষ্টব্য, পরিশিষ্ট ২ মানচিত্র ‘খ’**) বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্যের চর্চা যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে। ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরে ওড়িয়া আত্মস্থ বাঙালির যে ওড়িয়া সাহিত্যচর্চা তা মুষ্টিমেয় বাঙালি গবেষক ও পণ্ডিত ছাড়া অনেকের কাছে বিষয়টি অজানা। সুতরাং দুই প্রদেশের মন ও মননের দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া এপর্যন্ত বহমান। ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক রঙ চড়লেও এই সম্প্রীতির মধ্যে তা বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি।

> *“আত্মচরিত -এ ফকিরমোহন লিখেছিলেন, মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়া সত্ত্বেও বাড়িতে তাঁদের কথাবার্তা হতো ওড়িয়াতে। আর জগন্নাথ দাসের ‘ওড়িয়া ভাগবত’ -এর মতো বই সেখানে বাংলা হরফে ছাপিয়ে ঘরে ঘরে পঠিত হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, ছবিটা এই*

সেদিনও ছিল একই রকম, না হলে কেন আর কাঁথির 'নীহার' পত্রিকায় ১৩৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে এমনটা দেখতে হয় জগন্নাথ দাসের শ্রীমদ্ভাগবত উৎকল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।"[১২]

আসলে ওড়িয়া শিক্ষকেরা তো ভাষা শেখাতে দাঁতন, পটাশপুর, এগরা, রামনগর এমনকি মহিষাদল জমিদারবাড়ি ও রাজবাড়ীতে নিযুক্ত থাকতেন। এঁরা অধিকাংশই উড়ে বামুন। যাদের যজমান ছিল এইসব অঞ্চলে। কাঁথি, দাঁতন, বেলদা ইত্যাদি এলাকা জুড়ে চলত উড়িয়া যাত্রা বা '**দখিণা যাত্রা**'।[১৩]

সম্প্রতি দুই রাজ্যের গবেষক, অধ্যাপক ও সাহিত্যিকবৃন্দ ও নানান পত্র-পত্রিকা দুই ভাষার তুলনামূলক সাহিত্যচর্চা, অনুবাদচর্চা করেই চলেছেন। বিশ্বভারতীতে চলছে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন এবং ওড়িশার উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। আসল কথা দুতরফই সেদিনের সেই ভাষা আন্দোলনের কথা মনেই রাখেনি।

এপর্যন্ত ওড়িশার ভূখণ্ডে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এবং বাংলার ভূখণ্ডে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যচর্চার একটি রূপরেখা উপস্থাপন করলাম। অপরক্ষেত্রে বাংলাদেশে তথা অধুনা পশ্চিমবঙ্গে অতীত থেকে ওড়িয়া ভাষার ব্যবহার কীরূপে চলে আসছে বা ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি সমাদর কতখানি তার পর্যালোচনার প্রয়োজন। ওড়িশা প্রান্তবঙ্গ তথা দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের অতীত ইতিহাস অনুযায়ী বোঝা গেল বহুবার বাংলা ও ওড়িশার সীমান্ত অঞ্চলের সংযুক্তি ও বিযুক্তি ঘটেছে। এই ঘটনা নিতান্ত ঐতিহাসিক ব্যাপার। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর তখনও ওড়িয়া সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট। বিশেষ করে এই অঞ্চলের কথ্যভাষা যা '**মেদিনীপুরিয়া ওড়িয়া**' নামে পরিচিত। মেদিনীপুরের এতদ্‌ঞ্চলের অধিবাসীগণ সুদূর অতীতকাল থেকে ওড়িয়া ভাষাকে মৌখিক ভাষা রূপে ব্যবহার করে আসছেন। মেদিনীপুরে লিখিত রূপে ওড়িয়া ভাষার চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অতি অল্প পরিসরে প্রচলিত ছিল। তা সামাজিক বৃত্তি পরিবর্তনের উপযোগী পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

"১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, মেদিনীপুরের হিজলি অঞ্চলে উচ্চবৃত্তদের মধ্যে ওড়িয়া লেখা-পড়ার প্রচলন ছিল। ওড়িয়া হরফের কিছু তালপাতার পুথি, ঠিকুজী, রামায়ণ, মহাভারত ও

কিছু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক বিষয়ক গ্রন্থ তৎকালীন সম্পন্ন মানুষদের কাঠের সিন্দুক বা আলমারীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা ধর্মীয় মর্যাদার প্রতীক হিসেবে রক্ষিত হতো।"[১৪]

কিন্তু পরবর্তীকালে এই অঞ্চল সম্পূর্ণ বাংলার শাসনাধীনে চলে আসার পর লিখিত ভাষারূপে ওড়িয়া ভাষার প্রচলন ক্রমশ হারিয়ে যায় এবং অনভ্যাসের কারণে ওড়িয়া লিপি লেখার দক্ষতাও মানুষের নষ্ট হয়ে যায়। সরকারি কাগজপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে বাংলা হরফে কিছু ওড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। মাতৃভাষাতো শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি হরফে বেঁচে থাকেনা, বেঁচে থাকে মুখের উচ্চারণে। তাই বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্যচর্চা ও লেখালেখির প্রচলন শুরু হতে থাকে। এইরূপ অভিনব চর্চা অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু হয় এবং ঊনবিংশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজাগৃতির প্রভাবে এই শতকের প্রথমার্ধে, ওড়িয়া হরফে ওড়িয়া ভাষা চর্চা ও লেখাপড়ার প্রচলন দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। বিগত দেড়শ' বছরের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে এই ভাষায় এতদঞ্চলের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়নি।

"১৭৯৩ সালে ওড়িশা অন্তর্গত কাঁথি অঞ্চলের জমিদারগণ বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর ইংরেজ জেলা সমাহর্তাদের কাছে বাংলা ভাষায় কবুলিয়ত জমা দিয়েছিলেন।"[১৫]

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ওড়িয়াভাষীদের মধ্যে একটি দাবী উঠেছে যে, যদি হিন্দি, সাঁওতালি, উর্দু, নেপালি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পেতে পারে, তাহলে ওড়িয়া নয় কেন? '**আজকাল**' বাংলা দৈনিক সংবাদ পত্রের '**সম্পাদকীয়**'তে তাপস গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে,

"উৎকলীয় মিলিত মঞ্চের সভাপতি আর. এন. মহাপাত্র বলেন, 'শুধু বৃহত্তর কলকাতায় ওড়িয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যা আজ ৯ লাখের মতো। এর সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর ও অন্যান্য জায়গা ধরলে এরাজ্যে ওড়িয়াদের সংখ্যা ১০ লাখের উপর হবে।

দক্ষিণ বঙ্গের ৬৭টি ওড়িয়া সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংস্থাই এই মিলিত মঞ্চ। সদর দপ্তর বৌবাজারে ১১৪, বিপিণবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে। মঞ্চের সদর দপ্তরে বসেই মহাপাত্রের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।... আমাদের মিলিত মঞ্চের ৬৭টি সংস্থার কাছ থেকে যে তথ্য পাচ্ছি তাতে বলব, আমাদের ১০ লাখের হিসেব অস্বীকার করা যাবে না। তার চেয়ে বড় কথা, ঝাড়খণ্ডে ওড়িয়া আজ দ্বিতীয় ভাষা, ওড়িশায় বাংলা দ্বিতীয় ভাষা। আর ওড়িশায় বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হওয়ার সুবাদে ওখানকার তাবৎ বাংলা স্কুলের সমস্ত খরচ দেয় ওড়িশা সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে ওড়িয়াদের স্কুলের সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে প্রাথমিক ৩২টি মাধ্যমিক ৪টি এবং উচ্চমাধ্যমিক ২টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০টিপ্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেয়। বাকি সব স্কুলের খরচের কিছুটা দেয় ওড়িশা সরকার। উৎকলীয় মিলিত মঞ্চের সভাপতির আবেদন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে, ওড়িয়াকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিলে রাজ্যের ১০ লাখ ওড়িয়া উপকৃত হবে।”[১৬]

সুতরাং এই দাবী থেকে স্পষ্ট যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, তবে একটু ভিন্ন রকমের। বিশ শতকের প্রথম দিকে ওড়িশায় বাঙালিরা যেমন বাংলা ভাষার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তার প্রায় একশ বছর পর একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ওড়িয়া ভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষার সরকারী স্বীকৃতির জন্য দাবী পেশ করছেন। বাংলার সাহিত্যচর্চায় ওড়িয়া সাহিত্যের অনুবাদ, সমালোচনা ইত্যাদি আজকের দিনে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অনেক ওড়িয়াভাষী মানুষ বাংলা বলতে ও পড়তে পারেন - একথা অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান সময়ে বাংলার এইসব অঞ্চল যথা দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের রামনগর, এগরা, কাঁথি, মোহনপুর ও দাঁতন এলাকার মানুষের মৌখিক ভাষা সম্পূর্ণ ওড়িয়া নয়, একই বাক্যে বাংলা ও ওড়িয়া শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। উৎকল অনুসারী উচ্চারণ প্রবণতার দ্বারা এই মিশ্রভাষা উচ্চারিত হয়। এই ভাষা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। একে **‘মেদিনীপুরিয়া ওড়িয়া’** বলে থাকে অনেকে। অতীত সংস্কৃতির বাহক রূপে এই এলাকার মানুষেরা এই মিশ্র ভাষাকে মননের মধ্যে সংরক্ষিত করে

রেখেছে। সরকারি তথা প্রশাসনিক ভাবে বাংলার সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় স্বাভাবিক কারণে বাংলা ভাষার প্রতি নিরূপায় আনুগত্য থাকলেও তাদের শিরা-উপশিরায় ওড়িয়া ভাষা ও সংস্কৃতি পূর্বপুরুষানুক্রমে বহমান। এই আনুগত্য শিক্ষিত মানুষেরা প্রকাশ না করলেও বৃহৎ অংশের অশিক্ষিত পুরুষ এবং নারী তার অন্দরমহলে, রান্নাঘরের মেয়েলি আড্ডায়, জা-ননদ-শাশুড়ির মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনে এই বঙ্গ-ওড়িয়া সংমিশ্রিত মিশ্র ভাষায় কথা বলে থাকেন।

ওড়িয়া ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি। স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার পার্থক্যের কারণ ওড়িয়া ভাষাভাষী মহিলারা বৈবাহিক সূত্রে এ রাজ্যের সীমারেখার মধ্যে প্রবেশ করে আসছেন। যার কারণে তার আশৈশব লালিত মাতৃভাষা তাদের সন্তান-সন্ততির মাতৃভাষা রূপে বহমান হয়ে আসছে। কারণ মাতৃভাষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নারী (মাতা)র ভূমিকা পুরুষ (পিতার)-র তুলনায় অনেক বেশি। কন্যা বিদায়ে, মৃত্যু কান্নায়, মঙ্গল গানে, পালাগানের সুরের মধ্যে ওড়িয়া ভাষার প্রলম্বিত করুণ সুর এখনও ফুটে ওঠে। তাই এইসব মানুষেরা সাবলিল ভাবে না হলেও ওড়িয়া বুঝতে পারেন, বলতে পারেন, কেউ কেউ আবার পড়তেও পারেন কিন্তু লিপিবিদ্যার অনভ্যাসের কারণে লিখতে পারেন না। কারোর বাল্যকাল কেটেছে ওড়িশার পৈত্রিক ভিটেয় বা আত্মীয়ের বাড়িতে। কারোর আবার বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছিল ওড়িশার কোন পাঠশালায় বা মাতুলালয়ে। বয়স্ক-বয়স্কাদের মুখে ঠোঁটস্থ ওড়িয়া ভাষার কোন পৌরাণিক পাঁচালী, ভাগবত ইত্যাদির খণ্ডাংশ। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনেও তাই। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন এখনও দুই প্রদেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পরিচায়ক। অর্থাৎ সমস্ত সংস্কৃতির গাত্রে গাত্রে খোদিত আছে ওড়িয়া ভাষার নিদর্শন। এছাড়া ওড়িশা থেকে নৌঅঙ্ক দুর্ভিক্ষের পরে দলে দলে ওড়িশাবাসী জীবিকা সন্ধানের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতে চলে আসে। মানুষের গমনাগমনে ভাষার পরিযানের পথ প্রশস্ত হয়। আবার মেদিনীপুর থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও চুয়াত্তরের মন্বন্তরে না খেতে পেয়ে বহু মানুষ সবংশে পৈত্রিক ভিটে পরিত্যাগ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও ওড়িশা রাজ্যের বালেশ্বর, জলেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ, চাঁদিপুর, ধামরা, কশাফলি, বারিপাদা প্রভৃতি অঞ্চলে রুজিরোজগারের জন্য জনমজুর-কৃষিমজুর, গোচারক ইত্যাদি জীবিকায় যুক্ত হয়ে স্থায়ী বসবাসী হয়ে উঠেছে এছাড়াও মেদিনীপুরের বহু মানুষ ওড়িশার মঠ-মন্দিরে মোহান্ত, বাবাজি, সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে থেকে গেছেন।

মধ্যযুগে মেদিনীপুরের প্রথাগত বাংলা সাহিত্যচর্চা ছিল সারা বাংলাদেশের সাহিত্য চর্চার মতো ধর্মকেন্দ্রিক। এই জেলায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে একদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় অপরদিকে শৈব ও শাক্তধর্ম উভয়ের একটি সহাবস্থান ছিল। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য বিশেষ করে ওড়িশা সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে বিস্তৃত আকারে ছিল। এই ধর্মপ্রাণতা সমগ্র মেদিনীপুরকে সাহিত্যচর্চার রসদ জুগিয়েছিল। ওড়িশা সংলগ্ন সুবর্ণরেখা তীরবর্তী **'শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর'** ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তীর্থক্ষেত্র। এই অঞ্চলে ষোড়শ শতকে যে দু'জন বৈষ্ণবাচার্যের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা হলেন শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ প্রভু। মূলত এই দু'জন বৈষ্ণবাচার্য দীক্ষাগুরু মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও বাংলা সন্নিহিত ওড়িশা অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমমন্ত্রে আপামর জনসাধারণকে দীক্ষিত করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে আচার্য্য শ্রীনিবাস ও আচার্য্য শ্যামানন্দ যথাক্রমে মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। শ্যামানন্দের পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থান ছিল খড়্গপুর থানার কলাইকুণ্ডার কাছে ধারেন্দা গ্রামে। পরে তাঁরা দণ্ডেশ্বর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এইখানে শ্যামানন্দের জন্ম হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ শেষ করে তিনি স্বয়ং, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুর সমগ্র বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুরের সর্বাংশে এই ধর্মের প্রচার সুদৃঢ় হয়। এই সময় থেকে মেদিনীপুরের কিছু কিছু অঞ্চল থেকে বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্য-চরিত কাব্যগুলির প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্যদিকে অল্পবিস্তর মৌলিক কাব্য ও বৈষ্ণব নির্বন্ধ জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা হতে থাকে। শ্যামানন্দই সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে বেশ কিছ বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। এছাড়া নির্বন্ধ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে অদ্বৈত্যতত্ত্ব, উপাসনাসমগ্র ইত্যাদি রচনা করেন। আনুমানিক ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে আচার্য শ্যামানন্দের মৃত্যু হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ঘরানা তা **'শ্যামানন্দী'** ঘরানা রূপে পরিচিত। বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় এই সমস্ত পদসাহিত্য, চরিতকাব্য, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ রচিত হলেও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা বিশেষ করে ওড়িশা সংলগ্ন ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষেরা অর্থাৎ কাঁথি, রামনগর, এগরা, দাঁতন এই সমস্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী পরিবারে বাংলা ভাষায় রচিত এই সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থ সমাদর পায়নি। বিশেষ করে পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ **'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'** কিংবা ষোড়শ শতকে বৃন্দাবন দাসের **'চৈতন্যভাগবত'** বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের **'চৈতন্যচরিতামৃত'** ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় আকর গ্রন্থসমূহের তেমন কোন গুরুত্ব

এই অঞ্চলের মানুষের কাছে ছিল না। উক্ত জনজীবনের কাছে এই সমস্ত গ্রন্থগুলির তত্ত্বপ্রাবল্য, দুর্বোধ্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারণে যেমন একদিকে বর্জিত হয়েছে তেমনি অবৈষ্ণব পরিবারে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তার পরিবর্তে সহজ সরলভাবে বঙ্গ-ওড়িয়া মিশ্রিত পুরাণ ও ভাগবত বিষয়ক ছোট ছোট পুস্তিকাগুলি এই অঞ্চলের মানুষের ঘরে ঘরে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারে হয়তো সন্ধান করলে মালাধর বসুর **'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'** কিংবা বৃন্দাবন দাসের **'চৈতন্যভাগবত'** ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের **'চৈতন্যচরিতামৃত'**-এর গ্রন্থ পাওয়া যাবে না। তার পরিবর্তে ওড়িয়া **'অতিবড়ি'** কবি জগন্নাথ দাসের **'নবাক্ষরী ছন্দে'** রচিত **'ভাগবত'** গ্রন্থটির সমাদর অধিক। জগন্নাথ দাস ব্যতীত বলরাম দাস, মহাদেব দাস, দ্বিজ মুরারি, বিপ্র কৃপাসিন্ধু প্রমুখ ওড়িয়া কবিদের ভাগবতের নানা স্কন্দ কিংবা অষ্টাদশ পুরাণের নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের অনুবাদ এতো সহজ ও সাবলীল যে তা শুধুমাত্র বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে আবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ধর্মের তত্ত্ব জটিলতা বিন্দুমাত্র এই সকল সাহিত্যে নেই, পাণ্ডিত্যের অহম নেই। ধর্মের আবহে নীতি উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে সহজ সরল ভাষায় এই সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাই ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে আপামর মানুষের কাছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অল্প শিক্ষিত গৃহস্থ বা গৃহবধূর কাছে, ব্রত উপাসকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই সকল সাহিত্যের জনপ্রিয়তা আজও অমলিন। যে কোন কালের জনপ্রিয় সাহিত্যের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গবেষণাপত্রে এই সকল সাহিত্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।

(ঘ)

('নীহার প্রেস' ও প্রকাশনা)

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির লালনকার্যে মুদ্রণ শিল্পের অগ্রণী ভূমিকা থাকে। দক্ষিণ মেদিনীপুর তথা গাঙ্গেয় মেদিনীপুরের সদর শহর কাঁথি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই শহরের **'নীহার'** নামক একটি ছাপাখানা নিতান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় মধুসূদন জানা। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের (১৮৫৭ খ্রিঃ) ৮ই আশ্বিন পূর্ব মেদিনীপুরের হেঁড়্যায় অধুনা নন্দীগ্রাম থানাভূক্ত বিরুলিয়া কৃষ্ণনগর গ্রামে বনেদি মাহিষ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নরসিংহ জানা এবং মাতা বিদ্যাবতী দেবী। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় পানখাইন গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে ১০ টাকা বেতনে শিক্ষক রূপে একটি নিয়োগপত্র পান। শিক্ষকতার পাশাপাশি

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে থাকেন। অপরদিকে তিনি প্রবল সাহিত্য অনুরাগী এবং সাংস্কৃতিক মনস্ক মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত এই সমাজসেবী নানান সামাজিক সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, কুসংস্কার নিবারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কাঁথিতে মডেল ইন্‌স্টিটিউশান ও নারীজাতির শিক্ষার জন্য চন্দ্রামণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় এই দুটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর মহান কীর্তি। এমনকি কাঁথি মডেল ইন্‌স্টিটিউশানে ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

মধুসূদনের যখন ৩৮ বছর বয়স তখন ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি প্রেস স্থাপন করেন। পুরানো একটি হস্তচালিত ঈগল মার্কা মুদ্রণযন্ত্র তিনি বাংলাদেশ থেকে নৌপথে ক্রয় করে এনেছিলেন। বন্ধু-কন্যা নীহারবালার নামানুসারে **'নীহার প্রেস'** নাম রাখেন। এই প্রেসের দ্বারা কাঁথি এলাকার জন্য একটি সাপ্তাহিক **'নীহার'** পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। বাংলা ১৩০৭ সালের ১লা ভাদ্র অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই আগস্ট নীহার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে এই অঞ্চলের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার এডিটর ছিলেন বেতালিয়া গ্রামনিবাসী গণেশচন্দ্র তলা। পত্রিকা সত্যনিষ্ঠ, জাতীয়তাবাদী এবং নিরপেক্ষ সংবাদপত্র রূপে সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে। এমনকী একসময় সুদূর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত **'লন্ডন টাইম্‌স'** দৈনিক পত্রিকায় নীহারের প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশিত হয়। **'নীহার'** কাঁথির প্রথম সাপ্তাহিক মুখপত্র। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে এবং স্বাদেশিকতার সপক্ষে এই সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশি-বিদেশি এবং নানান গ্রামীণ সংবাদ এই সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে। এই পত্রিকার শাখা কার্যালয় কাঁথি কাঁটানালা বাজারে অবস্থিত ছিল। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ৪ঠা কার্ত্তিক মধুসূদন লোকান্তরিত হওয়ার পর তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রনাথ জানা নীহার প্রেস ও পত্রিকাকে সচল রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রনাথ নিজের বাসভবনে আমৃত্যু পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন। পূর্বের তুলনায় এই পত্রিকাটিকে উৎকৃষ্টতা দানের লক্ষে তিনি সচেষ্ট হন। ১৯৮৭ সালের ৮ই আগস্ট **'মেদিনীপুর জেলা সংবাদপত্র সমিতি'**র ৯ম বার্ষিক সম্মেলনে **'নীহার'**-এর সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ জানাকে সম্বর্ধিত করা হয়। বিশ্বভারতীর কলাভবনে পাঠরত একটি ছাত্রের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্রের দ্বারা যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। নীহার প্রেসের অন্যান্য কর্মকাণ্ড এখনও বহমান আছে যতীন্দ্রনাথের পুত্র নীতিন্দ্রনাথ জানার প্রচেষ্টায়। সম্প্রতি যতীন্দ্রনাথ জানার কনিষ্ঠ পুত্র নীতিন্দ্রনাথ জানা এই ছাপাখানার সাহায্যে

বাংলা লিপির মাধ্যমে ওড়িয়া সাহিত্য বিষয়ক পুস্তিকাগুলির পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশ করে আসছেন। বাণিজ্যিক মন্দার কারণে পুরোনো অনেক পুস্তিকার নবসংস্করণ সম্ভবপর না হলেও জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি পুস্তিকা পাঠকের চাহিদা থাকায় নীতিনবাবু সেগুলি মুদ্রিত করে ওড়িয়া সাহিত্য পিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা করে আসছেন।

'নীহার প্রেসের' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে। এই প্রেসটি দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের একমাত্র প্রেস যেখান থেকে ওড়িয়া সাহিত্য প্রকাশিত হয়। ওড়িয়া সাহিত্যকে এতদ্ঞ্চলের সাহিত্য রসিক পাঠকের কাছে স্বল্পমূল্যে ছোট-ছোট পুস্তিকার আকারে তুলে ধরেন। এই পুস্তিকাগুলির বিষয় রামায়ণ, মহাভারত, নানাবিধ পুরাণ, ভাগবত, লৌকিক গান ও কিংবদন্তি ইত্যাদি। প্রকাশনার ধরণ, পুস্তিকার আকার-প্রকার ও কাগজ বা মুদ্রণের গুণগত মান 'বটতলা সাহিত্য'-এর ধরণের। ব্যবসায়িক মন্দা কিংবা নানান অসুবিধার মধ্য দিয়ে সুদূর ঊনবিংশ শতকের শেষ লগ্নে প্রতিষ্ঠিত এই প্রেসটি একবিংশ শতকের ওড়িয়া আত্মস্থ মেদিনীপুরিয়া বাঙালি সমাজে ওড়িয়া সাহিত্যের রসতৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। উৎকল গ্রন্থ প্রচারের ক্ষেত্রে এই প্রেসের অবদান অনস্বীকার্য।

যে সকল পুথি **'নীহার প্রেস'** উদ্ধার করে মুদ্রিত করেছে সেই পুথিগুলির কবিবৃন্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওড়িশার মূল ভূ-খণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বহুল পরিচিত ওড়িয়া কবিদের রচিত কাব্যের পুথিগুলিও **'নীহার প্রেস'** সংগ্রহ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা করে আসছে। কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চৈতন্য সমকালীন মহাপ্রভুর **'পঞ্চসখা'** নামে পরিচিত পাঁচ কবি **জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত দাস** ও **যশোবন্ত দাস**। এই পাঁচজন চৈতন্য সমকালীন ওড়িয়া কবিদের রচনা প্রচলিত আছে ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুর অঞ্চলে। **'পঞ্চসখা'** ব্যতীত মধ্যযুগের অন্যান্য কবিগণ যেমন, **ভীমা ধীবর, শ্রীহরি দাস, দ্বিজ অনিরুদ্ধ, মহাদেব দাস, বিপ্র কৃপাসিন্ধু, দ্বিজ মুরারি, হীন দামু দাস, নিত্যানন্দ দাস** প্রমুখের নামে অনেক কাব্য বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর করেছে **'নীহার প্রেস'**। এছাড়া মেদিনীপুর জেলার বাংলা ভাষাভাষী কবিরা যেমন, **ভুবনমোহন জানা, চন্দ্রমোহন ধল, প্রাণকৃষ্ণ, ভাবুকচরণ দাস, কার্ত্তিক চন্দ্র জানা** প্রমুখেরা ঊনবিংশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা হরফে ওড়িয়া কাব্য রচনা করেছেন। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক কৃষ্ণকথা, নরনারীর

সামাজিক প্রেম, অবৈধ সম্পর্ক, শাশুড়ি-ননদির অত্যাচারে যন্ত্রণাদগ্ধ গৃহবধূর জীবন কথা, কন্যা বিদায়ের গান ইত্যাদিকে বিষয় করে কাব্য রচনা করেছেন। সুতরাং বাংলা ও ওড়িশার উভয় প্রদেশের কবিদের ওড়িয়া কাব্য মুদ্রিত করে আসছে এই ছাপাখানা।

বিষয়বস্তুর নিরিখে এই সকল গ্রন্থের তিনটি প্রধান শাখা লক্ষ্য করা যায়। যথা— (ক) রামায়ণের অনুবাদ, (খ) মহাভারতের অনুবাদ (গ) ভাগবতের অনুবাদ ও (ঘ) অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ। রামায়ণের বিষয় নিয়ে লেখা **'রামবনবাস'**, **'সীতাহরণ'**, **'রামনবমী ব্রত'** ইত্যাদি। মহাভারতের অনুবাদের মধ্যে **'কপট পাশা'**, **'সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ'**, **'সাবিত্রী ব্রতকথা'**, **'কৃষ্ণযুধীষ্ঠির সংলাপ'**, **'রুক্মিনী হরণ'**, **'মহাভারতের আদিপর্ব'** ইত্যাদি। নীহার প্রেসের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে ভাগবতের ওড়িয়া অনুবাদের সংখ্যা সর্বাধিক। ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে **'জন্মাষ্টমী ব্রত'**, **'রাধাষ্টমী ব্রত'**, **'শুকদেব ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত'**, **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'**, **'টীকা ভাগবত'**, **'ঊষা হরণ'** ইত্যাদি। এই ছাপাখানায় অন্যান্য ওড়িয়া পুরাণের বাংলা লিপ্যন্তরও করা হয়েছে। অন্যান্য পুরাণের মধ্যে **'গরুড় পুরাণ'**, **'কলির মাহাত্ম্য'** ইত্যাদি। এছাড়া লৌকিক কৃষ্ণলীলা ও অবৈধ প্রণয় নির্ভর লৌকিক সাহিত্যও প্রকাশিত হয়ে আসছে এই ছাপাখানা থেকে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে উপরোক্ত সাহিত্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শুধু ওড়িয়া সাহিত্য নয়, মধ্যযুগের বেশ কিছু বাংলা সাহিত্যের পুথি ছাপার অক্ষরে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্য প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়েছে। নানা শ্রেণির ব্রতকথা, পাঁচালী, পালাগান, লৌকিক গাথা ইত্যাদি সাহিত্য পুথি থেকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে বঙ্গভারতীর স্বরূপকে বাঙালি সাহিত্য রসিকের হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হয়েছে। ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুর কিংবা বালেশ্বর জেলা থেকে কীটদংষ্ট জীর্ণ তালপাতার পুথি (ওড়িয়া এবং বাংলা) উদ্ধার করে ছোট ছোট পুস্তিকার আকাশে প্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত বাংলা এবং ওড়িয়া মিলে প্রায় সাড়ে তিনশ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

'নীহার' প্রেস থেকে বিশেষ করে ওড়িয়া সাহিত্যকে বাংলা লিপিতে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দ্বিবিধ অভিপ্রায় ছিল। প্রথমত সামাজিক কারণটি হল ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরের সমাজ সংস্কৃতিতে ওড়িশার ভাষা ও সংস্কৃতির একটা বড় প্রভাব আছে। এই অঞ্চলের মানুষের ওড়িয়া ভাষার প্রতি সরল অনুগত্য থাকায় ভাবানুভূতি প্রকাশের স্বতঃস্ফুর্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই ভাষা। উক্ত কারণে

নীহার প্রেস ওড়িয়া ভাষাকে সম্বল করে এইরূপ সমাজ জীবনের প্রয়োজনে ওড়িয়া সাহিত্যকে লিপ্যন্তর করে আসছে। দ্বিতীয়ত ছিল বাণিজ্যিক কারণ। সহজপ্রাপ্য দোভাষী থাকায় ওড়িয়া পুথিকে পাঠোদ্ধার করে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর করা সেদিন সম্ভবপর ছিল। এছাড়া সস্তা কাগজে ছোট ছোট পুস্তিকা মুদ্রণের ব্যয়ভার ছিল স্বল্প। সুতরাং স্বল্প মূল্যে কিনে নেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল সাধারণ মানুষের। কোন কোন পুস্তিকার ক্ষুদ্র বা পকেট সংস্করণ করা হয়েছে। পুস্তিকাগুলির বিক্রয়কেন্দ্র ও মাধ্যম এখন গ্রামীণ ধর্মীয় মেলা কিংবা হাটে-বাজারে ছোট ছোট বইয়ের দোকানগুলি। সুতরাং পুস্তিকাগুলিকে পরিবেশন ও বাজারমুখী করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা এ পর্যন্ত নেই। নীহারের পুস্তক বিক্রেতাগণের মধ্যে অধিকাংশজনই ওড়িয়া গানে ছিলেন দক্ষ। হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুর দিয়ে রচনার আকর্ষণীয় অংশ পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়া ভাষাপ্রেমী মানুষেরা জড়ো হন এবং পুস্তিকাগুলি কিনে বাড়ি ফেরেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **'নীহার প্রেস'** সম্পর্কে যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। **'নীহার প্রেস'** থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি নানাভাবে সংগ্রহ করতেন। ১৯৭৩ সালে ১৩ই এপ্রিল ঝাড়গ্রামে ষটত্রিংশতম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মঞ্চে সভাপতির ভাষণে সুনীতিকুমার যে বক্তব্য প্রদান করেন তা পরবর্তীকালে তাঁর **'বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে'** গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। বক্তব্য নিম্নরূপ—

> ***"উড়িয়াভাষী মেদিনীপুরিয়া সকলেই বাঙালা জানেন, ইস্কুলে বাঙালা পড়েন, নিজেদের বাঙালী বলেন, ইহাদের সমাজ উড়িষ্যার অনুরূপ সমাজ হইতে বহুস্থানেই পৃথক। তথাপি উড়িষ্যার প্রসার এত অধিক যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমের লোকেরা সাগ্রহে উড়িয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। স্বর্গীয় মধুসূদন জানা মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কাঁথি নগরস্থ বিখ্যাত 'নীহার প্রেস' হইতে বাঙ্গালা অক্ষরে প্রচুর উড়িয়া সাহিত্য গ্রন্থ, ধর্ম বিষয়ক ছোট ছোট বই এবং জগন্নাথ দাস রচিত তালপাতায় লেখা সমগ্র ভাগবত পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ মেদিনীপুরের লোকেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।"***[১৭]

এই রকম প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির সমীক্ষা ও চর্চা এমনকি গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সুদূর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত পাঠকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তিকাগুলির মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, সংস্করণ লক্ষ্য করে এই সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমাদের ধারনা স্পষ্ট হয়।

এই সমস্ত রচনায় সাহিত্যমূল্য কতটুকু সে বিচার বিশ্লেষণের জন্য বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন। সবার পূর্বে এই পুস্তিকাগুলির নবসংস্করণের তাগিদ বা প্রাথমিক কারণসমূহের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

এই পুস্তিকাগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে কবি-পরিচিতি নেই বা থাকলেও তা খুব ক্ষীণ। প্রথমত বাণিজ্যিক স্বার্থে বা সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন কারণে হয়তো **'নীহার'** এই পুস্তিকাগুলিতে কবি-পরিচিতি প্রদানে অনীহা বা উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত বহুক্ষেত্রে সংগৃহীত পুথিগুলিতে কবির নাম বা কবি-পরিচিতির রূপটি খুব সংকট ছিল। প্রকাশক নিরূপায় হয়ে এমন কাজটি করতে পারেন। প্রথম কারণটি আমাদের সঙ্গত মনে হয়, কারণ নীহার কর্তৃপক্ষ সাহিত্যপ্রীতি অপেক্ষায় মুদ্রণ ব্যবসাকে গুরুত্ব দিয়ে বাণিজ্যিক সফলতার দিকে ছুটেছেন। শিল্পিত প্রকাশনার অবকাশ হয়তো ছিলনা। পুস্তিকাগুলির প্রচ্ছদপত্রে বা শিরোনামপত্রে কবির নামোল্লেখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেই। সেই স্থানে নীহার প্রকাশন এবং প্রকাশকের নামোল্লেখ আছে। সুতরাং অনভিজ্ঞতা হোক বা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কবি-পরিচিতির বিষয়টি প্রকাশক এড়িয়ে গেছেন। অথচ পদের শেষে ভণিতায় শুধুমাত্র কবির নামোল্লেখ আছে মাত্র। সুতরাং কবি-পরিচিতি সঠিকভাবে জানতে হলে উক্ত পুথির পাঠ বিচার বা সম্ভব হলে একাধিক পুথির পাঠ মিলিয়ে সঠিক পাঠ নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। আসল রূপ সেখানেই ধরা পড়বে। দুর্ভাগ্য এই যে, নীহারের সংগৃহীত পুথিগুলি সংরক্ষণের অভাবে সবই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত বা অবলুপ্ত। ফলে আমাদের কাছে একমাত্র সম্বল মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি।

কিছু কিছু পুস্তিকায় লক্ষ্য করি কাব্যাংশের অভ্যন্তরে সামান্যতম কবি-পরিচিতি মাত্র নেই। মধ্যযুগের সাহিত্যের পক্ষে তা অনভিপ্রেত। আত্মপ্রচারমুখীনতাই সকল প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম। তাই কবি-পরিচিতি থাকা স্বাভাবিক। যদি তা না থাকে তাহলে নকলনবীশির টুকলিবাজি কাজ হতে পারে। আমাদের এক্ষেত্রে মনে হয়েছে এর মধ্যে নিতান্তই বাণিজ্যিক কারণ লুকিয়ে আছে। হয়তো প্রকাশক কাহিনীর মূল আখ্যান অংশকে রেখে বাদবাকি কাট-ছাট করে সংক্ষিপ্ত আকারে ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে ন্যূনতম মূল্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। এখানে কবিপক্ষ যেহেতু অনুপস্থিত বা বিস্মৃতপ্রায় সেইহেতু **'নীহার'** নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীন মানসীকতার কারণে পুথিগুলির অসম্পূর্ণ ও অপটু সম্পাদনার রূপ দিয়ে দায়সারা ভাবে কাজ শেষ করেছেন।

অনেক সময় মধ্যযুগের কাব্যে কবির রচনাকাল জটিল সংখ্যা প্রহেলিকায় প্রকাশ করা হয়। নীহার প্রকাশনা কার্যে যারা নিয়োযিত ছিলেন তাঁদের অনভিজ্ঞতার কারণে সেই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার থাকতে পারে। কারণ নিছক মুদ্রণকর্মীর দ্বারা পুথির সঠিক সম্পাদনা সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে পুথি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন থাকে। অর্থাৎ সবদিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে কবি পরিচিতি বা কাব্যের রচনাকালকে আড়াল করার পিছনে অনভিজ্ঞতা থাকতে পারে বা প্রাপ্ত পুথির অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। আবার সস্তায় ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশের তাগিদকেও এক্ষেত্রে দায়ী করা যেতে পারে।

ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও **'নীহার'**-এর এইরূপ প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায়না। কল্লোলিনী কলকাতার সাহিত্য প্রকাশনার কোলাহল থেকে অনেক দূরে সমুদ্র অববাহিকায় এহেন অবহেলিত মুদ্রণশিল্প একবুক অভিমান নিয়ে এখনও টিকে আছে। আমাদের উদ্দেশ্য তাকে সারস্বত বাঙালির গোচরে আনা।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য, মিত্র ও ঘোষ, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫২, পৃষ্ঠা - ৭।

২.ক দ্রষ্টব্য ঃ প্রেমানন্দ প্রধান, দক্ষিণ মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসাহিত্য, আধার গ্রন্থঃ কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা - ১৭৬।

২.খ দ্রষ্টব্য ঃ বিনোদশঙ্কর দাস ও প্রণব রায় (সম্পা.), মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন। পৃষ্ঠা - ৩৭৯।

৩. দ্রষ্টব্য ঃ মৃন্ময় হোতা, 'ঈশ্বরের শিষ্য ভাগবতচন্দ্র' সম্পাদকীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

৪. দ্রষ্টব্য ঃ মৃন্ময় হোতা, পূর্বোক্ত পত্রিকা।

৫. দ্রষ্টব্য ঃ বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায় (সম্পা.), মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, ভূমিকাংশ (পৃষ্ঠা - দ)।

৬. দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, **'ওড়িয়া উপন্যাসের ভগীরথ'**, রবীবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুন, ২০১৮।

৭. দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত পত্রিকা।

৮. দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত পত্রিকা।

৯. দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত পত্রিকা।

১০.দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, ওড়িয়া সাহিত্য, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫৮ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা - ৪৯।

১১.দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত পত্রিকা।

১২.দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, পূর্বোক্ত পত্রিকা।

১৩.দ্রষ্টব্য ঃ সূর্য নন্দী, বাংলা ও ওড়িশা সীমান্ত অঞ্চলের একটি লোকনাটক ঃ ললিতা পালা (প্রবন্ধ), দণ্ডভূক্তি (পত্রিকা), সন্তু জানা (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৮৭।

১৪.দ্রষ্টব্য ঃ প্রেমানন্দ প্রধান, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ১৮৩।

১৫.দ্রষ্টব্য ঃ প্রেমানন্দ প্রধান, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ১৮৩।

১৬.দ্রষ্টব্য ঃ তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদকীয়, আজকাল (দৈনিক পত্র), ১২ই অক্টোবর, ২০১৭।

১৭.দ্রষ্টব্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে, ১ম সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৩৭২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা হরফে ওড়িয়া অনুবাদ সাহিত্য : পরিচয় অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণ

ক. রামায়ণের অনুবাদ

১।	রাম বনবাস —	ক্ষেত্রনাথ
২।	সীতাহরণ —	কবি-পরিচিতি অনুপস্থিত

খ. মহাভারতের অনুবাদ

১।	কপট পাশা —	ভীমা ধীবর
২।	অনন্ত ব্রত —	দ্বিজ অনিরুদ্ধ
৩।	সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ —	শ্রীহরি দাস

গ. ভাগবতের অনুবাদ

১।	হরিণী-স্তুতি —	জগন্নাথ দাস
২।	গজ স্তুতি —	জগন্নাথ দাস
৩।	জড়ভরত উপাখ্যান —	জগন্নাথ দাস
৪।	ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল —	জগন্নাথ দাস ও বলরাম দাস
৫।	টীকা ভাগবত বা ভাগবত সার —	জগন্নাথ দাস
৬।	শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্দ —	জগন্নাথ দাস
৭।	ঊষাহরণ —	জগন্নাথ দাস
৮।	শুকদেব ঋষির জন্মবৃত্তান্ত —	জগন্নাথ দাস
৯।	রাসলীলা —	জগন্নাথ দাস
১০।	জন্মাষ্টমী ব্রত —	জগন্নাথ দাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা হরফে ওড়িয়া অনুবাদ সাহিত্য : পরিচয় অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণ

ক. রামায়ণের অনুবাদ

গ্রন্থ ১. রাম বনবাস, কবি - ক্ষেত্রনাথ ঃ

ওড়িয়া ভাষায় জনৈক কবি ক্ষেত্রনাথ রামের বনবাস যাত্রার প্রাক্‌কালে মাতা কৌশল্যার খেদোক্তি নিয়ে ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। অনূদিত কাব্যটিতে মুদ্রিত করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করে কাঁথির নীহার প্রেস। গ্রন্থটির অষ্টম সংস্করণ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৪ সালে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> *"(All rights reserved) /ওঁ নমো রামচন্দ্রায়/রাম বনবাস/(কৌশল্যার খেদোক্তি)/অষ্টম সংস্করণ/ কাঁথি নীহার প্রেস হইতে শ্রী নীতিন্দ্রনাথ জানা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১৩১৪ সাল।/মূল্য - ৪.০০ চারি টাকা মাত্র।"*
>
> **(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৩ ক দ্রষ্টব্য)**

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রের চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। মাঝখানে '**ওঁ**' এই লেখাটির মধ্যে পরিব্রাজক কোন ব্যক্তির চিত্র আছে। উক্ত ব্যক্তির পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। গ্রন্থটি ১৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। এতে প্রচ্ছদ (১), অভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র (১), মূল গ্রন্থ (১৩), পশচাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ মোট ২৬টি পৃষ্ঠা আছে।

অনুবাদটি শুরু হয়েছে এভাবে — *"।। রাম বনবাস।।/ওঁ নমঃ রামচন্দ্রায়/(ক)/কহই শ্রীরাম মাতা শুন কয়া মাতাঙ্কর এই পণ/করি মো পিতাঙ্কু সত্যরে আবদ্ধ,"*

কাব্যকাহিনী ঃ

কাব্যটির কাহিনীবস্তুতে লক্ষ্য করা যায় পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হবেন।

বনবাসে যাওয়ার প্রাক্‌কালে মাতা কৌশল্যার খেদোক্তি উচ্চারিত হয়েছে সমগ্র কাহিনীবস্তুতে। মা কৌশল্যা পুত্রের ভাবী বিরহে শোকাতুরা হয়ে উঠেছেন। অশ্রুআপ্লুত ও আবেগমথিত ভাষায় মাতা-পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনার কাহিনী এই কাব্যের মূল বিষয়। কাব্যকাহিনীর কোন উত্থান-পতনের মাধ্যমে একমুখীন গতিধর্মীতা নেই। কৌশল্যার খেদোক্তির মাধ্যমে দশরথের মধ্যমা পত্নী কৈকেয়ীর কুটীল চক্রান্তের প্রসঙ্গ বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে নানা অনুষঙ্গে। সুতরাং সমগ্র বিষয়বস্তুতে গতিহীন নিস্তরঙ্গ কাহিনী লক্ষ্য করা যায়। মাতা কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রের এহেন দুর্দশার জন্য সতীন কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাকে যেমন দোষারোপ করেছেন অপরদিকে অযোধ্যাপতি দশরথের প্রতিও ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ করেছেন। এছাড়া নিজের মন্দকপাল বা নিয়তিকে বারবার দোষারোপ করেছেন। **‘কৌশল্যার খেদোক্তি’** কাব্যের বর্ণিত কাহিনীবস্তুর মধ্যে বা কৌশল্যার খেদোক্তির মাধ্যমে কাহিনীর পূর্বাপর বর্ণিত হওয়ায় আদি-মধ্য এবং অন্ত কাহিনীর একটি সূক্ষ্ম সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

ভাষা ঃ

‘রাম বনবাস’ কাব্যটির ভাষা ওড়িয়া। কাব্যে প্রযুক্ত ওড়িয়া ভাষার যে বাক্যবিন্যাস শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ লক্ষ্য করা যায় তা থেকে স্পষ্ট হয় যে এই ভাষা মধ্যযুগের ওড়িয়া ভাষা নয়। কাব্যের মধ্যে কয়েকটি ওড়িয়া শব্দ যেমন — **‘কয়া’** অর্থাৎ কৈকেয়ী, **‘গদগদ’** অর্থাৎ বিগলিত হওয়া, **‘ডকা’** অর্থাৎ বিঘ্ন ঘটানো ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ মধ্যযুগের ক্ল্যাসিক ওড়িয়া ভাষার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়না। অনাড়ম্বর সহজ-সরল কাব্যভাষার যথার্থ প্রয়োগ এই কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। **‘কয়া’**, **‘গদগদ’**, **‘ডকা’** ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যবহৃত মৌখিক ওড়িয়া আটপৌরে শব্দগুলি কাব্যভাষার মধ্যে প্রাঞ্জলতা এনেছে।

‘ক’ থেকে শুরু করে **‘ক্ষ’** পর্যন্ত মোট ৩৪টি অক্ষরকে অবলম্বন করে ৩৪টি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কবি কাব্যের বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করেছেন। মধ্যযুগীয় কাব্যশৈলীর বিচারে একে **‘চৌতিশা’** বা **‘চৌত্রিশা’** বলে। চৌতিশায় কোন কোন অক্ষরের ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে তৎসম শব্দ এসে পড়েছে। কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নয়। যেমন **‘ষ’** অক্ষরের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের প্রয়োগ এইরূপ—

“ষড়ঙ্গ জিতর বাক্য শুনি ষড়ঙ্গ রাজার কম্পে পুণি,
ষট চক্র দেহে অবশ হইলা,”

এইভাবে আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের প্রয়োগ করে ক্ল্যাসিক কাব্যের মহিমা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কবি।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

রচনাটির নাম '**রাম বনবাস**' হলেও মূলত কৌশল্যার বিলাপ রোদন এই কাব্যের বিষয়। কবি ক্ষেত্রনাথ রামায়ণের সংক্ষিপ্ত এক অংশ চয়ন করে অভিনব কবিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রামায়ণের অনুবাদ বলতে এটি একটি খণ্ডাংশের অনুবাদ। পুস্তিকাটির নামকরণের ক্ষেত্রে মূল শিরোনামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে '**কৌশল্যার খেদোক্তি**' নামক একটি বিকল্প নামকরণ আছে। রামের বনবাসকালে মাতা কৌশল্যার যে বিলাপ তা একটি করুণ আবহে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবি '**ক**' থেকে '**ক্ষ**' পর্যন্ত মোট ৩৪টি অক্ষরকে ৩৪টি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কাহিনীবস্তুকে বিভাজন করেছেন। প্রতিটি অনুচ্ছেদকে ত্রিপদী ছন্দে ধ্রুবপদ বিশিষ্ট চরণে পংক্তি বিন্যাস করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হবেন। এমতাবস্থায় মা কৌশল্যা পুত্রের ভাবী বিরহে শোকাতুরা হয়ে উঠেছেন। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের অশ্রু-সজল আবেগে মাতা-পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনার কাহিনী বেশ সকরুণ। কৌশল্যার করুণ আর্তির মাধ্যমে সমগ্র কাব্যে এক গীতিমূর্চ্ছনা লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষুদ্র চৌত্রিশা পদটি গানের জন্য ব্যবহার হতো– এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। প্রতিটি চরণের শেষে প্রথম চরণ পুনরায় উচ্চারিত হচ্ছে ধ্রুবপদ রূপে। মূল গায়ক চরণটি গান করার পর অনুসারী গায়ক বা বায়েনগণ প্রথম চরণের ধুয়ো ধরে প্রলম্বিত সুরে গানটি গাইতে থাকেন এইভাবে–

চৌদ্দ বর্ষ মতে দেলা বন গো – মাতা শুন
আশীর্বাদ কর যিবা বন গো, ঐ
এই দেখ তুম্বর শ্রীচরণ গো ঐ

'**রাম বনবাস**' কাব্যটি রামায়ণের অংশমাত্রের ভাবানুবাদ। মূল রামায়ণে কৌশল্যা ক্রন্দন শুধুমাত্র একোক্তি। কিন্তু এই কাব্যাংশে রামচন্দ্র ও কৌশল্যা একত্রে সংলাপধর্মী বিলাপে রত। গীতিমূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় সংলাপধর্মীতা একত্রে গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য বহন করে। রামায়ণের অংশমাত্র নিয়ে গীতিনাট্য রচনা আমরা ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করেছি। অনুরূপ ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়বস্তু নিয়ে গীতিধর্মী নাট্যকলা যথেষ্ট আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরের মানুষেরা যে সমস্ত ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন তার অধিকাংশ সাহিত্যের মধ্যে গীতিপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই এলাকার মানুষজনের ওড়িয়া ভাষার বোধগম্যতা থাকলেও এই ভাষায় আক্ষরিক জ্ঞান ছিলনা। তাই শ্রবণেন্দ্রিয়কে ভরসা করে তারা ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের

রস উপলব্ধি করে আসছেন। এই রসোপলব্ধির একমাত্র চাবিকাঠি লিপ্যন্তর। লিপ্যন্তর হলো বটে, বৃহদাংশের অশিক্ষিত মানুষ তা থেকে দূরে থাকলেন। তখনই সেই সাহিত্য গীতিমাধ্যম অবলম্বন করে সকলের কাছে গেয়ো রূপে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় গায়ক, পুস্তক বিক্রেতাগণ সুর সংযোজন করে, পরিবেশনার মাধ্যমে জনজীবনের কাছাকাছি এই সকল সাহিত্যকে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

রামায়ণের এইরূপ অংশ বিশেষকে অবলম্বন কর গীতিনাট্যখানিতে বৈঠকি নাট্যকলা লক্ষ্য করা যায়। বসে বসে গায়ক একাই নাট্যসংলাপধর্মী একাধিক চরিত্রবিশিষ্ট নাটকটি পরিবেশন করবেন এবং মোক্ষকামী শ্রোতা এই নাট্যাংশটি শুনে ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করবেন। কাব্যাংশটিতে শ্রোতার উপস্থিতি থাকা চাই। উল্লিখিত মোক্ষকামের কথা কাব্যাংশে লেখা থাকে এইরূপ —

> ‘‘ক্ষমা করি সাধু জন মান তাঙ্কু,
> পাইব পদটি সে মিলাই গো, সর্ব্বে শুন
> হরি ধ্বনি কর আনন্দেন গো, ঐ
> চৌত্রিশা পদ্যটি হেলা পূর্ণ গো, ঐ’’

সমাজচিত্র ঃ

মধ্যযুগের সাহিত্যে কবি মাত্রেই যুগসমাজের প্রতিনিধি। ব্যক্তিগত প্রতিভার উর্ধ্বে উঠে অনুবাদককে সমকালীন সমাজ জীবনকে কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে হয়। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে রামায়ণের অনুবাদে কবি কৃত্তিবাস গার্হস্থ্য বাঙালির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালির পরম্পরা, পারিবারিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক চিত্রটি রামায়ণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে রামায়ণের অনুবাদকগণ এক সুস্থ পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনযাপন করার বার্তা দিয়েছেন। ওড়িয়া ভাষায় **‘বিলঙ্কা রামায়ণ’** নামে মহাকবি সারলা দাস পঞ্চদশ শতকে অর্থাৎ কৃত্তিবাসের সমকালে একটি কাব্য রচনা করেন (A Dictionary of Indian Literature : Beginings - 1850, orient Blackswan, Page - 420)। ক্ষেত্রনাথের **‘রাম বনবাস’** কাব্যটি আসলে **‘বিলঙ্কা রমায়ণ’** -এর খণ্ডাংশ নিয়ে রচিত। কারণ ওড়িশায় পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী রামায়ণের অনুবাদ ব্যাপক হারে না হলে যতটুকু হয়েছে তা বিলঙ্কা রামায়ণের অনুসারী। বিমাতার চক্রান্ত, গার্হস্থ্য বধূ সীতার পাতিব্রত, লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম

ও কর্তব্যপালন এ সবই ভারতীয় সমাজ জীবনের আদর্শ। এই কাব্যে সমকালীন সমাজজীবন ক্ষুদ্র পরিসরে ধরা পড়েনি। কৌশল্যার মাতৃহৃদয়ের করুণ আর্তি শুধু বাংলা কিংবা ওড়িশা নয় দেশোতীর্ণ মাতৃসত্ত্বার তথা বাৎসল্যের করুণ আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

ছন্দ ঃ

কাব্যটি আদ্যোপান্ত ত্রিপদী ছন্দে লেখা। সূচক পদটি ত্রিপদীতে রচিত হলেও অনুসারী চরণগুলির মধ্যে পয়ারের মতো চরণান্তিক মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

''ঝাঁক ঝাঁক সিংহ যে শার্দ্দুল, ঝাড় বনে হইছন্তি মেল
ঝাঁপিন পড়িব তোতে যে দেখিলে,
প্রাণরে হইবু তু ব্যাকুলরে — রঘুশিষ্য
ন যা রাম তুই বনবাসরে ঐ
গলে তু মরিবি খাই বিষয়ে ঐ''

বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘ ত্রিপদীর ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ ৮+৮+১০ মাত্রার পংক্তি বিন্যাস লক্ষ্য করি। এই ওড়িয়া কাব্যে দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রা প্রয়োগ পদ্ধতি অভিনব। এক্ষেত্রে ১০+১০+১২ মাত্রার পংক্তি বিন্যাসের ত্রিপদী আমরা লক্ষ্য করলাম।

অলংকার ঃ

'রাম বনবাস' কাব্যখানিতে চৌত্রিশ অক্ষরের মাধ্যমে **'চৌতিশা'** কাব্যশৈলীর দ্বারা রাম-কৌশল্যার বিলাপোক্তিকে কবি অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগে শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন। **'চ'** ব্যঞ্জনধ্বনির মাধ্যমে সুন্দর বৃত্তানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন, যেমন —

''চাঁহিন মাতাঙ্ক শোকাতরা চক্ষুর গলই অশ্রুধারা
চিত্ত গদগদে ধরি মাতৃপদ,
সান্ত্বনা করই রঘুবীর গো— মাতা শুন
চিন্তা ত্যজ তুম্বে মো কারণ গো, ঐ
চৌদ্দ বর্ষ মোতে চারি দিন গো ঐ''

বঙ্গানুবাদ :- দেখি মাতা শোকাতুরা চোখে ঝরে অশ্রুধারা

চিত্ত গদগদে ধরি মাতৃপদে,

সান্ত্বনা করায় রঘুবীর গো– মাতা শোন

আমার কারণে চিন্তা ত্যাজ গো ঐ

চৌদ্দ বছর আমার কাছে চারি দিন গো ঐ

কৌশল্যা পূর্বজন্মকৃত মন্দকর্মের ফল বলে নিজেকে দোষারোপ করেছেন। প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের বনবাস গমন কৌশল্যার কাছে আত্মহত্যার সামিল। রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যার গলার হার। কবি **'গ'** ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্তানুপ্রাসের মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন —

''গলার রত্নহার করি থিলি, গলা কাটি দেই যিবু চলি

গরল খাইন প্রাণ হরাইবি,

গলে বনবাস তুই চলিরে রামচন্দ্র

সরিলা দেখা তো মুখ চান্দরে ঐ

পূর্ব পুণ্য বড় মোর মন্দরে ঐ''

চরিত্র চিত্রণ ঃ

'রাম বনবাস' কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে রাম ও কৌশল্যা এই দুটি চরিত্র আমাদের সামনে এসেছে। এছাড়া দশরথ, কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং ভরত এই চরিত্রগুলি প্রসঙ্গক্রমে পরোক্ষভাবে এসেছে। প্রধান চরিত্র কৌশল্যার মাধ্যমে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে কৌশল্যা এতখানি আবেগঘন চরিত্র নয়। রামচন্দ্রের বনবাস গমন তার কাছে পিতৃ আদেশ পালন করা পুত্রের অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়, বরং ক্ষত্রমাতা কৌশল্যার কাছে গৌরবের বিষয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কবি ক্ষেত্রনাথ কৌশল্যার চরিত্রকে রক্ত-মাংসের মানবী রূপে গড়ে তুলেছেন। তার ব্যাকুলতা শুধুমাত্র রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে নয়, আদরের পুত্রবধূ সীতার প্রতিও যে স্বামীর কর্তব্য যথেষ্ট আছে একথা পুত্র রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কৌশল্যা–

''জনকর বালা সুকুমারী, যাউছি তো সঙ্গে হঠকরি

জন্ম হু ন দেখে বনগিরি সেই,

সে যে অন্তপুরবাসী নারী রে   ধনুধারী

দেখিলে ডরিব বন গিরিরে   ঐ

তাকু রখি যা তু নিজ পুরীরে   ঐ”

পুত্রের এহেন অবস্থা বা নিজের এহেন বিচ্ছেদ-বেদনার জন্য কৌশল্যা সতীন কৈকেয়ীকে দোষারোপ ও ধিক্কার দিয়েছেন এইভাবে–

“ইত্বরী রমনী কয়া দেই,   ইচ্ছিলু মো পুত্রে হিংসা তুই,

ইহকালে তুই সুখ ন পাইবু,

পরকালে নর্কে হেব ঠাঁইরে –   কয়া দেই

মনে তু ভাবিনু থিলু এই রে   ঐ

ক্ষীররে ক্ষার তুই দেলু লেইরে   ঐ”

সরল বঙ্গার্থ হলো এইরূপ যে, ইতর রমনী কৈকেয়ী তার হিংসা চরিতার্থ করার জন্য কৌশল্যার পুত্রকে ব্যবহার করেছে। কৌশল্যা কৈকেয়ীকে শাপ-শাপান্ত করলেন এই ভাবে যে, কৈকেয়ী ইহকালে সুখ পাবেনা, পরকালে নরকে তার ঠাঁই হবে। কৈকেয়ীর মনে যে এইরূপ ভাবনা ছিল তা কৌশল্যা কোন দিনের জন্য টের পায়নি। কৌশল্যা বলেছেন যে, কৈকেয়ী ক্ষীরের মধ্যে ক্ষার ঢেলে দিয়ে সুখের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে। কৌশল্যা তার এহেন অবস্থার জন্য নিজের কৃতকর্মকে দোষারোপ করেছেন। নিজেকে ডাকিনী বলে খেদ প্রকাশ করেছেন। কৌশল্যা বলেছেন–

“ডাকিনী নারী মু থিলি   ডকা করিবার হিংসা কলি

ডাকিনী গর্ভরে জন্ম তু হইলু,

সে পাপ আম্বর গলা ফলিরে   মোর বালা

তোতে মো কলরু ছড়াইলা রে   ঐ

বিধাতা এই কৃত হেলা রে   ঐ”

শুধুমাত্র কৌশল্যার ক্রন্দন আছে তা নয়, এখানে অযোধ্যার রাজা দশরথের মধ্যেও পিতৃ-হৃদয়ের

ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। বনবাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে রামচন্দ্র যখন আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য পিতার সমীপে উপস্থিত হলেন তখন দশরথের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এইভাবে–

“রামর সন্ন্যাসী বেশ চাঁহি   রোদন করই নৃপ সাঁঞি
রমনীঙ্ক সত্যে বন্ধ হই করি,
প্রাণ পুত্র বনে মু পঠাইরে,   রঘুবালা
কটি দেই যা মোর গলারে,   ঐ
তোতে ঠাঁই দেলি বৃক্ষ তলারে।   ঐ”

দশরথ বলেছেন যে, রমনীর সত্যে বদ্ধ হয়ে তিনি আজ প্রিয় পুত্রকে বনে পাঠাচ্ছেন– এই ঘটনা দশরথের কাছে যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। দশরথ রামের কাছে আবেদন করেন যে, তুমি যাওয়ার আগে আমার গলা কেটে দিয়ে যাও। আমার মতো পিতার এ হেন কৃতকর্মের জন্য বেঁচে থাকা উচিৎ নয়। আমি তোমাকে গাছের তলায় ঠাঁই দিলাম। দশরথ লোকলজ্জার হাত থেকে কীভাবে বাঁচবেন তা নিয়ে চিন্তিত। সূর্যকূলে জন্ম হয়ে এইরূপ কৃতকর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছেন। দশরথ বলেন যে, সে স্ত্রীজাতির প্রতি কামান্ধ হয়ে এইরকম একটি অপরাধমূলক কাজ করে বসলেন। আত্মানুশোচনায় দগ্ধ দশরথ চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে এই কাব্যে।

সাহিত্যমূল্য ঃ

কাব্যটির মধ্যে সাহিত্যমূল্য কিঞ্চিত। কাব্যটির গুরুত্ব শুধুমাত্র পাঠকের জনপ্রিয়তার কাছে। জনপ্রিয়তা কাব্যমূল্যের জন্য না হলেও করুণরসের আর্তি পাঠককে এক আবেগঘন পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। পরিবারে বিমাতার চক্রান্ত যেন এক ধ্রুবসত্য ধারণা। তাই কাব্যের বিষয়বস্তু এক চিরন্তন পারিবারিক বাস্তবতাকে প্রমাণ করে বলে **‘রাম বনবাস’** কাব্যটির এত সমাদর। **‘রাম বনবাস’** কাব্যটি রামায়ণের একটি আকর্ষণীয় অংশবিশেষ। ফলে ক্ষুদ্র কাহিনী বিশেষ হওয়ায় সাধারণ মানুষ স্বল্প সময়ে কাব্যটির রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রন্থ ২. সীতাহরণ, প্রকাশক — ভুবনমোহন জানা ঃ

রামায়ণের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত অপর একটি কাব্য **'সীতাহরণ'**। কাব্যটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে গায়ক ও প্রকাশকরূপে শ্রীভুবনমোহন জানার নাম উল্লেখ আছে। পুস্তিকাটিতে কোন প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

"সীতা হরণ/গায়ক ও প্রকাশক ঃ শ্রী ভুবনমোহন জানা/সাং - নস্কর পুর, পোঃ - আটবাটী, জেলা - মেদিনীপুর/মূল্য - ১.০০ টাকা/পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, আটবাটী।"

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৩ খ দ্রষ্টব্য)

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদের চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। মাঝখানে **'ওঁ'** এই লেখাটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি অঙ্কিত আছে। গ্রন্থটি ১৬ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৯.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। এতে প্রচ্ছদপত্র (১), মূল গ্রন্থ (৭) সহ মোট ৮টি পৃষ্ঠা আছে।

কাব্যটি শুরু হয়েছে এভাবে — ***'সীতা হরণ'/অযোধ্যারে রাম, হুয়ন্তে রাজন/ বিধাতা হেলা ভগারি/পিতাঙ্ক বচন, করিলে পালন/রাম হেবে বনচারী গো।'***

কাব্য-কাহিনী ঃ

কাব্যটির বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে নেওয়া। রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস গমন থেকে শুরু করে ছদ্মবেশী রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ এবং অশোক বনে সীতার রোদন পর্যন্ত কাব্যাটির কাহিনী বিন্যস্ত করা হয়েছে। সুবর্ণ হরিণী দেখে সীতা রামচন্দ্রকে হরিণী ধরে আনবার জন্য বলেছিলেন কিন্তু কবির জ্ঞান বিভ্রমের কারণে হয়তো হরিণীকে মেরে আনবার কথাটি বলেছেন। কবি বলেছেন এইরূপ—

সুবর্ণ হরিণী চালন্তে ধরণী
সুন্দর দিশিলা কেমন্তে
জনক নন্দিনী দেখি লোভ কলে
মৃগ মারি দিও মোতে গো।

অর্থাৎ ধরণীর উপর সোনার হরিণী দেখে হরিণীর সৌন্দর্যে সীতাদেবী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। লোভাতুরা হয়ে জনক নন্দিনী রঘুপতি রামচন্দ্রকে হরিণ শিকার করে আনতে বলেন।

কাহিনীর একটি অংশে ক্ষুধার্ত রাবণ অন্নভিক্ষা চাইলে সীতাদেবী অসহায় হয়ে নিজের অঙ্গুরীয় খুলে রাবণকে দিতে চাইলেন। সুচতুর রাবণ অঙ্গুরীয় নিতে চাইলেন না। কবি বর্ণনাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। ভিক্ষা না পেয়ে ভেক্‌ধারী রাবণ আর কাল ক্ষেপণ না করে মিথ্যা অজ্ঞানের ভান করে মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকলো। মরে যাওয়ার ভয়ে সীতাদেবী লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে রাবণের সুশ্রুষা করলেন জননী স্নেহে—

"জল মুখরে সিঞ্চি
পণন্ত কানিয়ে ধীরে বিঞ্চি গো"

উপায় না থেকে সীতা রাবণের মুখে জল ছিটিয়ে দিলেন এবং শাড়ির প্রান্ত দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন। পরক্ষণে রাবণ আসল রূপ ধারণ করে সীতাদেবীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে রথের উপর তুললো এবং লঙ্কার দিকে রওনা হলো।

'জানকী রোদন' অংশে অশোক বনে বন্দী সীতার ক্রন্দন বর্ণিত হয়েছে। বনলতা এবং তমাল বৃক্ষের নিকট মিনতি করে সীতাদেবী বলেন যে, তারা যেন শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সীতার এই বন্দীদশার খবর দেয়। সীতাদেবী বলেন যে—

"মুঁত অবলা নারী   বল নাহি মোহারি
জনাই দেব হৃদ ব্যথা হে।"

বঙ্গানুবাদ :   *আমি অবলা নারী   দেহ বলে নাহি পারি*
হৃদয়ের ব্যথা তুমি জানাও প্রভুরে।

কিষ্কিন্ধ্যার উপর আকাশ পথে রাবণ পুষ্পক রথে সীতাকে হরণ করে উড়ে যাওয়ার সময় সুগ্রীব সীতাদেবীর আর্তনাদ শুনতে পায় এবং রথের শব্দ শুনতে পায়। সুগ্রীব তাকিয়ে দেখে রথ উড়ে চলেছে এবং রথ থেকে সীতাদেবী রত্নচুড়ি ফেলছেন। রাবণের রথের সম্মুখে পক্ষীবীর জটায়ু বাধা দেয়। রাবণের সাথে জটায়ুর যুদ্ধ বর্ণনা করলেন কবি এইভাবে —

"নিকষা নন্দন রথ বাহি নেলা
আকাশ মার্গরে রহি
পক্ষী জটাবীর ভেটিলা আগর
গোলযুদ্ধ হেলা তঁহি গো।
ব্রহ্মশর পেশিলা
পক্ষীবীর ডেনা ছিঁড়াইলা গো।
পক্ষী জটা মারি সিন্ধু হেলে পারি
লঙ্কারে প্রবেশ হেলে
অশোক বনরে সীতাঙ্কু রখিলে
অসুরী জগাই দেলে গো।"

অর্থাৎ নিকষানন্দন আকাশ পথে থেকে পক্ষীবীর জটায়ুর সাথে যুদ্ধ করে। ব্রহ্মশরে জটায়ুর ডানা ছিন্ন করে জটায়ুকে পর্যুদস্ত করে। পরাহত জটায়ুকে ভূপতিত করে সাগর পাড়ি দিয়ে রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করে এবং অসুরীদের প্রহরায় অশোক বনে সীতাদেবীকে বন্দী করে রাখে। কাব্যের কাহিনী এইখানে শেষ হয়েছে।

চরিত্রচিত্রণ ঃ

'সীতা হরণ' কাব্যে মূলত সীতা এবং রাবণ চরিত্রটির বর্ণনা করেছেন কবি। কাহিনীর প্রয়োজনে রাম ও লক্ষণের প্রসঙ্গ কোথাও কোথাও এলেও এই দুই চরিত্রের কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি। রাবণ চরিত্রের মায়াবী রূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন কবি। লক্ষ্মণরেখার বাইরে সীতাদেবী না আসার কারণে রাবণ ক্ষুদার্তের ভাণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এই দৃশ্য কবি বর্ণনা করলেন এইভাবে —

"বিলম্বরে কার্য্য সিদ্ধ হেব নাহি
মনে ভাবে লঙ্কাপতি
এতে কহি বীর মায়া বিস্তারিলা
কচাড়ি পড়িলা ক্ষিতি গো

আঁখি দেলা তরাটি
পাকু পাকু কলা-বেনি পাটি গো।"

রাবণ মনে মনে ভাবলেন বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি অসম্ভব। অর্থাৎ রাবণ মায়ারূপ ধারণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দুটি উল্টে ফেলে দুটি চোয়াল নাড়তে লাগলেন তৃষ্ণার্তের ভঙ্গিমায়। উপায়ন্তর না পেয়ে সীতাদেবী রাবণের কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে রাবণের মুখে দেওয়ার সাথে সাথে রাবণ উঠে বসে এবং মুখে শ্রীরামের নাম উচ্চারণ করতে থাকে। সুতরাং রাবণের মায়াবী চরিত্র চিত্রণে কবি সঙ্গত দৃশ্যাবলীর আয়োজনে সক্ষম হয়েছেন।

কবি এক্ষেত্রে সীতা চরিত্রের পাতিব্রতের নমুনা মূল রামায়ণের অনুসারে বর্ণনা করেছেন। রাবণের প্রতি সেবাপরায়ণা মনোভাব সীতাদেবীকে মাতৃত্বে উন্নীত করেছে — যা এই চরিত্রের পক্ষে ঔচিত্য রক্ষা করেছে ও সঙ্গত হয়েছে। সীতার এই দুর্বিপাকের জন্য নিয়তিকে সে দোষারোপ করেছে বার বার। রামচন্দ্র ফিরে এসে শূন্য পর্ণকুটীরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে তার মনের অবস্থা কতখানি বিষময় হয়ে উঠবে সীতাদেবী সেজন্য চিন্তিত। সারাক্ষণ রামের চিন্তায় মগ্ন হতে দেখা যায় সীতাকে।

ভাষা ঃ

'সীতা হরণ' কাব্যটি ওড়িয়া ভাষায় রচিত। ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের পাঠকের কাছে এই ওড়িয়া ভাষায় লেখা কাব্য মোটেই দুর্বোধ্য নয়। কাব্যের মধ্যে কিছু কিছু ওড়িয়া শব্দরূপের আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যেমন —

"আহে প্রাণ ঈশ্বর
দেখি সরধা হেউছি মোর গো।"

শ্রদ্ধা > সরধা এইরূপ পরিবর্তনকে আসলে আদি স্বরাগম বা স্বরভক্তি (Anaptyxis) বলে। অন্তস্বরাগম লক্ষ্য করা যায় **'কুড়ে'** শব্দটির শেষে, যেমন—

"তীক্ষ্ণমুনা শরে কুড়িয়া দুয়ারে
তিনি গার কাটি দেলে গো।"

‘কুড়ে’ শব্দটি এখানে **‘কুড়িয়া’** শব্দটির সমার্থক। ওড়িয়া ভাষায় **‘কুড়িয়া’** শব্দটির অর্থ কুঁড়ে ঘর। প্রাচীন বাংলার নিদর্শন চর্যাপদের ১০ সংখ্যক পদে কাহ্নপাদ লিখেছেন — **‘নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া’**। চর্যাপদের যেহেতু বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ আছে সুতরাং **‘কুড়িয়া’** শব্দটি বাংলা ও ওড়িয়া উভয় ভাষায় প্রচলিত হয়ে আসছে। **‘গার’** শব্দটির অর্থ দাগ কাটা আঁক কাটা। এই রকম প্রাচীন বাংলা ভাষায় একটি শব্দ **‘ঘেন’** যা ওড়িয়া ভাষায় প্রচলিত আছে। আমরা চর্যাপদের ৬ সংখ্যক পদে ভুসুকপাদের লেখা চর্যাপদটিতে পাই **‘কাহেরে <u>ঘিনি</u> মেলি অচ্ছহু কীস’** কিংবা কাহ্নপাদের লেখা **‘তোহর অন্তরে মোএ <u>ঘলিলি</u> হাড়েরি মালী’**। এই **‘ঘেনি’** বা **‘ঘিনি’** শব্দটি সংস্কৃত গৃহীত > ঘিনিঅ > ঘিনি পরিবর্তন ক্রমে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় এসেছে। কবি লিখলেন —

“ফল মূল খাই যিবু সুস্থ হোই
<u>ঘেন</u> বারে মো বিনতি গো।”

উপবাসী রাবণকে সীতাদেবী বললেন যে, **‘ফলমূল খেয়ে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। তুমি আমার এই বিণীত নিবেদনটি গ্রহণ কর’**।

কবি বেশকিছু ওড়িয়া শব্দ যেমন— **‘কচাড়ি’** অর্থ আছাড় খাওয়া, **‘তরাটি’** অর্থ চোখ উল্টে যাওয়া, **‘পাকু পাকু’** অর্থাৎ চোয়াল নাড়া ইত্যাদির মতো শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন যেগুলি মেদিনীপুরের মানুষের দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়। একটি ওড়িয়া শব্দ **‘ডেই’** অর্থাৎ বাংলায় **‘ডিঙ্গিয়ে যাওয়া’**। এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন এইভাবে —

“দেবর দুরুহা হেবি পদে মুহি
ডেই যিবি তিনি গার।”

অর্থাৎ দেবর লক্ষণের চিহ্নিত রেখা আমি ডিঙ্গিয়ে যাবো। কবি কিছু কিছু তৎসম শব্দ যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওড়িয়া ভাষায় ব্যবহার করেছেন, যেমন — মুদ্রিকা = অঙ্গুরীয়, কার্য্য = কাজ, আকর্ষি = আকর্ষণ, গগন মার্গ = আকাশ পথ ইত্যাদি। উদাহরণ রূপে বলা যায় সীতাদেবী যখন অভূক্ত রাবণকে হাতের অঙ্গুরীয় দিতে চান তখন রাবণ বলেন —

"রাবণ বোলই শুন বইদেহী

<u>মুদ্রিকারে</u> নাহি <u>কার্য্য</u>

গ্রাস বাঞ্ছা মোর শুন নারীবর

ন দেলে ফেরিবি আজ গো।"

রামায়ণের বিষয়বস্তু পরিবেশনের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের প্রয়োগ পুরাণের আবহকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কবি কাব্যভাষায় বাংলা, ওড়িয়া ও সংস্কৃত শব্দের উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটিয়ে কাব্যশরীরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

'সীতা হরণ' পুস্তিকাটির গায়ক ও প্রকাশক ভুবনমোহন জানা। পুস্তিকাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভুবনমোহন জানার সম্বল ছিল শুধু রসবোধ আর স্মৃতিশক্তি। কাব্যটির মধ্যে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। এককালে এই সীতার বনবাস লিখিত সাহিত্য এবং তার স্রষ্টা পরিচিতি নির্দিষ্ট থাকলেও কালক্রমে তা অলিখিত, স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে শিষ্টসাহিত্য থেকে লোকসাহিত্যে এবং লোকসাহিত্য থেকে শিষ্ট সাহিত্যে রূপান্তর হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। রাম বনবাস, সীতা বনবাস, সীতা হরণ, কৃষ্ণলীলার মতো অনেক সুখপাঠ্য সাহিত্যগুলি লোকমানসের স্মৃতিপটে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। মুদ্রিত পুস্তিকা দুষ্প্রাপ্য হলেও সমাজের বক্ষে এর স্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই স্থায়িত্বকে পুনর্মুদ্রিত করে দীর্ঘস্থায়ী করলেন ভুবনবাবু। তবে লক্ষণীয় এই যে, এই কার্যে বর্জন বা সংযোজনের মতো কোন কাজ করেন নি। ফলে কাব্যটির স্রষ্টা পরিচিতি না থাকলেও কাব্যটির আদি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহণ-বর্জন -সংযোজন হয়নি – এই কথা নিশ্চিত বলা যায় এই কারণে যে, শুধুমাত্র ওড়িয়া ভাষার বোধগম্যতা ও স্মৃতিশক্তির নির্ভরতাই এই সকল সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে মূল সহায়ক ছিল। নতুন করে সংযোজন করার ইচ্ছা তাঁদের ছিলনা। শুধুমাত্র বাংলা লিপিতে এনে ওড়িয়া সাহিত্যকে লিপ্যন্তর করার ক্ষমতা ছিল।

রামায়ণের এই সকল খণ্ডাংশের অনুবাদ আসলে ভাবানুবাদের পর্যায়ে পড়ে। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে রামায়ণের অনুবাদ হয় পঞ্চদশ শতকে। কবি সারলা দাস **'বিলঙ্কা রামায়ণ'** বলে রামায়ণের ক্ষুদ্র অনুবাদ করেন। রাম এবং সহস্রশির রাবণের যুদ্ধ এই অনুবাদের মুখ্য কাহিনীবস্তু। ওড়িয়া ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় রামায়ণ **'জগমোহন রামায়ণ'** বা **'দাণ্ডী রামায়ণ'**। এই অনুবাদকর্ম

আসলে সংস্কৃত রামায়ণের মূলানুবাদ নয়। পঞ্চদশ শতকের ওড়িয়া সাহিত্যে উল্লিখিত **'পঞ্চসখা'** বৃত্তের অন্যতম সখা বলরাম দাস **'জগমোহন রামায়ণ'** বা **'দাণ্ডী রামায়ণ'** রচনা করেন। কবি বলরাম দাস সংস্কৃত জানতেন না, স্থানীয় পণ্ডিতের নিকট রামায়ণের কাহিনী শুনে এবং কিংবদন্তীর উপর নির্ভর কর **'জগমোহন রামায়ণ'**-এর কাহিনী পরিকল্পনা করেন।[১] সুতরাং ওড়িয়া ভাষায় রামায়ণী চর্চা যে বাংলা রামায়ণ অনুবাদের মতো ধ্রুপদী সাহিত্যচর্চা নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ওড়িয়া রামায়ণের অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি মূলত লক্ষ্য করা যায় লোকসমাজে প্রচলিত কথকতা ও জনশ্রুতির মধ্যে। ওড়িশা প্রান্তবঙ্গে প্রাপ্ত বাংলা হরফে যে ওড়িয়া রামায়ণের খণ্ডাংশ অনুবাদ আলোচিত হলো তার মধ্যে লোকসাহিত্যের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের বিমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ধ্রুপদী সাহিত্যের যে প্রাজ্ঞ নান্দনিক চেতনা ও সূক্ষ্ম রসবস্তু সেসবের যথেষ্ট অভাব আছে এই সকল সাহিত্যে। গ্রামীণ উপভোক্তামণ্ডলী এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন এই সকাল **'সীতা হরণ'** এবং **'রাম বনবাস'**-এর মতো popular literature -এর ক্ষুদ্র সংস্করণগুলিকে। লোক মানসে এর আবেদন এখনও অমলিন। স্মৃতি, মুদ্রণ এবং পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে রামায়ণ রসপিপাসু মেদিনীপুরের মানুষের গীতি প্রাণতায় এইসব সাহিত্য আজও বেঁচে আছে।

ছন্দ ও অলংকার ঃ

'সীতা হরণ' কাব্যটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। এই ত্রিপদী ছন্দ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি পদান্তিক মিলের বাধ্যবাধকতাকে মেনে চলেন নি। ত্রিপদী ছন্দের ক্ষেত্রে প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় পদের যে অন্ত্যমিল থাকে এই কাব্যের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। শুধুমাত্র ত্রিপদীর তৃতীয় পর্বের সঙ্গে অপর স্তবকের তৃতীয় পর্বের স্তবক মিল লক্ষ্য করা যায়, যেমন —

"লক্ষণ বোলন্তি   শুণ ঠাকুরাণী
তুম্ভে হোইল কি বাই
শ্রীরামচন্দ্র যে   জগত করতা
তাঁঙ্কু বা বিপত্তি কাঁহি।"

কিন্তু এই কাব্যের **'জানকী রোদন'** অংশে কবি বাংলা ত্রিপদীর পদান্তিক মিল মেনে চলেছেন। ৬+৬+১০ মাত্রার লঘু ত্রিপদী রচনায় কবি অনুপম শ্রুতিমাধুর্য্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন —

"আহে তমাল মাল শুন মোর বিকল

কুট পাখিলা মোতে ধাতা হে।

মুঁত অবলা নারী বল নাহি মোহরি

জনাই দেব হৃদ ব্যথা হে।।"

অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি বিশেষ কোন নতুনত্ব দেখাতে পারেন নি। একই শব্দধ্বনি বারম্বার উচ্চারণ করে কবি কাব্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে বৃত্তানুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি করেছেন, যেমন —

"ধরু ধরু কুরু পলাই যাঅন্তে

ওটারি বিন্ধিলে বান।"

অথবা "মায়ামৃগ ডাক শুনন্তে জানকী

ভয়ে থর থর হেলে

রামঙ্কু বনরে বিপত্তি পড়িছি

লক্ষণ যাও বোইলে।"

খ. মহাভারতের অনুবাদ

গ্রন্থ ১. কপট পাশা, কবি : ভীমা ধীবর ঃ

ওড়িয়া ভাষায় জনৈক কবি ভীমা ধীবর **'কপট পাশা'** শীর্ষক মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেন। মহাভারতের এই অনূদিত কাব্যটিকে পুস্তিকার আকারে এবং মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করেন কাঁথির নীহার প্রেস। গ্রন্থটির ষষ্ঠ সংস্করণ আমাদের সংগ্রহে আছে। নীহারের প্রকাশিত বেশিরভাগ পুস্তিকায় প্রকাশকাল উল্লেখ আছে অথচ এই পুস্তিকাটির কোন প্রকাশকাল উল্লিখিত নেই। এর কারণ আমাদের কাছে অজানা। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে শুধু প্রকাশকাল নয়, কবির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। পুস্তিকার প্রচ্ছদপত্র নিম্নরূপ ঃ

"কপট পাশা/ষষ্ঠ সংস্করণ/কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত/মূল্য - ৮.০০ টাকা মাত্র।"

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৪ক দ্রষ্টব্য)

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রের চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ১৩.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। পুস্তিকাটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), মূলগ্রন্থ (৪২), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ মোট ৪৪টি পৃষ্ঠা আছে।

অনুবাদের প্রথম কয়েকটি চরণ এইভাবে শুরু হয়েছে — "**কপট পাশা/প্রথম ছান্দ—রাগ নলিনী গৌড়া/জয় জয় বিঘ্নরাজ, গৌরী নন্দন/পৃথুল উদর নাথ ইন্দুর বাহন হে।।**"

কবি পরিচিতি ঃ

'**কপট পাশা**' কাব্যটির কবি ভীমা ধীবর। ভীমা ধীবর সম্বর্কে বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া গেলে যথাস্থানে আলোচনা করা সম্ভবপর হতো। কবি প্রত্যেকটি ছাঁদের শেষে ভণিতায় নিজের নামোল্লেখ করেছেন। নিজের দোষ-ক্রুটী স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করেছেন এবং কবি নিজেকে মহাভারত রচনাকর্মে অযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

"শুন হে সুজন জন মু ছার পামর হীন
কহিবাকু যোগ্য নিকী মহাভারত।
অর্থকু অর্থ মিশাই পদকু পদ পকাই
ছন্দ প্রতি বন্ধরে মু কলই গীত।।
সাধু জন ন ঘেন দোষ।
কহে হীন ভীমা কৃষ্ণ চরণে আশ।।"

বঙ্গানুবাদ : 'শোন হে সুজন জন, আমি হীন পামর ব্যক্তি। মহাভারত বলবার মতো যোগ্য নই। অর্থকে অর্থের সাথে মিলিয়ে, পদের পর পদ নির্মাণ করে এবং প্রতিটি পদে ছন্দের বন্ধন গড়ে গীত রচনা করলাম। সাধুজন আমার দোষ ক্রুটী মার্জ্জনা করবেন। কৃষ্ণের চরণে হীন ভীমা ধীবর এই কথা বলতে চাইছে।'

কবি ভীমা ধীবর তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও কোন আত্মপরিচয় প্রদান করেন নি। জন্মস্থান, বাসস্থান, পিতা-মাতার নামোল্লেখ কোথাও করেন নি। শুধুমাত্র দশম ছান্দ অর্থাৎ শেষ ছাঁদ শেষ করবার সময় নিজের বংশপরিচয় খুব সংক্ষিপ্ত রূপে দিয়েছেন। কবি আত্মপরিচয় দানে খুবই কৃপণ।

নিজের কুল বা জাতি পরিচয় দিয়েছেন কাব্যের শেষে এইরূপ—

"এ যে কপটপাশা অমৃত রস যে।

সুজন মানে এই রসরে বস হে।।

নুহে মহৎ জাতি কৈবৰ্ত্ত শুদ্ধ অশুদ্ধ ন যেন চিত্ত।

কহই ভীমা প্রভূ চরণে সৰ্ব্বদা আশ হে।।"

কবি বলেছেন তিনি কৈবৰ্ত্ত জাতির মানুষ। তাঁর মন শুদ্ধ-অশুদ্ধ ধারণায় আবদ্ধ নয়। প্রভূ কৃষ্ণের চরণের প্রতি তাঁর আশা। কবি **'কপটপাশা'** কাব্যের রসকে অমৃতরস বলেছেন। সুজন ব্যক্তিগণ এই রসে মত্ত থাকেন। সাধারণত **'ধীবর'** শব্দটি এখানে পদবী রূপে কবি ব্যবহার করেন নি। 'ধীবর' সম্প্রদায় আসলে তপশীলি জাতি বিশেষ। যাদের জীবিকা বা পেশা মৎস্য শিকার। কবির জন্ম এই রকম এক অন্তজ বংশে। ওড়িশার এই কবি সম্পর্কে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন কোন বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না। প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর **'ওড়িয়া সাহিত্য'** গ্রন্থে বলেছেন ***"ওড়িশার দিব্যসিংহ দেবের সময় কালের কবি ভীমা ধীবর। ভীমা ধীবরের কপটপাশা ওড়িয়া ভাষায় প্রসিদ্ধ; মহাভারত হইতে দ্রৌপদীর অপমান আখ্যান বস্তু লইয়া বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে ওড়িয়া ধীবর সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।"*** [২] ওড়িশার রাজা প্রথম দিব্যসিংহদেব ১৬৮৯ - ৯০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩] এবং ১৭১৬ সাল পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা আক্রমণ করেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হন। সেইসময় প্রথম দিব্যসিংহদেব আত্মগোপন করেন। সুতরাং ভীমা ধীবরের **'কপটপাশা'** কাব্যটির রচনাকাল ১৬৮৯ থেকে ১৭১৬ সালের মধ্যে হবে। **'কপটপাশা'** কাব্যে ধীবর সমাজের পরিচয় আছে বলে প্রিয়রঞ্জন সেন যে মন্তব্য করেছেন আমাদের প্রাপ্ত পুস্তিকায় সেই জনজীবনের কোন বিস্তৃত পরিচয় নেই। এই পুস্তিকা হয়তো মূল পুথির খণ্ডাংশ মাত্র। সেই কারণে এই কাব্যের সম্পূর্ণরূপ গবেষকের হস্তগত হয়নি। শুধুমাত্র দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগের এই কাব্যের কোন পুথিপত্র নীহার প্রেসের সংগ্রহে নেই। বর্তমান **নীহার প্রেস**-এর কর্মকর্তা নীতিন্দ্রনাথ জানা বলেন যে, ***"সকল পুথি ঠাকুরদা বা বাবার আমলে ছিল, বর্তমান তা সংরক্ষণের অভাবে পোকায় কেটেছে বা জল-বাতাসে নষ্ট হয়ে গেছে।"***

প্রথম পদবন্ধে বা ছান্দে কবি ভীমা ধীবর গণেশ বন্দনা করে গ্রন্থ সূচনা করেছেন। ওড়িয়া মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ঝঙ্কড় পুরবাসী সারলা দাসের প্রতি বন্দনা করে কবি ভীমা ধীবর

অগ্রজ কবির চরণে ভক্তি নিবেদন করেছেন। উল্লেখ্য যে পঞ্চদশ শতকে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে (১৪৩৫ - ৬৭) কবি সারলা দাস ওড়িয়া ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন। স্বাভাবিকভাবে ভীমা ধীবরের অগ্রজ কবি সারলা দাস। সারলা দাসের প্রভাব ভীমা ধীবরের উপর পড়েছে।

কাব্য-কাহিনী ঃ

'কপট পাশা' কাব্যটি মহাভারতের কাহিনী নির্ভর রচনা। কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের পাশা খেলার বিষয়কে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিন্যাস ঘটেছে। সম্পূর্ণ কাব্যকাহিনীটি দশটি ছাঁদ বা ছান্দে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছান্দে স্বতন্ত্র রাগের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে মহাভারতের এই বিশেষ কাহিনীটি গীতের উদ্দেশ্যে রচিত হয়।

দ্বিতীয় পদবন্ধে মূল কাব্য-কাহিনীর শুরু হয়েছে। এই পদবন্ধে কবি শুরু করলেন এইরূপ— বিলঙ্কা দেশের বৈবসুত মনু রাজা অগস্ত্য মুনির চরণ ধরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন এবং ধূপ-দীপে ও উত্তম নৈবেদ্যে, বিনয় ভক্তিতে মুনির পূজা করলেন। ব্রহ্মবেত্তা কর্তা মহামুনি অগস্ত্যের নিকট হাতজোড় করে রাজা মনু মহাভারতের কথা শুনতে চাইলেন। অগস্ত্য মুনি রাজাকে যুধীষ্ঠির এবং দুর্যোধনের পাশা খেলার ঘটনা ও তার আদ্যোপান্ত বিবরণ শোনালেন। সেই পাশা খেলায় যুধীষ্ঠির পরাজিত হন এবং সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেন। পণ স্বরূপ দ্রৌপদীকে হারাতে বসেন। সেই সুযোগে দুর্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের জন্য অনুমতি দেয়। তৎক্ষণাৎ দুঃশাসন কোন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ভ্রাতৃ আদেশ পালন করতে অগ্রসর হন।

তৃতীয় ছান্দে দুঃশাসন বায়ুগতিতে দ্বাদশ যোজন পথ অতিক্রম করে বারুণাবন্ত নগরে পৌঁছে যায়। বারুণাবন্ত নগরের নগরবাসী তার কণ্ঠস্বর শুনে পলায়ন করেন। সিংহদ্বার দিয়ে দুঃশাসন প্রবেশ করেন। দ্বাররক্ষীরা মাতা কুন্তীকে এই খবরটা দিয়ে আসে। এই কথা শুনে কুন্তী সিংহদ্বার অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কুন্তী দুঃশাসনের কাছে জানতে চান যে, দুঃশাসন বিনা অনুমতিতে কেনবা প্রবেশ করেছেন। শৃগাল হয়ে সিংহের ভবনে কোন সাহসে প্রবেশ করেছে। দুঃশাসন করজোড়ে জানান যে, কুন্তীর পুত্র মন্দকর্ম করার জন্য দুর্যোধনের অনুমতিক্রমে এহেন কার্যের স্পর্ধা পেয়েছেন। দুঃশাসন বলেছে যে, যুধীষ্ঠির পাশা খেলায় দুর্যোধনের নিকট সর্বস্ব পণ

রেখে পরাজিত হয়েছেন এবং দ্রৌপদীকে পণ স্বরূপ রাখার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। এহেন কারণে সভাস্থলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উদ্দেশ্যে বারুণাবন্তপুর থেকে দ্রৌপদীকে হস্তিনাপুরের রাজসভায় তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্রাতা দুর্যোধন তাকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, দুঃশাসন কুন্তীকে বলে দ্বার ছেড়ে দিতে। কারণ অন্দরমহলে প্রবেশ করে সে দ্রৌপদীকে নিয়ে যেতে চান। প্রত্যুত্তরে কুন্তী বলেন যে, দ্রৌপদী কৌরবের কী এমন ক্ষতি করেছে? দুঃশাসন কোন কথা শুনতে চায় না, সে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে যেতে চায় হস্তিনাপুরের রাজসভায়। উপায়ান্তর না পেয়ে দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষ যথা– নেত্রপুর, বাসপুর, ডালিম্বপুর, ঝিনপুর, কৌস্তভমণিপুর, ইন্দ্রআকাশপুর ইত্যাদি স্থানে আত্মগোপন করতে থাকেন। সুশোভিত রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ গৃহকক্ষ যুধীষ্ঠিরের শয়ন কক্ষ। সেই কক্ষে দুঃশাসন গিয়ে দ্রৌপদীর অন্বেষণ করে বিফল হয়ে অবশেষে রন্ধনশালায় প্রবেশ করেন। পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের বিভা নিয়ে কে যেন রন্ধনশালার এককোণে বসে আছে। দুঃশাসন বুঝতে পারে যে, তার লক্ষ্য ভ্রান্ত নয়, সে দ্রৌপদী। রন্ধনশালায় দ্রৌপদীকে দেখামাত্র দুঃশাসন তার কেশ আকর্ষণ করে টানতে টানতে রন্ধনশালার বাইরে নিয়ে আসে।

কাহিনীর পরবর্তী সময়ে সভাস্থলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্বে পঞ্চপাণ্ডবকে ধিক্কার জানায় দ্রৌপদী। ভীমকে উদ্দেশ্য করে দ্রৌপদী বলেছে—

"দ্রৌপদী বলে আহে পাবনি ধিক তুম্ভর প্রাণ।
নির্লজ্জ হোই জীয় কীপাঁই পাণ্ডব পাঞ্চজন।।
লজ্জা তুম্ভর নাহি মুখর মনে রখিল নাহি।
তুম্ভকু আশ্রে করিণ মুহি অনাথা হোইলই।।
তুম্ভে মহত বোলি বহুত আশ্রে মু করি থিলি।
অনাথা নারী পরায়ে হোই বিঅর্থে দিন নেলী।।
লক্ষ্যে নৃপতি মধ্যরু মতে কিপাঁ আনিল জিনি।
পাঞ্চ গেরস্থ থাউ মো কেশ ধইলা পুণি।।
ধিক তুম্ভর গদা কোদণ্ড ধিক তুম্ভর বাহা।
পামর দুঃশা উলঙ্গ করে জনে নহিলে সাহা।।"

বঙ্গানুবাদ :

দ্রৌপদী বলে ওহে পাবনী ধিক্ তোমার প্রাণ।
নির্লজ্জ তব পঞ্চভ্রাতা না রক্ষিলে কুল মান।।
তব অন্তরে নাহি যে লাজ ভুলিলে আমার কথা।
তোমা আশ্রয়ে থাকি যে আমি হইলাম অনাথা।।
তুমি মহৎ ভেবে আমি তোমার আশ্রয়ে ছিলাম।
অনাথা হয়ে মান সম্ভ্রম সবকিছু হারালাম।।
লক্ষ নৃপতির সভাস্থলে জিনিয়া আনিলে মোরে।
পঞ্চস্বামীর সম্মুখেতে পরপুরুষ কেশ ধরে।।
ধিক তোমার মুষল খ্যাতি ধিক তোমার বিভা।
দুঃশাসনে হরিল বস্ত্র পৌরুষ তব কিবা।।

চরিত্র-চিত্রণ ঃ

'কপটপাশা' কাব্যটিতে পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় নারী চরিত্র বিশেষ করে কুন্তী ও দ্রৌপদী চরিত্র দুটি স্বপ্রভ ও প্রতিবাদী। পঞ্চপাণ্ডব তুলনায় কৌরবরা এই কাব্যে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ ধরে রাখতে পেরেছেন। বিশেষ করে দুঃশাসন চরিত্রটি দুর্যোধনের আজ্ঞাবহ হলেও তার কাপুরুষতার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব - তথা পঞ্চপাণ্ডব কৌরবের কাছে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে অসহায়, ভীরু ও দুর্বল পুরুষের মতো নিষ্প্রভ থেকেছে।

দ্রৌপদী চরিত্রটি পঞ্চপাণ্ডবের পৌরুষের কাছে আশাবাদী থাকলেও বস্ত্রহরণের সময় সে আশাহত হয়েছে। যে শৌর্য-বীর্যের কারণে পঞ্চপাণ্ডবকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন সেই বীরত্ব দ্রৌপদী পাণ্ডবের মধ্যে দেখতে না পেয়ে সে সোচ্চার কণ্ঠে পঞ্চপাণ্ডবকে ধীক্কার জানিয়েছে। এই চরিত্রটি প্রথম থেকে নিয়তির উপর ভরসা না রেখে পাণ্ডবের বাহুবল ও বীরত্বের প্রতি আস্থাশীল থেকেছেন। এক্ষেত্রে মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন লজ্জানিবারণ শ্রীহরির প্রতি গভীর ভক্তি ও ভরসা দেখিয়েছেন **'কপটপাশা'র** দ্রৌপদী কিন্তু বাহুবলী ও কর্মবীর পাণ্ডবের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে বাস্তবোচিত বোধে নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছেন। যদিবা শেষপর্যন্ত তাকে আশাহত হয়ে শ্রীহরির শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

কুন্তী চরিত্রটির বাৎসল্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে অর্থাৎ ভাইদের মধ্যে কলহ ও অশান্তি সমীচিন নয় - একথা বারবার কুন্তী দুঃশাসনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন —

"সোদরে সোদরে পুণি   হেউ অছি হণাহণি
কহ দ্রৌপদী কি দোষ করিছি তঁহি।"

(পৃষ্ঠা - ৬)

দুঃশাসনের নিষ্ঠুরমূর্তি অঙ্কন করতে গিয়ে কবি ভীমা ধীবর অসহায় দ্রৌপদীর ভীত ও সন্ত্রস্ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে —

"দ্রৌপদী ভয় পাই   আকুলে অঙ্গ খরই
তর তর হোই উঠি গলে পলাই।
কেশ পাশ কটি বাস   ফিটি বহে খর শ্বাস
রোশাইশাল মধ্যরে লুচিলে যাই।।
ব্যাধ ভয়ে যেহ্নে মৃগণী।
চঞ্চল নয়ন মুখু ন স্ফূরে রাণী।।"

(পৃষ্ঠা - ৭)

সুতরাং বরুণাবন্তপুরের অন্দরমহল থেকে পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন দুর্যোধনের আজ্ঞাবাহক দুঃশাসন। ভয়ে ভীত দ্রৌপদীর অঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। আলুলায়িত কেশে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে দ্রৌপদী রন্ধনশালায় আত্মগোপন করে ব্যাধের ভয়ে মৃগী যেমন ভীত হয় এবং চঞ্চল নয়নে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে শিকারীর দিকে তাকিয়ে থাকে অনুরূপভাবে দ্রৌপদীও দুঃশাসনের দিকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এই কাব্যে মনুষ্যেতর চরিত্র গরূড় এক প্রভুভক্ত চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্রৌপদীর আর্তনাদে শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে যাবেন তখন গরূড় সর্বান্তকরণে শ্রীকৃষ্ণকে বহন করে সেখানে নিয়ে গেছে। গরূড়ের প্রভুভক্তির একটি নিদর্শন এইরূপ —

"শুনি করি খগবর বেগে অইলা।
লক্ষেক যোজন ডেনা বিস্তারি দেলা।।
গোবিন্দ সুমরি পক্ষী গলাক চলি।
ক্ষণক ভিতরে যাই দ্বারকা মিলি।।
আস্তানা উপরে বসি ছন্তি গোশাঁই।
পদ্মপাদ তলে পক্ষী পড়িলা যাই।।"

(পৃষ্ঠা - ৩১)

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

'কপটপাশা' কাব্যটি মুলত আখ্যানগীতি জাতীয় রচনা। এই কাব্যটির একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম গান। মহাভারতের এই খণ্ড কাহিনীর কাব্যটির কথকতাধর্মী। বৈঠকি ঢঙে এই কাহিনী গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। এই কাব্যে যে রাগসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে সেগুলি নলিনী গৌড়া, বঙ্গলাশ্রী, ছেখী, রণবীজ, চক্রকেলী, চিন্তা দেশাক্ষ, কালি, সঙ্গমতিয়ারী বাণী, কলহংস কেদার, পাহাড়িয়া কেদার। এই রাগ-রাগিনীগুলি ওড়িয়া গানের ঘরানায় যেমন লক্ষ্য করা যায় আবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মধ্যে এগুলির কয়েকটি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। কলহংস, কেদার, পাহাড়িয়া কেদার ইত্যাদি রাগগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগরূপে ব্যবহৃত হয়।

ছন্দ ও অলংকার ঃ

'কপটপাশা' কাব্যটি ৮+৬=১৪ মাত্রার চরণ বিশিষ্ট পয়ারে লেখা। সাধারণত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পয়ারে এইরূপ ৮+৬=১৪ মাত্রার পয়ার লক্ষ্য করা যায়। কবি ভীমা ধীবর এই কাব্যে শুধুমাত্র পয়ার ছন্দের প্রয়োগ করেননি ৬+৬+৮ মাত্রার লঘু ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহারও করেছেন। ছন্দ বিন্যাসের ক্ষেত্রে নানাভাবে বৈচিত্র্য এনেছেন। কবি অনেক ক্ষেত্রে ৮+৮+৮+৫ মাত্রা বিশিষ্ট দীর্ঘ চৌপদী ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

কবি প্রথম ছান্দে ৮+৬=১৪ মাত্রার চরণ সাজিয়ে পয়ার ছন্দ ফুটিয়ে তুললেন এইভাবে —

জয় জয় বিঘ্নরাজ/গউরী নন্দন। ৮+৬
পৃথুল উদয় নাথ/ইন্দুর বাহন।। ৮+৬
(পৃষ্ঠা - ১)

দ্বিতীয় ছান্দে কবি ৬+৬+৮ মাত্রার লঘু ত্রিপদীকে চিরাচরিত তিনটি চরণে বিন্যস্ত না করে একটি দীর্ঘ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যেমন —

এথু অনন্তরে/বিলঙ্কা দেশরে/বৈবসুত মনু রাজা। ৬+৬+৮
অগস্তি চরণ/ধরি নৃপরাণ/কলে ধূপ দীপে পূজা।। ৬+৬+৮
(পৃষ্ঠা - ২)

কবি তৃতীয় ছান্দে হস্তিনাপুর প্রাসাদের অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন ৮+৮+৮+৫ মাত্রা বিশিষ্ট দীর্ঘ চৌপদী ছন্দের মাধ্যমে। নিম্নে এই ছন্দের নিদর্শন তুলে ধরা হল —

"চারি ক্রোশ দীর্ঘ প্রতি	**অটই সে পুরস্থিতি**	৮+৮
হীরা নীলা খঞ্জা	**অছি অষ্ট রতন।**	৮+৮
ক্ষুদ্রমতি কেরা কেরা	**লম্বিছি মুকুতা ঝরা**	৮+৮
প্রবালর স্তম্ভ হোই	**অছি শোভন।।"**	৮+৬
	(পৃষ্ঠা - ৭)	

গ্রন্থ ২.অনন্ত ব্রত, কবি -দ্বিজ অনিরুদ্ধ ঃ

ওড়িয়া ভাষার জনৈক কবি দ্বিজ অনিরুদ্ধ **'অনন্ত ব্রত'** শীর্ষক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের অপর নাম **'কৃষ্ণ-যুধীষ্ঠির সংলাপ'**। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর জ্ঞাতি-বন্ধু নাশের পাপ থেকে উদ্ধারণের জন্য যুধীষ্ঠির দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনন্ত ব্রত পালনের মাধ্যমে পাপস্খালনের পরামর্শ দেন। মহাভারতের **'বনপর্ব্বে'** এইরূপ কাহিনী আছে। সুতরাং **'অনন্ত ব্রত'** কাব্যটি মহাভারতের অংশবিশেষ নিয়ে ভাবানুবাদ করেছেন কবি। গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। পুস্তিকাটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থের

প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> ***"(All right reserved)/অনন্ত ব্রত/পঞ্চম সংস্করণ/কাঁথি নীহার প্রেস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত/সন ১৩৪৩ সাল।/মূল্য ৫.০০ পাঁচ টাকা মাত্র।"***

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৪খ দ্রষ্টব্য)

পুস্তিকাটির চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। মাঝখানে নীহার প্রেসের নির্দিষ্ট লোগো মুদ্রিত আছে। গ্রন্থটি ১৩.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। পুস্তিকাটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র (১), মূলগ্রন্থ (২৯), পশচাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ মোট ৩২টি পৃষ্ঠা আছে।

অনুবাদটি শুরু হয়েছে এভাবে —

> ***"অনন্ত ব্রত/* * * */গ্রন্থারম্ভ/ঃ০ঃ/কৃষ্ণ গণেশ পদাম্বুজ। নমই অনিরুদ্ধ দ্বিজ।। অনন্ত ব্রত ভাষা কিছি। ভাষা প্রবন্ধে কহু অছি।।"***

কাব্য-কাহিনী ঃ

'অনন্ত ব্রতে'র কাহিনীবস্তু শুরু হয়েছে কৃষ্ণ ও গণেশ বন্দনা দিয়ে। কবি কাব্য শুরুতে নিজের নামমাত্র উল্লেখ করে পরিচিতি প্রদান করেছেন এইভাবে —

> **"কৃষ্ণ গণেশ পদাম্বুজ**
> **নমই অনিরুদ্ধ দ্বিজ"   (পৃষ্ঠা ঃ ১)**

কাব্যকাহিনীর উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি ভবিষ্যতোত্তর পুরাণের ঋণ স্বীকার করেছেন এইরূপ—

> **"অনন্ত ব্রতর মহিমা**
> **কে জানি পারে গুণ সীমা।।**
> **ভবিষ্যতোত্তর পুরাণ।**
> **তঁহি অনন্ত ব্রত গুণ।।"   (পৃষ্ঠা ঃ ১)**

কাব্যের শুরুতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং যুধীষ্ঠির শ্রোতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয়, জ্ঞাতি, ভ্রাতৃবর্গ বিনাশের যে পাপ যুধীষ্ঠির তা স্খালন করতে চায়। কৃষ্ণের কাছে এই পাপ স্খালনের বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে কৃষ্ণ তাঁকে অনন্ত ব্রতের মহিমা সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বিবরণ দেন এবং অনন্ত ব্রত পালনের বিধান দেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকটি উপকাহিনী আছে।

মূল কাহিনীটি এইরূপ — বশিষ্ঠ গোত্রে জন্ম সুমন্ত নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তার স্ত্রীর নাম দীক্ষা। দীক্ষার গর্ভে জন্ম নেয় তাদের একমাত্র সন্তান শীলা। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে এক রূপবতী ও গুণবতী কন্যা। কালক্রমে ব্রাহ্মণ পত্নী দীক্ষার অকাল মৃত্যু হওয়ায় ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম কর্কশা। যে ভীষণ কলহচারিণী এবং নিষ্ঠুরা। সতকন্যার প্রতি তার কোন মায়া মমতা ছিলনা। শীলার প্রতি সে অমানবিক অত্যাচার করতো। কন্যা শীলাবতী বিবাহযোগ্যা হওয়ায় পিতা সুমন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং কৌণ্ডিন্য মুনির সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। বিবাহে যৌতুক দেওয়ার সামর্থ্য ব্রাহ্মণ সুমন্তের ছিলনা। তা সত্ত্বেও সামান্য কিছু যৌতুক দেওয়ার জন্য মনস্থির করলে কর্কশা বাধা দান করে। অতঃপর কন্যা-জামাতাকে বিদায় দিলেন সুমন্ত। পতিগৃহে যাত্রাকালে নদী তীরে কয়েকজন স্ত্রীলোককে দেবপূজায় রত হতে দেখলেন এবং তাদের কাছে গিয়ে জানতে পারে যে তারা অনন্ত ব্রত পালন করছে। নারীদের কাছ থেকে অনন্ত ব্রতের বিবরণ ও পারণ পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নেয়। শীলা কাল বিলম্ব না করে সেই নারীদের সঙ্গে ব্রত পালন শুরু করে এবং অনন্ত বিষ্ণুর আশীর্বাদ স্বরূপ হাতে ডোর বা সূত্র বেঁধে নেয়। স্বামী কৌণ্ডীন্য স্ত্রীর এই রূপ আচার দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ হয় এবং শীলার হাতের ডোরকে ছিন্ন করে আগুনে নিক্ষেপ করে। অতঃপর কৌণ্ডীন্যের জীবনে নেমে আসে অশেষ দুর্গতি। অর্থ-বিত্ত সর্বস্ব বিনাশ হতে থাকে। শীলা স্বামীকে অনন্ত ব্রত পালনের পরামর্শ দেয়। অনন্তের দেখা পাওয়ার জন্য কৌণ্ডীন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেন। এবং সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যতদিন সে অনন্তের দর্শন না পায় ততদিন সে এইরূপ অরণ্যে, পর্বতশৃঙ্গে কৃচ্ছসাধন করে কাটিয়ে দেবেন। গভীর অরণ্যে সে একের পর এক আম্রবৃক্ষ, গাভী, বৃষভ, পুষ্করিণী, গর্দভ, হস্তীর সাথে দেখা হলে তাদের কাছে জানতে চান তারা অনন্তের দর্শনপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা। তারা কেউই অনন্তের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি বা অনন্তকে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি—এই কথা কৌণ্ডীন্যকে তারা জানায়। আশাহত হয়ে কৌণ্ডীন্য ভূমিতে মূর্ছা যায়। পথক্লেশ, উপবাসক্লিষ্ট শরীর সব মিলে মুনি কৌণ্ডীন্যের গলা, তালু ও ওষ্ঠ্য শুকিয়ে যায়। মনে মনে অনন্তকে স্মরণ করে চার দণ্ড ভূমিতে লুণ্ঠিত থাকেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুভক্তের এমতাবস্থা

লক্ষ্য করেন এবং ভক্তের প্রাণরক্ষার জন্য অনন্ত বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে গরুড় পৃষ্ঠে গমন করেন। ভক্তের নিকটে পৌঁছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু কৌণ্ডীন্যের ডান হাত ধরে তুলে নেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বিষ্ণু কৌণ্ডীন্যকে অনন্ত ব্রত পালনের পরামর্শ দেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় জানতে চাইলে শঙ্খ-চক্র-গদাধরী বিষ্ণুরূপে প্রকট হয়ে কৌণ্ডীন্যকে অনন্তপুর দর্শন করালেন। বিষ্ণুর শরণাগত হয়ে কৌণ্ডীন্য পাপমোচনের জন্য বিণীত প্রার্থনা করলে তাকে অনন্ত ব্রত পালনের কথা বলেন। কাহিনীর সমাপ্তি অংশে দেখি কৌণ্ডীন্য ভক্তিভরে চতুর্দশ বৎসর ব্যাপী অনন্তব্রত পালন করার পর সর্বস্ব ফিরে পান এবং লোকান্তরিত হয়ে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হয়ে নক্ষত্রলোকে বিরাজ করেন।

উপরোক্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে গভীর অরণ্যে সাক্ষাৎ হওয়া আম্রবৃক্ষ, গাভী, বৃষভ, পুষ্করিণী, গর্দভ ও হস্তীর পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কুকর্মের বিবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকাহিনী রূপে অনন্তের মহিমাকে প্রামান্য করার চেষ্টা করেছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে এই উপকাহিনীগুলি সম্পৃক্ত। মূলকাহিনীকে এই উপকাহিনীগুলি সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

চরিত্র-চিত্রণ ঃ

এই কাব্যে কর্কশা চরিত্রটির কলহকারিণী স্বভাব এবং সতীন কন্যা শীলার প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে কবি বলেছেন —

“কর্কশা কলহা করণী।
দুঃশীলা দুষ্টা সে কোপিনী।।
নিত্যে সে কলহ করই।
পতিঙ্কু দুষ্ট বাক্য কহি।।” (পৃষ্ঠা - ৬)

ব্রাহ্মণ কৌণ্ডীন্য কন্যা শীলার বিবাহে জামাতাকে যৌতুক দেওয়ার জন্য স্ত্রী কর্কশার সম্মতি চাইতে গেলে কর্কশা স্বামীর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে কবি ফুটিয়ে তুলেছে এইভাবে —

“ভর্ত্তা বচনে সে কর্কশা।
ক্রোধরে কহই দুর্ভাসা।।

কর্কশা কর্কশ কহিলা।
কর্কশ বাক্যে গালি দেলা।।"   (পৃষ্ঠা - ৭)

শীলা চরিত্রটি এই কাব্যের মুখ্য নারী চরিত্র। এই চরিত্রের মাধ্যমে কবি অনন্ত ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। শিশুকাল থেকে শীলা বিমাতার সংসারে সকল ঘরকন্নার কাজে পটু। দেব-দ্বিজে এবং অনন্তের প্রতি তার বিনম্র ভক্তি। এই ভক্তিমতী কন্যা চরিত্রে কবি একদিকে দেখিয়েছেন পিতা-মাতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও অপরদিকে পবিত্র পাতিব্রত। গৃহকর্মে তার নৈপূণ্য ও পারিপাট্যের মধ্যে তার অনন্তভক্তিকে কবি দ্বিজ অনিরুদ্ধ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন —

"এমন্তে শুনি সে যে শীলা।
পিতার গৃহে থাই বালা।।
গৃহ মার্জ্জন নিত্য করে।
লেপই গোবর মন্দিরে।।
চারি বর্ণরে রঙ্গ কৃত।
শুক্ল হরিদ্রা কৃষ্ণ রক্ত।।
এমন্তে চূর্ণ বর্ণ করে।
শঙ্খ চক্রাদি লেখে দ্বারে।।
ঘর বাহার যত্ন করে।
নিজ শরীর সে প্রকারে।।"   (পৃষ্ঠা - ৬)

কৌণ্ডীন্য চরিত্রের প্রথম দিকে কবি নাস্তিক স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনন্ত ব্রত পালন করে শীলা যখন হাতে ডোর বাঁধে তখন সে তা ছিঁড়ে ফেলে আগুনে নিক্ষেপ করে। অনন্ত তার প্রতি বিরূপ হলে সে তার সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলে। অতঃপর শীলার পরামর্শক্রমে কৌণ্ডীন্য অনন্তের অস্তিত্ব তথা স্বরূপ দর্শন করবার জন্য অরণ্যচারী হয় এবং পর্বতশৃঙ্গে বৈরাগ্য জীবন অতিবাহিত করে। এই চরিত্রের মাধ্যমে কবি বিষ্ণুভক্তের ভক্তির একাগ্রতা ও কঠিন কৃচ্ছসাধনের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অনন্তের দর্শনলাভের পর তিনি অনন্তকে পূজা করবেন বলে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন —

"যদি মু দর্শন পাইবি।
তেবে মু অনন্তে পূজিবি।।
এতেক মনরে বিচারি
বৈরাগ্য জন্মিলা তাহারি।।" (পৃষ্ঠা - ১৩)

ভাষা ঃ

'অনন্ত ব্রত' কাব্যটির ভাষা ওড়িয়া। ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরের পাঠকের কাছে এই ওড়িয়া ভাষার কাব্য মোটেই দুর্বোধ্য নয়। এই কাব্যের যে শব্দরূপ তা ওড়িয়া হলেও সহজ ও সরল হওয়ার কারণে মেদিনীপুরের পাঠকের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠেছে। শব্দরূপের মধ্যে কোথাও কোথাও প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের মৌখিক প্রচলিত শব্দগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন —

"শুভ কামনা সর্ব্বে পাই
স্তীরি পুরুষ যে করই।।" (পৃষ্ঠা - ২)

'স্ত্রী' শব্দটির মধ্যে যুক্তব্যঞ্জন বর্ণের বিশ্লেষ ঘটিয়ে শব্দটির উচ্চারণে অনায়াস সারল্য এনেছেন।

কাব্যটির মধ্যে প্রশ্নসূচক শব্দগুলি এতদঞ্চলের খুব পরিচিত শব্দ, যেমন — কেঁউ - কেমন, কেমন্তে - কীভাবে, কিমতে - কীপ্রকারে, কেঠারে - কোনদিকে, কেঅবা - কেবা, কাহাকু - কাকে, কেতে - কত, কিপাঁই - কীকারণে ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ঃ ৫, ১৬, ১৫-১৬, ১২ দ্রষ্টব্য)। ওড়িয়া ভাষায় অভিধানগতভাবে এই ওড়িয়া প্রশ্নসূচক শব্দগুলি সিদ্ধ হলেও এই অঞ্চলের ওড়িয়া ভাষী বাঙালির মুখেও শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়।

মহাভারতের কাহিনীবস্তুর উপর নির্ভর করে দ্বিজ অনিরুদ্ধ এই কাব্যটি রচনা করেছেন। স্বাভাবিক কারণে ক্লাসিক্যাল রীতিতে কাব্যের কায়া-কাঠামো নির্মাণ হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই ব্রতকথা জাতীয় সাহিত্যে তা হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সমগ্র কাব্য শরীর জুড়ে তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন — মাণিক্য, মুকুতা, সুবর্ণ, ধান্য, ভৃত্য, বস্ত্র, অগ্নি, দুগ্ধ ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ঃ ১১-১২ দ্রষ্টব্য)। কাব্যের চরণে তৎসম শব্দমালার অনুপম শোভা লক্ষণীয়, যেমন—

“পদ্ম কুমুদ যে কহ্লার।

উৎপলে শোভিত ভ্রমর।।” (পৃষ্ঠা ঃ ১৫)

অথবা অনন্তের রূপ বর্ণনায় কবি ধ্রুপদী সাহিত্য কলার দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এইরূপ—

“অনন্ত রূপ চতুর্ভুজ।

শঙ্খ চক্রাদি শোভা তেজ।।

গদা পদ্মরে হস্ত যুক্ত।

শ্রীবৎস চিহ্নরে শোভিত।।

কটীরে পীতবস্ত্র শোভা।

তিলেক কস্তুরিরে শোভা।।” (পৃষ্ঠা ঃ ২০)

‘নবাক্ষরী’ ছন্দে অর্থাৎ নয়টি অক্ষরের সীমিত সামর্থ্যে প্রতিটি চরণে ধ্রুপদী সাহিত্যের মেজাজটিকে ফুটিয়ে তুলতে কবি সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

দ্বিজ অনিরুদ্ধের রচিত **‘অনন্ত ব্রত’** গ্রন্থটি সাধারণ মানুষের কাছে **‘কৃষ্ণ-যুধীষ্ঠির সংলাপ’** নামে পরিচিত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে অনন্ত ব্রতের উদ্‌যাপন করেন কলিঙ্গবাসী। ভাদ্রমাসের শুক্ল চতুর্দশীতে অনন্তব্রতের মাধ্যমে অনন্তদেব বিষ্ণুর উপাসনা শুধু উৎকলদেশে নয় ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে এই ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়।[৫] সেই অনন্ত ব্রতের ফলাফল এবং বিধি-বিধান নিয়ে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে পারস্পারিক সংলাপ আছে এই গ্রন্থে। মোক্ষলাভের পন্থা-পদ্ধতির নির্দেশই এই গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। **‘অনন্ত ব্রত’** নামে এই কৃষ্ণ-যুধীষ্ঠির সংলাপের কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব থেকে নেওয়া। দ্বিজ অনিরুদ্ধের ভণিতায় মহাভারতের বনপর্বের অপর একটি অংশ নিয়ে লেখা **‘সাবিত্রী ব্রতকথা’** নামক কাব্যটিও নীহার প্রেস প্রকাশ করেছে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী এর মুখ্যবস্তু। উষাব্রত পালনের মাধ্যমে সাবিত্রীর পাতিব্রতের পরিচয় এবং মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার কাহিনী এক্ষেত্রে বর্ণিত। ওড়িয়া নবাক্ষরী ছন্দে কাব্যটি রচিত। সহজ-সরল ভাষা এবং সুবোধ্যতা এই দুটি কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নীতিকথাধর্মী এই দুই কাব্যের মাধ্যমে নারীর চরিত্র নির্মাণ ও পাতিব্রতের প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান পরিলক্ষিত। ব্রত পালনের মাহাত্ম্য ও মোক্ষলাভের

কথাও বর্ণিত হয়েছে কাব্য দুটির শেষাংশে। মহাভারতের বনপর্বের কাহিনী নির্ভর এই দুটি কাব্য যথা **'অনন্তব্রত'** এবং **'সাবিত্রী ব্রতকথা'** রচনার শুরুতে কবি গণেশবন্দনা দিয়ে কাব্যের সূচনা করেছেন।

ছন্দ ঃ

'অনন্ত ব্রত' কাব্যটিতে কোন ছন্দ বৈচিত্র্য নেই। বাংলা ব্রতকথা জাতীয় সাহিত্যগুলি যেমন পয়ার ছন্দে আগাগোড়া নির্মিত থাকে ঠিক অনুরূপ ওড়িয়া ব্রতকথাধর্মী এই **'অনন্ত ব্রত'** কাব্যটিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **'নবাক্ষরী বৃত্তে'** রচিত। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে **'নবাক্ষরী বৃত্তের'** ব্যবহার প্রথম শুরু করেন **'পঞ্চসখা'**র অন্যতম কবি **'ভাষাবন্ধ ভাগবত'** -এর রচয়িতা জগন্নাথ দাস। এই সম্পর্কে প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর **'ওড়িয়া সাহিত্য'** গ্রন্থে বলেছেন —

> **''জগন্নাথ সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং নূতন এক ছন্দের সৃষ্টি করেন। নয়টি অক্ষর দিয়া এই ছন্দের সৃষ্টি, তাই ইহার নাম নবাক্ষরী বৃত্ত।"**[৫]

চরণান্তিক মিল যুক্ত নবাক্ষরী বৃত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি চরণে নয়টি করে অক্ষর বিন্যাস থাকবে। এক্ষেত্রে **'অক্ষর'** কথাটি **Syllable** নয়, একটি বর্ণ। সুতরাং প্রতিটি চরণে সর্বমোট বর্ণসংখ্যা থাকবে৯। **'অনন্ত ব্রত'** থেকে নেওয়া একটি নিদর্শন —

''কৃষ্ণঙ্কু দেখি যুধীষ্ঠির।	৯
নম্র ভাবরে যোড়ি কর।।	৯
ধর্ম্মাত্মা কুন্তীর কুমর।	৯
কহন্তি করি নমস্কার।।"	৯ (পৃষ্ঠা ঃ ২)

অলংকার ঃ

অলংকার সৃষ্টিতে কবি বৈচিত্র্য আনতে পারেন নি। সাদামাঠা ভাষায় অনন্ত তথা বিষ্ণুর মহিমা জ্ঞাপন করেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী পরিবেশন করেছেন

সহজ-সরল ভাষায়। এই কাব্যে কদাচিৎ বৃত্তানুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ করেছেন কবি। কর্কশা চরিত্রটির স্বভাব-প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন এইরূপ —

''কর্কশা কলহা করণী।
দুঃশীলা দুষ্টা সে কোপিনী।।'' (পৃষ্ঠা ঃ ৬)

কিংবা অনন্তব্রত পালনে স্বামী কৌণ্ডিন্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে শীলা স্বামীর প্রতি বলেন —

''কি কল কি কল হে কান্ত,
কাহিকি নষ্ট কল ব্রত।'' (পৃষ্ঠা ঃ ১২)

কবি পরিচিতি ঃ

'অনন্ত ব্রত' কাব্যের কবি-পরিচিতি বা কবির কোন প্রামান্য পরিচয় পাওয়া যায়নি। আলোচ্য পুস্তিকাটির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় নীহার প্রেস কবির নামোল্লেখ করেনি। সমগ্র রচনাটির মধ্যে শুধুমাত্র **'গ্রন্থারম্ভ'** অংশের দ্বিতীয় চরণে কবির নামমাত্র উল্লেখ আছে —

''কৃষ্ণ গণেশ পদাম্বুজ।
নমই অনিরুদ্ধ দ্বিজ।।'' (পৃষ্ঠা ঃ ১)

দ্বিজ অনিরুদ্ধের বিস্তৃত কোন পরিচয় কাব্যে লক্ষ্য করা যায়না। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে **'অনন্ত ব্রত'** কাব্যের রচয়িতা রূপে দ্বিজ অনিরুদ্ধ নামে কোন কবির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। যেহেতু কাব্যটি **'নবাক্ষরী বৃত্ত'** -এ রচিত তাই ষোড়শ সপ্তদশ শতকের মধ্যে কাব্যটির রচনা করা হতে পারে বলে আমাদের অনুমান। কারণ নবাক্ষরী বৃত্তে জগন্নাথ দাস তাঁর ভাগবত রচনা করেন ষোড়শ শতকে এবং তাঁর এই সৃষ্ট ছন্দের কাব্যচর্চা প্রায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বহু কবির দ্বারা প্রচলিত ছিল। এই থাকার কারণে দ্বিজ অনিরুদ্ধের কাব্যরচনার সময় আনুমানিক ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ধরা যেতে পারে।

গুরুত্ব ঃ

ওড়িশা প্রান্তবঙ্গের মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে অনন্ত

ব্রতের পালন উপলক্ষে প্রতিটি ঘরে এই ব্রতকথার পাঠ প্রচলন আছে। স্বল্প শিক্ষিতা নারীর কাছে মহাভারতীয় বিশেষ কাহিনীনির্ভর এই ব্রতকথাটি একটি পবিত্র গ্রন্থ রূপে মর্যাদা পেয়ে আসছে। মূল ওড়িশা ভূখণ্ডে অনন্ত ব্রতের যে বিধি-বিধান পালিত হয় এই গ্রন্থে তা-ই উল্লিখিত।[৮] মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অনন্ত ব্রতের পালনীয় বিধি-বিধান এই গ্রন্থ অনুযায়ী মেনে চলা হয়। সুতরাং ওড়িশা সীমান্ত বাংলায় বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে এই গ্রন্থটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে।

গ্রন্থ ৩. সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ, কবি - শ্রীহরি দাস ঃ

ভণিতায় শ্রীহরি দাস নামাঙ্কিত ওড়িয়া ভাষায় রচিত মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে একটি অনূদিত কাব্য '**সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ**'। এই মহাভারত থেকে অনূদিত কাব্যটিকে পুস্তিকার আকারে এবং মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করে কাঁথির নীহার প্রেস। গ্রন্থটির ত্রয়োদশ সংস্করণ আমাদের কাছে সংগৃহীত। পুস্তিকাটির প্রকাশকাল ১৩৯৫ সাল। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে কবির নামোল্লেখ নেই। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্র নিম্নরূপ ঃ

> **"(All rights reserved)/উৎকল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে/সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ/কাঁথির নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত/নীহার প্রেসের Logo চিহ্ন/ত্রয়োদশ সংস্করণ/কাঁথি নীহার প্রেসে শ্রী যতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা মুদ্রিত/-ঃ০ঃ-/সন ১৩৯৫ সাল/-ঃ০ঃ-/মূল্য ৫.০০ টাকা মাত্র।"**

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৪গ দ্রষ্টব্য)

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রের চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ২২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৩.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। পুস্তিকাটিতে প্রচ্ছদপত্র (১), মূলগ্রন্থ (১৮), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ মোট ২০টি পৃষ্ঠা আছে।

রচনাটি প্রথম কয়েকটি চরণ দিয়ে এইভাবে শুরু হয়েছে — *"সুগন্ধিকা-পুষ্পহরণ/বন্দনা/জগৎ গুরু চরণেতে সঁপি প্রাণমন।/যাঁহার প্রসাদে দেখি মরত ভুবন।।"*

কবি পরিচিতি ঃ

মহাভারতের কাহিনী নিয়ে লেখা **'সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ'** কাব্যটি ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরের এক জনপ্রিয় কাব্য। কাব্যটির রচয়িতা শ্রীহরি দাস। কাব্যটিতে শুধুমাত্র কবির নামোল্লেখ ছাড়া কোন বিস্তৃত পরিচয় নেই। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীহরি দাস কিংবা শ্রীহরি দাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ কর্মের কোন পরিচয় পাওয়া যায়না।

কাব্য কাহিনী ঃ

'সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ' কাব্যের কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিন্যাসক্রমগুলি এইরূপ— রতির গর্ভ বেদনা ও সুগন্ধিকা পুষ্প আনয়নের জন্য যদুগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, পুষ্প আনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে স্মরণ, অর্জুন ও নারদের কথোপকথন, রামচন্দ্রের বনে অর্জুনের প্রবেশ এবং বানর দলের সহিত কলহ, হনুমানের সহিত অর্জুনের ঝগড়া, অর্জুন শরে সাগর বন্ধন এবং হনুমানের বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ, অর্জুনের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণের বাঁধের নীচে গমন এবং হনুমানকে দর্শন দান, শ্রীহরির শিরে পাদ প্রদান হেতু হনুমানের আক্ষেপ এবং অর্জুনের সহিত মিলন এবং অর্জুনের সুগন্ধিকা পুষ্প নিয়ে দ্বারকা গমন ও রতি কন্যার তৎ পুষ্পজল সিঞ্চনে তার গর্ভমোচন।

কাব্যের শুরুতে **'বন্দনা'** অংশে প্রথমে জগৎগুরুকে প্রণাম জানিয়েছেন কবি। এরপর কবি বিষ্ণুর দশাবতারকে বন্দনা করেছেন এইভাবে —

''দশ অবতারটিকে বন্দনা করিবা।
শ্রীরাঙা চরণ তলে শরণ পশিবা।।
মীন কুর্ম্ম অবতার বরাহ মূরতি।
নৃসিংহ রূপেণ নাশে অসুর নৃপতি।।
বামন মূরতি ক্ষত্রি পরশুরাম রূপে।
রামরূপে রাবণে বধিল মহাকোপে।।
কৃষ্ণ অবতারে জাত বসুদেব ঘরে।
যার কোপে নাশ গলা রাজা কংসাসুরে।।
শ্রীবৌদ্ধ রূপেণ হরি দেউল ভিতরে।

যাহাঙ্ক কৃপারে জীব তরে ভবপারে।।
কলকী রূপেণ হরি অসি পত্র ধরি।
ম্লেচ্ছ যে যবন সবু সমরে সংহারি।।
ঠিকে দশ অবতার কলই বন্দন।
যাহাঙ্ক চরিত্র শুনি পাপ বিমোচন।।" (পৃষ্ঠা ঃ ১)

এরপরে আমরা দেখি রতির গর্ভবেদনায় শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হয়ে উঠেছেন এবং সুগন্ধিকা পুষ্প আনবার জন্য যদুদের আদেশ করছেন। কিন্তু —

"একে একে সকলে নারাজ হোইলা।
পুষ্প পাঁই সৈন্য বল চিন্তিত হোইলা।।
এই ভাবে মন দুঃখে সকলে রহিলে।
পুষ্প আনিবাক কেহি ভাজন নোহিলে।।
সকলে মউন হোই বসিলে সভার।
বোইলে অসাধ্য হেলা দ্বারিকা নগর।।" (পৃষ্ঠা ঃ ৩)

সুগন্ধিকা পুষ্প আনতে সকলেই অপারগ হলে অবশেষে '**পুষ্প আনয়ন জন্য শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে স্মরণ**' করলেন। অর্জুন তা কল্পনায় অনুভব করলেন এবং তড়িৎগতিতে অর্জুন বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের সন্নিকটে গেলেন —

"হোই খরতর   চলে ধনুর্দ্ধর
    বন গিরি জিনি গলা।।
পাদুকা যে মন্ত্র   পড়ি বীর পার্থ
    তুরিতে কলা গমন।
ধনু কান্ধে করি   গলে বীর চালি
    মিলে দ্বারকা ভুবন।।" (পৃষ্ঠা ঃ ৪)

কৃষ্ণের সম্মুখে এসে কী অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ তাঁকে ডেকেছেন জানতে চাইলে কৃষ্ণ সবিস্তারে সুগন্ধিকা পুষ্পের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন এবং তা আনবার জন্য অনুরোধ করলেন। এই সামান্য অনুরোধের কথা শুনে অর্জুন বললেন —

"ইঙ্গিতে যে মাত্রে আনিদেবি তোতে
চিন্তা ছাড় দেবরায়ে।" (পৃষ্ঠা - ৫)

অর্জুন এরপর নারদের পরামর্শে অরণ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন্ স্থানে সুগন্ধিকা পুষ্প আছে তার অনুসন্ধান করলেন। কিন্তু নারদ তাঁকে সঠিক পরামর্শ না দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন এবং অরণ্যের রক্ষী হনুমানের সাথে কোন্দল বাধিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কাহিনীতে অর্জুনের সাথে বানরদলের কোন্দল ও কলহের দৃশ্য দেখতে পাই। এই বানরেরা প্রভূ রামচন্দ্রের সাজানো এই বনের বনরক্ষী। সুতরাং প্রভূর নির্দেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকেই তারা অরণ্যে প্রবেশ করতে দেবেই না। অগত্যা অর্জুন উপায় না পেয়ে —

"এতে বিচারিণ পাদুকা মন্ত্রেণ
শূন্য পথে চলি গলা।
পাচেরি সহিতে খণা যে আদিতে
ডেইণ বনে পশিলা।।" (পৃষ্ঠা ঃ ৭)

অর্থাৎ পাদুকায় মন্ত্র প্রয়োগ করে শূন্যপথের দ্বারা বনের প্রাচীর এবং পরিখা ডিঙ্গিয়ে অর্জুন বনের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এতকিছু সত্ত্বেও হনুমানের হাত থেকে অর্জুন নিস্তার পায়নি। পরে শ্রীকৃষ্ণ হনুমানকে দর্শন দিয়ে অর্জুনের পরিচয় দিলে হনুমান নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছে এবং পুষ্প চয়নের জন্য অর্জুনকে সহযোগিতা করেছে।

কাব্যের শেষাংশে অর্জুনের সুগন্ধিকা পুষ্প নিয়ে দ্বারকায় গমন করলেন ও রতিকন্যার তৎপুষ্পজল সিঞ্চনে গর্ভমোচন হয়। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণ বাহবা জানিয়েছেন অর্জুনকে এইভাবে —

"ধন্য তুহি ধনুর্দ্ধর তাত মাত তোর।
তোর প্রায়ে ক্ষত্রি বীর নাহি এ সংসার।।" (পৃষ্ঠা - ১৭)

ঠিক তার পরে পরেই অনুগত সৈনিকের মতো —

"শুনিন অর্জ্জুন বীর বসনু খসাই।
প্রভু হস্তে পুষ্প গোটি থোইলে সে নেই।।" (পৃষ্ঠা - ১৭)

অর্থাৎ অর্জুন নিজের বস্ত্র থেকে পুষ্প নিয়ে কৃষ্ণের হাতে দিলেন। সেই পুষ্পের অপূর্ব দ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণ সেই পুষ্প প্রদ্যুম্নের হাতে দেন। প্রদ্যুম্ন রতিকন্যার হাতে দিলেন। সেই পুষ্পধৌত জল ভক্ষণ করার পর অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। কাব্যকাহিনীর শেষে ভণিতায় কবি লিখলেন —

"শ্রীকৃষ্ণ চরণ তলে নিত্য মো শরণ।
শ্রীহরিঙ্ক দাস গাত্র সুগন্ধি হরণ।।
হরি হরি বল সবে মনর হরষে।
অপার দুঃখ সাগরু তরিব অক্লেশে।।" (পৃষ্ঠা - ১৭)

চরিত্র-চিত্রণ ঃ

'সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ' কাব্যে প্রধানত অর্জুন এবং হনুমানের চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর গতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের উপস্থিতি এই কাব্যের কাহিনীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। প্রদ্যুম্ন ও রতিকন্যার চরিত্র সামান্যই বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের কাহিনী নির্মাণে এদের উপস্থিতি অপরিহার্যরূপে এলেও এই দুটি চরিত্রকে কবি বিস্তৃতভাবে চিত্রায়ণ করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তার কারণ অর্জুনের বীরত্ব এবং কৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অপরদিকে রামভক্ত হনুমানের কর্ম-কর্তব্য ও অপার প্রভুভক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। মহাভারতীয় চরিত্রগুলির যে পৌরাণিক মাহাত্ম্য তা কবি কোথাও ক্ষুণ্ণ করেননি। সততা, প্রভুভক্তি, পরোপকারিতা এবং মহাভারতীয় বীরত্ব এইসব মহাকাব্যিক গুণাবলী চরিত্রসমূহে বর্তমান।

কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের আনুগত্য গভীর এবং কৃষ্ণের জন্য সবকিছুই সে করতে পারে। সুগন্ধিকা পুষ্প আনার জন্য যখন কৃষ্ণ অর্জুনকে অনুরোধ করলেন তখন অর্জুনের আনুগত্য ফুটিয়ে তুললেন কবি এইভাবে —

"তোহর আজ্ঞারে তোর কর্ম্ম হিতে
অসাধ্য কি কথা অছি।
স্বর্গ মর্ত্ত্যপুর সপত পাতাল
ভয় নাহি মোর কিছি।।" (পৃষ্ঠা - ৪)

কিংবা নারদ যখন শ্রীরামের বনে বীর হনুমানের বীরত্বের কথা জানিয়ে অর্জুনকে ভড়কে দিতে চাইলেন তখন অর্জুনের পৌরুষ ও তার প্রবল প্রতাপ ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। নারদকে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন —

"অর্জ্জুন বোইলে তুম্ভে শুন মহামুনি।
অন্য কেহি কহন্তা তা শির দেন্তি হাণি।।
মুহি যদি এ সামান্য কথাকু ডরিবি।
গাণ্ডিব ধনুক মুহি কিপাঁই ধরিবি।।
বিজে কর মহামুনি কহু অছু তোতে।
পরর প্রতিজ্ঞা বাণী ন কহিবু মোতে।।" (পৃষ্ঠা - ৬)

অর্থাৎ অর্জুন বললেন যে, এই সামান্য বিষয়ে সে ভীত নন। এতেই যদি সে ভয়ে ভীত হয় তাহলে গাণ্ডিব ধরবে কী কারণে। নারদকে সে সচেতন করে বলে যে, পরের বীরত্ব কাহিনী শুনে তার কোন লাভ নেই। এই কথা নারদ না বলে অন্য কেউ যদি বলতো এতক্ষণ তার শিরচ্ছেদ করতেন বলে সতর্ক করে দিয়েছেন।

'হনুমানের সহিত অর্জুনের ঝগড়া' অংশে রামের অরণ্যে অর্জুন অন্যান্য বানর সেনানিদের হত্যা ও অচেতন করেছে। এইরূপ গর্হিত অপরাধ ক্ষমাযোগ্য নয়। হনুমান এর জন্য অর্জুনকে উচিৎ শিক্ষা দিতে চায়। ঝটিকা গতিতে রামের অরণ্যে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে তাকে অরণ্যচারী শবর বলে গালিগালাজ করতে থাকে —

"বোইলা শবরা তুরে শুন মোর বাণী।
বানর সকল তুরে মাইলু ন জানি।।
ইষ্ট যে দেবতা তার সুমরণ কর।

নিশ্চয়ে মরণ অছি মোহর হস্তর।।” (পৃষ্ঠা - ৯)

এই ধরনের হুঙ্কারে অর্জুন বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করলে ক্রোধান্বিত হনুমান রামায়ণে তার যে বীরত্ব সগৌরবে বর্ণনা করেছে এইভাবে —

“মোহর প্রতিজ্ঞা তুরে শুনরে শবর।
লঙ্কা জয় করিবাকু গলে রঘুবীর।।
আশী পদ্ম বানর সইনি সঙ্গতর।
তেতে সৈন্য মধ্যে মোতে কলে সরদার।।
মরত সমুদ্র বান্ধি তাকু করি পার।
এতেক পর্বত মুহি বহিলি মুগুর।।
বনর অসুর যেতে অনেক মাইলি।
সীতার উদ্দেশ আনি রামচন্দ্র দেলি।।
মোর পাঁই রামচন্দ্র লঙ্কা জয় কলা।
রাবণকু মারি সীতা উদ্ধারি আণিলা।।
এমন্ত বারতা তুয়ে শুনু নাহি কর্ণে।
শবরা পাশরী আসি প্রবেশিলু বনে।।” (পৃষ্ঠা - ৯)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হনুমানের কাছে অর্জুনের পরিচয় দেন এবং দুজনের মিলন করিয়ে দেন। আপন কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয় হনুমান। হনুমান চরিত্রের অনুশোচনা এবং বিনয়ীসুলভ বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন কবি এইরূপ —

“এতে বলি হরি অর্জ্জুনকু ধরি
হনু সঙ্গে মিলাইলে।
অর্জ্জুন আসিন হনুর চরণ
দণ্ড প্রণমিত কলে।।
হনু বীর উঠি ধইলে সাপটী

কোলরে নেই বসাই।

তুহি অরজুন বড় তু অজ্ঞান

পরিচয় দেলু নাহি।।

তু যেবে কহন্ত পরিচয় দেন্ত

পুষ্প গোটাঙ্কর পাই।

লক্ষে পুষ্প লেন্ত কিছি ন বলন্ত

তুহি অটু মোর ভাই।।" (পৃষ্ঠা - ১৫)

হনুমান আক্ষেপ করে বলেছেন যে, অর্জুন যদি আগে থেকে তার সঠিক পরিচয় দিত তাহলে একটা ফুল নয়, এক লক্ষ ফুল তার কাছে এনে দিতে পারতো। কারণ পবনপুত্র হনুমানের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক। বায়ু বা পবনের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম। সুতরাং তাদের সম্পর্কের মধ্যে আছে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

ভাষা ঃ

'সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ' কাব্যের ভাষা ওড়িয়া। কবি **'বন্দনা'** অংশে বাংলা ভাষায় ও পয়ারের মাধ্যমে দেব-দেবীর বন্দনা করলেও মাঝে মাঝে ওড়িয়া শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপের সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপের মিল লক্ষ্য করা যায়। কবি শ্রীহরি দাস **'বন্দনা'** অংশে বিষ্ণুর অবতার বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত পয়ারে বিক্ষিপ্তভাবে ওড়িয়া শব্দের ব্যবহার করেছেন, যেমন —

"বামন মুরতি ক্ষত্রি পরশুরাম রূপে।

রামরূপে রাবণে বধিল মহাকোপে।।

কৃষ্ণ অবতারে জাত বসুদেব ঘরে।

যার কোপে নাশ <u>গলা</u> রাজা কংসাসুরে।।

শ্রীবৌদ্ধ রূপেণ হরি দেউল ভিতরে।

<u>যাহাঙ্ক</u> কৃপারে জীব তরে ভবপারে।।

কলকী রূপেণ হরি আসি পত্র ধরি।

ম্লেচ্ছ যে যবন সবু সমরে সংহারি।।

ঠিকে দশ অবতার কলই বন্দন। (পৃষ্ঠা - বন্দনা)

যাহাঙ্ক চরিত্র শুনি পাপ বিমোচন।"

(গলা - গেল, যাহাঙ্ক - যাহার, সবু - সব, ঠিকে - সংক্ষেপ, কলই - করলাম, যাহাঙ্ক - যাহার)

উল্লেখ্য এই যে প্রতিটি পদের শিরোনামে বাংলা ভাষায় লেখা। পয়ার অংশগুলি বাংলা পয়ারের আদলে রচিত হলেও ত্রিপদী রচনায় কবি পরিপূর্ণভাবে ওড়িয়া ভাষার প্রয়োগ করেছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

ওড়িয়া প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরে কাশীদাসী মহাভারতের এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা এত অধিক ছিল যে এককালে বাংলা অনূদিত রামায়ণ বা মহাভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদের অনুবাদ শুরু হয়। ওড়িয়া ভাষায় যে পরিমাণে ভাগবতের অনুবাদ হয়েছে সে পরিমাণে রামায়ণ বা মহাভারতের অনুবাদ হয়নি। মূল সংস্কৃত অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি ক্রাইসিস্ ওড়িয়া সাহিত্যে ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের ওড়িয়া অনুবাদ মূলত লোকশ্রুতি নির্ভর গ্রামীণ সাহিত্যের মাধ্যমে প্রসারিত ছিল। এর ফলস্বরূপ বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতের ওড়িয়া লিপ্যন্তর ও অনুবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে তালপাতার পুথিতে কিংবা ভূর্জপত্রে লিখিত ছিল। ভুবনেশ্বরে অবস্থিত '**ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা**'য় কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের নমুনা ওড়িয়া হরফে বাংলা ভাষায় সংরক্ষিত আছে।

'**সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ**' কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথমে বাংলা মহাভারতের ওড়িয়া ভাষায় ভাষান্তর এবং আরো পরে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর ঘটেছে। ওড়িশা সীমান্ত বাংলায় পারস্পরিক সাহিত্যের এইরূপ Transformation এককালে প্রচুর পরিমানে হয়েছে।

গ. ভাগবতের অনুবাদ

মহাভারতের মত ভাগবতের অনুবাদও ওড়িশার মানুষের কাছে পরম আদরের। জনপ্রিয়তার কারণে রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ওড়িয়া সাহিত্যের চর্চায় ভাগবতের অনুবাদ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। ওড়িয়া ভাষায় ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক জগন্নাথ দাস। তাঁর অগ্রজ কবি তথা পঞ্চসখার

বয়োজ্যেষ্ঠ কবি বলরাম দাস ভাগবতের খণ্ডাংশ অনুবাদ করেছেন মাত্র। কিন্তু জগন্নাথ দাস একাদশ স্কন্দে ভাগবতের অনুবাদ করে গেছেন। এই অধ্যায়ে কবি জগন্নাথ দাস নামাঙ্কিত এবং **'নীহার প্রেস'** থেকে মুদ্রিত ১০টি পুস্তিকার পর্যালোচনা ও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সবকটি পুস্তিকা বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তরীত করা আছে এবং পুস্তিকাগুলি জগন্নাথ দাস অনূদিত ওড়িয়া ভাগবতের খণ্ড-খণ্ড অংশমাত্র।

জগন্নাথ দাসের ভাগবত অধিক জনপ্রিয় হওয়ার কারণে বহুকাল ধরে ওড়িশা ও তৎসংলগ্ন বাংলায় তথায় মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এই ভাগবত পাঠের প্রচলন ছিল এবং এখনও চলে আসছে। মেদিনীপুরের সরকারি ভাষা যখন ওড়িয়া ছিল তখন এই সব ওড়িয়া সাহিত্য তাদের রসচর্চার একমাত্র উপাদান ছিল। পরবর্তীকালে সরকারিভাবে বাংলাভাষার আধিপত্য বিস্তৃত হলে ওড়িয়া লিপির এই সাহিত্যগুলিকে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তরীত করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায়। কারণ ওড়িয়া ভাগবত ছাড়া এই অঞ্চলের উপভোক্তাগণ অন্যকোন ভাগবত পড়তেন না। মালাধর বসুর ভাগবতের তুলনায় জগন্নাথ দাসের ভাগবত তত্ত্বভারশূন্য এবং প্রাণের ভাষা ওড়িয়ায় লিখিত বলে ওড়িয়া ভাষাভাষী মেদিনীপুরের আপামর বাঙালি জগন্নাথের ভাগবতকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে আসছেন। এই জনপ্রিয়তার কথা ভেবে কাঁথিতে অবস্থিত **'নীহার প্রেস'** সীমান্তবর্তী ওড়িশার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে ওড়িয়া লিপিতে লিখিত তালপাতার পুথিকে সংগ্রহ করে বাংলা লিপিতে মুদ্রিত ও প্রকাশ করে আসছেন।

পুথি উদ্ধার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই ছাপাখানা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আসছে। শ্রীমদ্ভাগবতের **'একাদশ স্কন্দ'** শীর্ষক পুস্তিকাটির পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত পাঠকবর্গের কাছে প্রকাশকের আবেদন নিম্নরূপ ঃ

> **''মহাত্মা জগন্নাথ দাস, সারলা দাস প্রমুখ উৎকলের প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবিগণ উৎকল সাহিত্য ভাণ্ডারে যে সকল উপাদেয় অমূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, আজও সেই সকল গ্রন্থ এ প্রদেশবাসী নরনারীর নিকট অতীব আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর হইল আমরা সকলের সুবিধার জন্য তালপাতায় লিখিত প্রাচীন পুঁথি সকল একে একে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। ঐগুলি সাধারণের**

নিকট আদৃত হইয়াছে। এ অঞ্চলে অনেকের গৃহে তালপাতায় লিখিত উৎকৃষ্ট প্রাচীন পুঁথি আছে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করিলে অনুগৃহীত হইব এবং ছাপা হইলে আবশ্যক মত তাহার একখানি তাঁহাদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিব। ইচ্ছা করিলে উক্ত তালপাতার পুঁথি সংগ্রহের পারিশ্রমিক লইতে পারিবেন। যাহাতে প্রাচীন গ্রন্থ লুপ্ত না হয় — আমরা তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি। এ বিষয়ে আমরা সকলের আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছি — প্রকাশক।"

এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষও তাঁদের মহান কর্তব্য পালন করেছেন। অনেকেই তালপাতার পুঁথি সংগ্রহ করে নীহারের কর্মকর্তার হাতে তুলে ধরেছেন। '**জড়ভরত উপাখ্যান**' পুস্তিকাটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হলে সেই পুস্তিকার আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রে নিম্নরূপে মুদ্রিত আছে —

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

—০—

"উত্তর বহলিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী আমাদিগকে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম। ইতি প্রকাশক।"

এক্ষেত্রে উল্লেখ করার প্রয়োজন এই যে, নীহার প্রেস শুধুমাত্র পুঁথি সংগ্রহ করেনি, ওড়িয়া লিপিতে মুদ্রিত কিছু পুস্তিকা যা এইসব অঞ্চলে পঠিত হতো সেগুলিও সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছে। উপরোক্ত '**কৃতজ্ঞতা প্রকাশ**' -এ প্রকাশক মধুসূদন জানা সৌদামিনী দেবীর কাছ থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। নীহার প্রেস ও তাদের কর্মকাণ্ডের কথা স্বীকার করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

"ওড়িয়া-ভাষী মেদিনীপুরীরা সকলেই বাঙ্গলা জানেন, ইস্কুলে বাঙ্গলা পড়েন, নিজেদের বাঙালী বলেন, এবং ইহাদের সমাজ উড়িষ্যার অনুরূপ সমাজ হইতে বহু স্থানেই পৃথক। তথাপি উড়িষ্যার প্রসার এত অধিক যে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমের লোকেরা সাগ্রহে উড়িয়া পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, এবং মধুসূদন জানা মহাশয়ের কাঁথি নগরস্থ বিখ্যাত 'নীহার প্রেস' হইতে বাঙ্গলা অক্ষরে, প্রচুর

উড়িয়া সাহিত্যগ্রন্থ, ধর্মবিষয়ক ছোট খাটো বই, এবং জগন্নাথ দাস রচিত সমগ্র ভাগবত-পুরাণ ও অন্য প্রধান গ্রন্থ মেদিনীপুরের লোকেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। এবং বাঙলা অক্ষরে নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত উড়িয়া গ্রন্থ হইতে প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ আমার যথেষ্ট পরিমানে ঘটিয়াছিল।" [৭]

কবি-পরিচিতি ঃ

এই অধ্যায়ে ভাগবতের অনুবাদকরূপে ওড়িয়া কবি জগন্নাথ দাসকে নির্বাচন করা হয়েছে। জগন্নাথ দাসের নামাঙ্কিত ভাগবত বিষয়ক দশখানি পুস্তিকাকে এই আলোচনায় ধরা আছে। সুতরাং কবি জগন্নাথ দাসের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন আছে। কবি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ১৪৯০ - ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় পুরী জেলায় জগন্নাথ দাস জন্মগ্রহণ করেন। পুরী জেলার কপিলেশ্বর শাসনে তাঁর জন্ম হয়। সমগ্র ওড়িশা তখন ব্রাহ্মণ্যবাদের নিগড়ে বাঁধা। কোন এক ভাদ্র মাসের রাধাষ্টমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগবান ও মাতা পদ্মাবতী। পিতা ছিলেন পুরাণের একনিষ্ঠ পাঠক। বাল্যকাল থেকে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রচর্চার প্রতি জগন্নাথের ঝোঁক ছিল। **"বাল্যকালে প্রথমত তিনি সংস্কৃত পড়েন, এবং ব্যাকরণ ও সাহিত্য বুৎপত্তিলাভ করেন, তাহার পর তিনি ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন, কিন্তু জগন্নাথ তাহা অস্বীকার করেন এবং আঠার-ঊনিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন।"**[৮] সেই সময় পুরীর রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭ - ১৫৪০)। পুরীর ওড়িয়া মঠে তিনি রাজার দাক্ষিণ্যে বসবাস করতেন এবং সেই মঠের প্রথম মোহান্ত ছিলেন তিনি। কয়েক মাস মঠে কাটিয়ে তিনি সমুদ্রতীরে একান্ত নিভৃতে বাস কারবার জন্য চলে গেলেন। সমুদ্রতীরে যেখানে তিনি বাস করতেন তার নাম এখন **'সাতলহরী'**। কিংবদন্তী এইরূপ আছে যে, সমুদ্রগর্জন যাতে ক্ষীণ হয়, যাতে তাঁর ধ্যানভঙ্গ না হয়, সেজন্য সমুদ্র সাতলহর বা সাত ঢেউয়ের ব্যবধানে পিছিয়ে গেছে। মহাপ্রভু যখন পুরীধামে পৌঁছান তখন তিনি জগন্নাথকে শ্রীমন্দিরে পুরাণপাঠে রত থাকতে দেখেন। নবীন সাধুকে দেখে এবং তাঁর শাস্ত্রবোধ উপলব্ধি করে তাঁকে **'অতিবড়'** বলে ভূষিত করেন। জগন্নাথের শিষ্যপরম্পরা **'অতিবড়ী'** সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়ে আসছেন।

জগন্নাথ দাসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হল একাদশ স্কন্দে ভাগবত রচনা। একাদশ স্কন্দে তিনি

ভাগবত রচনা করেছেন। কথিত আছে পরবর্তীকালে মহাদেব দাস নামে একজন কবি দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্কন্দ যোগ করে তাঁর কাব্যকে সম্পূর্ণ ভাগবতে রূপদান করেন। শুধু ভাগবত নয়, কবি ভগবত বিষয়ক অনেকগুলি কাব্য রচনা করেছেন, যেমন — **'অর্থ কুইলী'**, **'দারুব্রহ্মগীতা'**, **'মৃগণীস্তুতি'**, **'ফুলতোড়া'**, **'গুণ্ডিচাগীতি'**, **'গজস্তুতি'**, **'মনুশিক্ষা'**, **'গুপ্তভাগবত'**, **'উষাহরণ'**, **'অনাপর্ব'**, **'অলিমালিকা'**, **'ইন্দ্রমালিকা'**, **'গুপ্তগীতা'**, **'ইতিহাস পুরাণ'**, **'ভবিষ্য-মালিকা'**, **'কালিয়দমন'**ইত্যাদি।

কাব্যবৈশিষ্ট্য ঃ

জগন্নাথ দাসের ভাগবত ওড়িয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পঞ্চদশ শতক হল ওড়িশার আধ্যাত্মিক জাগরণের কাল। এই সময় পুরাণচর্চার একটি পরিমণ্ডল জগন্নাথ দাসের পরিবারে ছিল। যেহেতু কবির পিতা ভগবান দাস একজন পুরাণবেত্তা মানুষ ছিলেন সেইহেতু ছোটবেলা থেকে জগন্নাথের অন্তরে ভগবৎ ধারনার উন্মেষ হতে থাকে।

জগন্নাথ দাসের ভাগবত সংস্কৃত ভাগবতের ছায়ায় লেখা। সংস্কৃত থেকে ওড়িয়া ভাষায় নিছক ভাষানুবাদ করেন নি কবি। আক্ষরিক অনুবাদ না করে সংস্কৃত ভাগবতকে অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃত ভাগবতের অধ্যায় বিন্যাসকে কবি নিজের মত সাজিয়ে নিতে গিয়ে ক্রম পরিবর্তন করেছেন। সংস্কৃত ভাগবতের অধ্যায় সংখ্যা ৩৩৫ অপরদিকে ওড়িয়া ভাগবতের অধ্যায় সংখ্যা ৩৪৮। প্রতিটি স্কন্দের অধ্যায় সংখ্যার সঙ্গে জগন্নাথকৃত ভাগবতের স্কন্দ অনুযায়ী অধ্যায়ের মিল আছে। শুধুমাত্র ১৩ স্কন্দের ১৩টি অধ্যায় যা সংস্কৃত ভাগবতে নেই কিন্তু ওড়িয়া ভাগবতে আছে। এই ত্রয়োদশ স্কন্দ অর্থাৎ শেষ স্কন্দটি জগন্নাথ দাসের রচনা নয় সেটি মহাদেব দাসের রচনা, যা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে।

জগন্নাথ দাস রচিত ভাগবতের সাংগঠনিক ধাঁচ মূল সংস্কৃত ভাগবতের অনুসারী। কাহিনীগত পার্থক্যও নেই। মহাভারতের কাহিনীর শেষ থেকে ভাগবতের কাহিনী শুরু হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ এবং পঞ্চপাণ্ডবের আত্মীয়বিয়োগ — পাণ্ডবকুলকে শোকাহত করে। পরীক্ষিতকে রাজা করে পাণ্ডবেরা পাঞ্চালীসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন। তারপর থেকে ভাগবতের বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। শাপগ্রস্ত পরিক্ষীত মৃত্যুচিন্তায় সততই চিন্তিত। পরিক্ষীত জীবনের সত্যসন্ধানে রত। জীবনের সত্যানুসন্ধানই ভাগবত। কৃষ্ণই একমাত্র পথ যে জীবনের যন্ত্রণাকে প্রশমিত করতে পারে। এই উপায়ের কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে ব্যাস-পরিক্ষীত,

শুকদেব-পরীক্ষিত ও নারদ-পরীক্ষিতের কথোপকথনে। আসলে এই পরীক্ষিত হলেন আধুনিক মানুষ। যে ভোগ ও ক্ষমতা থেকে, যন্ত্রণাদীর্ণ জীবন থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা করেন। সেই মুক্তি কর্মযোগের মাধ্যমে আসে। শুধু কর্মযোগ নয়, সমানভাবে জ্ঞানযোগের দ্বারাও মুক্তি আনতে হবে। সংসারের বন্ধন মানে মৃত্যুচিন্তা যা পরীক্ষিতকে প্রতিটি মুহূর্তে ভাবিয়ে তুলেছে। সংসারে যোগী হয়ে জ্ঞানের অণ্বেষণই একমাত্র পথ।

ছন্দ ঃ

জগন্নাথ দাস নবাক্ষরীবৃত্তে কাব্যগুলি রচনা করেছেন। এই ছন্দ পরবর্তীকালে ও মধ্যযুগের ওড়িয়া কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই ছন্দটির স্রষ্টা জগন্নাথ দাস। এই ছন্দ সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন —

> **''জগন্নাথ সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং নূতন এক ছন্দের সৃষ্টি করেন। নয়টি অক্ষর দিয়া এই ছন্দের সৃষ্টি, তাই ইহার নাম নবাক্ষরী বৃত্ত।''**[৯]

এছাড়া প্রতিটি চরণে নবম অর্থাৎ নয়টি অক্ষর সজ্জিত করে ভাব প্রকাশের একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ এই ছন্দের প্রাথমিক শর্ত। ধর্মীয় তত্ত্বকথাকে নয়টি অক্ষরবিশিষ্ট চরণে ফুটিয়ে তোলার মত কঠিন কাজ জগন্নাথই সফল ভাবে করতে পেরেছেন। পরবর্তীকালে **'পঞ্চসখা'** কবিপঞ্চকের অন্যান্য কবিরা এই ছন্দে কাব্যরচনা করলেও জগন্নাথ দাসের মত প্রাঞ্জল ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এই ছন্দের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা একমাত্র জগন্নাথ দাসের প্রাপ্য।

গুরুত্ব ঃ

স্বয়ং প্রতাপরুদ্রদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় জগন্নাথ তাঁর কাব্যরচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ভাগবত সমগ্র ওড়িশাবাসীর গৃহে গৃহে পরম শ্রদ্ধায় রক্ষিত ও পঠিত হয়ে আসছে। শুধু ওড়িশা নয়, প্রান্তবর্তী বাংলায় তথায় মেদিনীপুরের অনেক গৃহস্থবাড়িতে বঙ্গাক্ষরে ওড়িয়া ভাগবত সযত্নে সংরক্ষিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এই ভাগবত পাঠ করে উভয় অঞ্চলের

(নীহার প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত জগন্নাথ দাস নামাঙ্কিত পুস্তিকাগুলি থেকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত ১০টি পুস্তিকার বিবরণ সারণীবদ্ধভাবে উপস্থাপিত হল)

ক্রম	কাব্যনাম	প্রকাশকাল	বিষয়বস্তু	পুস্তিকার আয়তন	পৃষ্ঠা সংখ্যা	পরিশিষ্ট চিত্র নং
১.	হরিণী স্তুতি	১৪০৫ বঙ্গাব্দ দ্বাত্রিংশ সংস্করণ	ব্যাধের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট হরিণীর আকুতি ও উদ্ধারলাভ বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১২.৫ সেমি প্রস্থঃ ১০ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ১৬ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ সাকুল্যেঃ ১৮	৫ক
২.	গজ স্তুতি	১৪০৫ বঙ্গাব্দ নবম সংস্করণ	কুমীরের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর নিকট হস্তীর আকুতি ও উদ্ধারলাভ বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১২.৫ সেমি প্রস্থঃ ১০ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ১২ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ সাকুল্যেঃ ১৪	৫খ
৩.	জড়ভরত উপাখ্যান	১৩৩৩ বঙ্গাব্দ	শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রাজা ভরতের জড়ত্ব মুক্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১৮ সেমি প্রস্থঃ ১২.৫ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ১১ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ সাকুল্যেঃ ১৪	৫গ
৪.	ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল	১৪১০ বঙ্গাব্দ অষ্টম সংস্করণ	ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভগবত বিষয় নিয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশ্নোত্তরধর্মী কথোপকথন বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১৮ সেমি প্রস্থঃ ১২.৫ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ ভূমিকাঃ ১ সূচীপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ৫৭ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ সাকুল্যেঃ ৬২	৫ঘ
৫.	টীকা ভাগবত বা ভাগবতসার	১৩৯৪ বঙ্গাব্দ একত্রিংশ সংস্করণ	জগন্নাথ দাস রচিত দ্বাদশ স্কন্দ বিশিষ্ট ভাগবতের সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১১ সেমি প্রস্থঃ ৭ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ৩০ সাকুল্যেঃ ৩২	৫ঙ
৬.	শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্দ	১৪০৫ বঙ্গাব্দ দ্বাদশ সংস্করণ	জগন্নাথ দাস কর্তৃক ভাগবতের একাদশ স্কন্দের অনুবাদ। যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনী বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১৮ সেমি প্রস্থঃ ১২.৫ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ ভূমিকাঃ ১ সূচীপত্রঃ ২ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ২৩৬ সাকুল্যেঃ ২৪২	৫চ
৭.	ঊষাহরণ	প্রচ্ছদপত্র ছিন্ন থাকায় তথ্য পাওয়া যায়নি	শুকদেব ঋষি ও পরীক্ষিতের কথোপকথনের মাধ্যমে ঊষা ও অনিরুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত	দৈর্ঘ্যঃ ১৮ সেমি প্রস্থঃ ১২.৫ সেমি	মূল গ্রন্থঃ ১৬	৫ছ
৮.	শুকদেব ঋষির জন্মবৃত্তান্ত	১৪১০ বঙ্গাব্দ অষ্টম সংস্করণ	বৈশম্পায়ন ও জনমেঞ্জয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে কলি রাজার জন্মবৃত্তান্ত, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও শুকদেব ঋষির জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত।	দৈর্ঘ্যঃ ১৮ সেমি প্রস্থঃ ১২.৫ সেমি	প্রচ্ছদপত্রঃ ১ আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ ভূমিকাংশঃ ১ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রঃ ১ মূল গ্রন্থঃ ১৮৪ সাকুল্যেঃ ১৮৮	৫জ

ক্রম	কাব্যনাম	প্রকাশকাল	বিষয়বস্তু	পুস্তিকার আয়তন	পৃষ্ঠা সংখ্যা	পরিশিষ্ট চিত্র নং
৯.	রাসলীলা	১৪১০ বঙ্গাব্দ অষ্টাবিংশ সংস্করণ	শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত	দৈর্ঘ্য ঃ ১৮ সেমি প্রস্থ ঃ ১২.৫ সেমি	প্রচ্ছদপত্র ঃ ১ মূল গ্রন্থ ঃ ২৮ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র ঃ ১ সাকুল্যে ঃ ৩০	৫ঝ
১০.	জন্মাষ্টমী ব্রত	১৪০৫ বঙ্গাব্দ অষ্টাদশ সংস্করণ	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নন্দালয়ে গমনের কাহিনী বর্ণিত	দৈর্ঘ্য ঃ ১২.৫ সেমি প্রস্থ ঃ ১০ সেমি	প্রচ্ছদপত্র ঃ ১ পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র ঃ ১ মূল গ্রন্থ ঃ ১২ সাকুল্যে ঃ ১৪	৫ঞ

মানুষ মোক্ষলাভ ও আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করে। চন্দন ও তুলসী দিয়ে এই ভাগবতকে মাথায় ছোঁয়ায়। যখনই কোন কাব্যগ্রন্থে চন্দনের প্রলেপ ও তুলসীর স্পর্শ পড়ে তখন সেই কাব্য ক্লাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। জগন্নাথ দাস ও তাঁর ভাগবতের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন —

> **"উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া শুনিয়া ভাগবত শিখিয়াছে। মহাপ্রভুকে প্রতাপরুদ্র যখন জিজ্ঞাসা করেন, কি করিয়া জগন্নাথের ভিতর দিয়া রাধাকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন মহাপ্রভু না কি এই অতিবড় স্বামীকেই দেখাইয়া দেন।"[১০]**

গ্রন্থ ১. হরিণী স্তুতি ঃ

'হরিণী স্তুতি' কাব্যের কাহিনীবস্তু ভাগবতের অষ্টম স্কন্দের অংশ বিশেষ। ৮ + ৬ মাত্রা বিশিষ্ট পয়ার ছন্দে কাব্যটি রচিত। কবি জগন্নাথ দাসের রচিত এই কাব্যটির প্রকৃত নাম **'মৃগনী স্তুতি'**। জনজীবনে কাব্যটি **'হরিণী স্তুতি'** নামে সমধিক পরিচিত। ব্যাসপুত্র পরীক্ষিতের ভবনে ঋষি শুকদেবের উপস্থিতি এবং পরীক্ষিত ও শুকদেবের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে। কাহিনীটি ভাগবতের অংশ বিশেষ হলেও শ্রীরামের গুণগান কাব্যের প্রথমাংশে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীতে প্রথমে পরীক্ষিতের প্রশ্ন ছিল যে, হরিণী বনের মধ্যে ব্যাধের হাত থেকে কি করে রক্ষা পেল। উত্তরে শুকদেব জানান যে, হরপার্ব্বতীর ক্রীড়াক্ষেত্র 'সুবাহু' নামক অরণ্যে এক হরিণী মহাদেবের আনুকূল্যে নির্ভয়ে তৃণক্ষেত্রে চারণ করে। আট মাসের গর্ভবতী হরিণী তার একটি শাবক নিয়ে

থাকে। বীরূপাক্ষ নামে এক শবর হরিণীকে শিকার করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। বিধাতাকে স্মরণ করে তিনদিন উপবাসী শবর অরণ্যে শিকারের জাল বিস্তার করে। হরিণীর পিছনে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করে হরিণীকে তাড়না দেয়। বিপদগ্রস্ত হরিণী শ্রীহরিকে স্মরণ করে। এমতাবস্থায় হরিণীর ক্রন্দন ও আর্তনাদ পাঠকের হৃদয়ে করুণ রসের সঞ্চার করে। হরিণী শ্রীকৃষ্ণজগন্নাথের মহিমা কীর্তন করে। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়। হরিণীর আর্তনাদ শুনে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু বিচলিত হয়ে পড়লেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে দায়িত্ব দিলেন হরিণীকে রক্ষা করার জন্য। ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ পবন, মেঘ ও বজ্রাস্ত্র নিয়ে 'বিরূপাক্ষ' অরণ্যে পৌঁছে তার পাটহস্তী মেঘমালকে অরণ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রবল ঝড় সৃষ্টি করলেন এবং ব্যাধের পাতানো জালকে নষ্ট করে বজ্র-বৃষ্টি শুরু করলেন। বজ্রে ব্যাধের প্রাণনাশ হয়। গর্ভবতী হরিণী ও তার শাবক রক্ষা পায়। হরিণী বিধাতার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়। কাব্যের আখ্যানবস্তু এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

কবি জগন্নাথ দাস ভণিতায় বলেন যে, এই '**হরিণীস্তুতি**' আসলে অমৃতময় রস। ভাগবতের মাধ্যমে তিনি তা প্রকাশ করলেন—

"মৃগরাজ স্তুতি এ অমৃতময় রস।
ভাগবতে বর্ণি কলে জগন্নাথ দাস।।"

বঙ্গানুবাদ :

মৃগরাজ স্তুতি এ অমৃতময় রস।
ভাগবতে বর্ণিলেন জগন্নাথ দাস।।

এই কাব্য পাঠের মোক্ষলাভের কথাও কবি স্মরণ করিয়ে দিলেন এইভাবে—

"ত্রিসন্ধ্যারে এ স্তুতি যে পড়ই শুনই।
সন্তোষে তা পিতৃগণ বৈকুণ্ঠে বসই।।
সঙ্কট সময়ে যেহুঁ এ স্তুতি পড়ন্তি।
হরিণী প্রায়েক তাকু শ্রীহরি রখন্তি।।"

বঙ্গানুবাদ :

ত্রিসন্ধ্যাতে এ স্তুতি যে পড়িবে শুনিবে।

তাহাদের পিতৃগণ বৈকুণ্ঠ লভিবে।।

সঙ্কট সময়ে যেবা এই স্তুতি স্মরে।

হরিণী প্রায় তারে শ্রীহরি উদ্ধারে।।

'হরিণী স্তুতি' কাব্যটির মর্মস্পর্শী কাহিনী ভগবত পিপাসু পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করে। মনুষ্যেতর প্রাণেও শ্রীহরির অবস্থান অপর একটি কাব্য জগন্নাথ দাসের **'গজস্তুতি'** কাব্যের কাহিনীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। জগন্নাথত দাসের **'গজস্তুতি'** নিম্নে বর্ণিত হল—

গ্রন্থ ২. গজস্তুতি ঃ

ভাগবতের অষ্টম স্কন্দের অংশবিশেষ কাহিনী নিয়ে অনূদিত। **'গজস্তুতি'** কাব্যটি ভাগবতের অষ্টম স্কন্দের অনুবাদ। কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদক রূপে ওড়িয়া সাহিত্যে অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে **'পঞ্চসখা'** পরিচয়ে যে পাঁচ জন কবির ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি জগন্নাথ দাস। **'গজস্তুতি'** কাব্যটি **'অতিবড় কবি'** জগন্নাথ দাসের অনুবাদ কর্ম।

কাব্যটির বন্দনা অংশে কবি গণেশের বন্দনা করেছেন। শুকদেব মুনি এবং রাজা পরীক্ষিতের কথোপকথনের মাধ্যমে **'গজস্তুতি'** কাব্যের কাহিনী অংশ বর্ণিত হয়েছে। দ্বারকাপুরে সমস্ত যাদবকে নিকটে বসিয়ে যদুপতি কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত উর্দ্ধবের কাছে তিনি পৃথিবীর আর্ত-প্রাণের কীরূপ সহায় হয় সে বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় উর্দ্ধব জানতে চান যে, সরযূ নদীতে কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হাতি কীভাবে রক্ষা পেল। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ **'গজস্তুতি'**র আখ্যান শোনালেন উর্দ্ধবকে।

দক্ষিণ সমুদ্রকূলে সরযূ নদীর তটে বৈশাখের একাদশী তিথিতে জোয়ারের তোড়ে বিক্রম নামে এক কুমীর ভাটায় সমুদ্রের জলে ফিরতে না পেরে ডাঙ্গায় থেকে যায়। কুমীরের চারটি পা নেই। জলের প্রাণী জলে না ফিরে যেতে পারায় প্রকৃতির বিড়ম্বনায় তাকে পড়তে হয়। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে নিরুপায় হয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে কুম্ভক নামে এক মত্ত হাতি সপুত্র তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সেই পথে চলতে থাকে। হাতিকে দেখে কুমীর আর্তনাদ করে

এবং জলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। ধর্মপ্রাণ হাতি সেদিন তার পুত্রের নিষেধকে হেয় করে ধর্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে কুমীরকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হয়। হাতি কুমীরকে তার শুঁড়ে বসিয়ে সমুদ্রের জলরাশির দিকে অগ্রসর হয়। চতুর কুমীর ক্রমশঃ গভীর জলের দিকে নিয়ে যেতে হাতিকে অনুরোধ করে। কুমীরের কথা মতো গভীর জলের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় কুমীর লাফ দিয়ে জলে ডুবে হাতির পা কামড়ে ধরে এবং অভুক্ত কুমীর হাতিকে ভক্ষণ করবার জন্য আক্রমণ করে। এইরূপ বিড়ম্বনায় পড়ে হাতি রক্ষাকর্তা বিষ্ণুকে আর্তনাদ করে ডাকতে থাকে। লক্ষমী-নারায়ণ তখন বৈকুণ্ঠপুরীতে পাশা খেলায় মগ্ন ছিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ হাতির আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সুদর্শনকে ডেকে বলে কুমীরের চোয়ালে আঘাত হানতে। আজ্ঞা মাত্রেই সুদর্শন গিয়ে কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। এই কথা লক্ষ্মী বিশ্বাস করতে না পারায় বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে সরযূর ঊর্ধ্বে উড়তে থাকে এবং কুমীরের রক্তে রক্তাক্ত সরযূর জল দেখার পর লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রতি এইরূপ ব্যবহারে অনুতপ্ত হন। লক্ষ্মী-নারায়ণ সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে কুম্ভক হস্তী তাদের স্তুতি করে।

কবি জগন্নাথ দাস এই কাব্যপাঠের মোক্ষলাভের কথা কাব্যাংশের শেষে স্মরণ করিয়ে দেন মোক্ষকামী ভক্তদের। কবি বলেন—

"এমন্ত গজ স্তুতি কথা / শুনন্তি ছাড়ে ভব ব্যথা।।
সুজন মানে এহা শুনি / তরিব ভব তরঙ্গিনী।।
যে এহা পড়ন্তি শুনন্তি / কোটী পাপরু নিস্তারন্তি।।
অষ্টম স্কন্দে স্তুতি রস / ভণিলে জগন্নাথ দাস।।"

বঙ্গানুবাদ :

এরূপে গজ স্তুতি কথা / শুনিলে ছাড়ে ভব ব্যথা।।
সুজন জনে শুন যদি / তরিবে সুখে ভব নদী।।
পড়িবে শুনিবে যে জন / হইবে যে পাপ মোচন।।
অষ্টমস্কন্দে স্তুতি রস / ভণিলে জগন্নাথ দাস।।

'হরিণী স্তুতি' ও **'গজস্তুতি'** কাব্যটির কাহিনীবস্তু মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে রচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার মাধ্যমে জীবনের সহায়ক রূপে শ্রীহরির মহিমা বর্ণিত হয়েছে এই কাব্য দুটিতে। প্রতিটি প্রাণে বিষ্ণুর স্থিতি, এই প্রাণের লাঞ্ছনা বিষ্ণু সহ্য করতে পারেন না। সাধুরে পরিত্রাণ ও দুবৃত্তকে বিনাশের জন্য বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন বারে বারে -এই সারমর্মটি ভগবতপ্রেমীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি।

গ্রন্থ ৩. জড় ভরত উপাখ্যান ঃ

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজা ভরতের জীবনের জড়ত্ব বর্ণনা **'জড়ভরত উপাখ্যান'** কাব্যে স্থান পেয়েছে। অনূদিত কাব্যটি **'নবাক্ষরী'** ছন্দে রচিত। কাব্যাংশে কবি-পরিচিতি অনুপস্থিত। নবাক্ষরী ছন্দের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবে জগন্নাথ দাসের কবিধর্মের মৌলিক লক্ষণ এবং ওড়িয়া ভাষায় ভাগবত অনুবাদের ক্ষেত্রে জগন্নাথ দাসই অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী। পরীক্ষিত ও শুকদেব মুনির কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনার রীতি জগন্নাথ দাসের **'জড়ভরত উপাখ্যান'**-এ উপস্থিত। সুতরাং **'জড়ভরত উপাখ্যান'** জগন্নাথ দাসের কবিকর্ম হওয়া স্বাভাবিক। সমগ্র আখ্যানবস্তুকে শিরোনামের মাধ্যমে সাতটি ছত্রে বিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি ছত্রে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শুকদেব মুনি। প্রথমে পরীক্ষিত ভাগবতে বর্ণিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা শুনতে চাইলেন এইরূপ—

"শুক কহিব দয়া বহি।
ভারত শ্রেষ্ঠ কিবা পাঁই।
কি গুণে হেলা সর্ব শ্রেষ্ঠ
বিশেষি কহ ভাগবত।"

বঙ্গানুবাদ : (হে মুনিশ্রেষ্ঠ, দয়া করে বলুন যে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কী এবং কোন্ গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভাগবত বিশেষে তা বর্ণনা করুন।)

প্রত্যুত্তরে শুকদেব গিরি-নদী-অরণ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের বর্ণনা করলেন। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী, সরযূ, সরস্বতী ও ব্রহ্মপুত্রাদির বর্ণনা করলেন। তার সাথে মহেন্দ্র, মৈনাক, নীল, মলয়, ঋষ্যমুখ, বিন্দ্যাদি, হিমাচল

ইত্যাদি পর্বত ও পর্বতশ্রেণীর বর্ণনা করলেন। ভারতবর্ষ যে বহু খ্যাত মুনি-ঋষির সাধনক্ষেত্র ও ধ্যানভূমি একথাও শুকদেব পরীক্ষিতকে মনে করিয়ে দিলেন। অষ্টাদশ পুরাণ, সাংখ্য দর্শন, বেদান্ত, স্মৃতি ও শুশ্রুত ইত্যাদি মহাগ্রন্থের উৎপত্তির ক্ষেত্র এই ভারত ভূ-মণ্ডল এবং এই প্রদেশে সত্যভামা, শচী, অহল্যা, দ্রৌপদী, সীতা ও কুন্তীর মতো সতী নারীর জন্ম হয়েছে। কর্ণ ও হরিশ্চন্দ্রের মতো দানবীরের সুখ্যাতিতে এই ভারতবর্ষ অমলিন। রামেশ্বরম, কামাখ্যা, পুরী ও হরিদ্বারের মতো তীর্থভূমিতে পবিত্র এই ভারতবর্ষ। এই '**জড়ভরত উপাখ্যান**' -এর প্রথমাংশে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন শুকদেব মুনি।

দ্বিতীয় থেকে সপ্তম ছত্র পর্যন্ত কাব্যের কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন কবি এই ক্রমানুসারে— ভরতের পূর্ববংশ কথন, ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি কথন, ভরতের জড় বিপ্রত্ব কথন, ভরতের ভদ্রকালীর পশুত্বে নির্বিকার কথন, ভরতের রহুগণ রাজার শিবিকা বহন ও উপদেশ দান, ভরতের ভ্রাতৃজায়া প্রদত্ত অখাদ্য ভক্ষণ ও তিরোভাব কথন।

এই কাব্যে ভরত চরিত্রের মাধ্যমে শীল ও শান্তির স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ভরতের সহনশীলতাই ভারতবর্ষের আদর্শ এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে বার বার। মূক ভরতের জড়ত্ব আসলে ভারতবর্ষের ধ্যানমগ্নতা– এই কথা ভরতের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনের প্রতি ভালোবাসাই মোক্ষপ্রাপ্তির পথ — '**জড়ভরত উপাখ্যান**' -এ তা-ই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি বারে বারে।

গ্রন্থ ৪. ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল ঃ

'**ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল**' গ্রন্থটির ভূমিকা-পত্রে '**নীহার প্রেস**'-এর প্রকাশকের নিবেদন এইরূপ :

> *"বহু বৎসর পূর্বে প্রাচীন কবি মহাত্মা জগন্নাথ দাস ও বলরাম দাস তত্ত্বপূর্ণ ভাগবত বিষয়ে যে উপাদেয় 'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল' গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহা এতকাল প্রাচীন তালপাতার পুথির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল আমরা বহু অনুসন্ধানে নানা স্থান হইতে সেই প্রাচীন কীটদষ্ট তালপাতার পুথিসকল সংগ্রহ করিয়া বহু যত্নে তাহা হইতে উদ্ধার ও সংশোধন করিয়া এই গ্রন্থখানি জনসমাজে প্রচার করিলাম।"*

কবি কাব্যের বিষয়কে তিনটি কল্পে বিন্যস্ত করেছেন। **প্রথম কল্পে** কবির বর্ণিত বিষয় ভগবানের অনন্ত শয়ন ও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, **দ্বিতীয় কল্পে** ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের প্রশ্নোত্তর পর্ব বর্ণিত এবং শেষ অর্থাৎ **তৃতীয় কল্পে** ভগবতধর্ম বিষয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যের সমসাময়িক ওড়িয়া সাহিত্যে **'পঞ্চসখা'** পরিচয়ে যে পাঁচ জন কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুইজন কবি জগন্নাথ দাস ও বলরাম দাস মূল ভাগবতের বিষয়কে অনুবাদ করেছিলেন। কবি জগন্নাথ দাস ও কবি বলরাম দাসের যৌথ কবিকর্ম বলে **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'** গ্রন্থের প্রচ্ছদ পত্রে প্রকাশক উভয় কবির নামের উল্লেখ করেছেন। কাব্যস্থিত প্রথম ও তৃতীয় কল্পের ভণিতায় কবি বলরাম দাসের নামোল্লেখ আছে এবং দ্বিতীয় কল্পের ভণিতায় কবি জগন্নাথ দাসের নামোল্লেখ আছে। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে এইরূপ যৌথ কাব্য-পরিকল্পনা বিরল। **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'** নামক ভাগবতের অনুবাদ জগন্নাথ দাস করেছেন বলে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ নেই। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে কবি বলরাম দাসের সৃষ্টি সম্ভারে **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'** রচনাকর্মের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় কল্পের ভণিতায় জগন্নাথ দাসের নামোল্লেখ একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সম্পাদনার ত্রুটি অথবা জগন্নাথের ভণিতায় যে দ্বিতীয় কল্প আছে তা আসলে প্রক্ষিপ্ত অংশ যা **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'**-এর অংশ বিশেষ হয়ে উঠেছে —এটাই আমাদের অনুমান। এই অঙ্গীভূত হওয়ার স্বাভাবিক কারণ হল কাব্যভাষা, নবাক্ষরী ছন্দচর্চা ও ভাগবতের অনুবাদ উভয় কবিই করেছেন।

নামকরণের ক্ষেত্রে **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'** নামটিও তাৎপর্যমণ্ডিত। ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণসমূহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তবে এই আলোচনায় বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিচয় নেই। পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। প্রশ্নকর্তা অর্জুনের প্রশ্নে ভগবান বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ উত্তরগুলি দিয়েছেন। ব্রহ্মা কীভাবে ভূগোলক সৃষ্টি করলেন তার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দান করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'** নামের সার্থকতা এখানে। শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব নয়, তার সাথে সৃষ্টির প্রলয়তত্ত্বও আলোচিত হয়েছে নানা ভাবে। প্রকাশক এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথমে বলেছেন যে, ***"ইহাতে শ্রীকৃষ্ণার্জুনের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগ এবং সৃষ্টি প্রলয় বিষয়ক বহু বিষয় অতি উপাদেয় ভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আমরা আশা করি, ভগবৎ পিপাসু নর-নারীর নিকট এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে। ইতি সন ১৩৩৫ সাল।"***

কাব্যের দ্বিতীয় কল্পের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুন দেহতত্ত্বের স্বরূপ জানতে চাইলে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন এইরূপ:

“শ্রী ভগবানুবাচ।
কহন্তি কমলার বর।
শুন অর্জ্জুন মহাবীর।।
সকল ঘটে লীলা মোর।
মু যাই সকল শরীর।।
ঘটরে লীলা করু থাই।
ঘট ছাড়িলে শূন্যে যাই।।
পিণ্ডরু ঘট ছাড়ি যাই।
তাহাকু কেহি ন দেখই।।
জীব যে শূন্যে চলি গলা।
দেব মানবে ন জানিলা।।
মেঘে বিজুলি যেহ্নে মারে।
মারিন কেঁউ দিগে চলে।।
বিজুলী প্রায়ে জীব যাই।
দেব মানবে ন দেখই।।”

বঙ্গানুবাদ : (ভগবান বললেন হে অর্জ্জুন মহাবীর; সকল ঘটেই আমার লীলাবস্থান। দেহ ঘট ছেড়ে শূন্যে চলে যাই। যখন আমি দেহভাণ্ড থেকে বিদায় গ্রহণ করি তখন দেব ও মানব কেউ জানতে পারে না। মেঘের মধ্যে চকিতে যেমন বিদ্যুৎ চমকে উঠে অদৃশ্য হয়, অনুরূপ জীবের শরীর শূন্য করে শীঘ্র মহাশূন্যে বিলীন হই।)

কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে ভাগবত সৃষ্টির কথা। মহাভারতে বর্ণিত ভীমের বিষ নাড়ু ভক্ষণ ও খাণ্ডব দাহনের কথা এবং অগ্নি, বায়ু, বারি উৎপত্তির নানান গূঢ় তত্ত্ব আলোচিত হয়ে এই কৃষ্ণ ও অর্জুনের সংলাপে। দ্বিতীয় কল্পের শেষে ভগবান কৃষ্ণের কাছে অর্জুন জানতে চান যে, ভক্তি কী এবং কয় প্রকার। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলেন যে, ভূ-অভ্যন্তরে যেমন

অগ্নি লুক্কায়িত থাকে ঠিক তেমনি মানুষের মনের অভ্যন্তরে ভক্তি লুক্কায়িত থাকে। অনলে পুড়ে সুবর্ণের যেমন আয়তন ও ঔজ্জ্বল্যের বৃদ্ধি ঘটে, ভক্তি ও তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়। পাপের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণ বলেছেন যে, দেহবৃক্ষে সময়ে সময়ে নানান সুস্বাদু ফল ফলে। সেই বৃক্ষে দুটি পাখি যথা পাপ ও পরম বাস করে। পাপ ও পরম একে অপরে কেউ কারোর মুখ দেখে না। ক্ষুধার্ত পাপ ফল আহার করে আর কিরাতের পাতানো জালে বন্দী হয়। অপর দিকে পরম নির্লোভ ও উপবাসে থেকে নিরঞ্জনের অপেক্ষায় বসে থাকে। এইভাবে অর্জুনের অনেক কৌতুহল নিরসন করেছেন ভগবান শ্রীহরি। কবি বলরাম দাস এবং জগন্নাথ দাস স্বল্পাক্ষর অর্থাৎ নবাক্ষরে পংক্তি বিন্যাস করে **'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'**-এর জটিল তত্ত্বকে ভগবত পিপাসু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন সহজ সরল প্রাঞ্জল ওড়িয়া ভাষায়।

গ্রন্থ ৫. টীকা ভাগবত বা ভাগবতসার ঃ

ক্ষুদ্র সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে **'টীকা ভাগবত'** বা **'ভাগবতসার'** পুস্তিকাটি। কবি জগন্নাথ দাস দ্বাদশ স্কন্দ বিশিষ্ট সমগ্র ভাগবতের সংক্ষিপ্ত রূপ এই রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। পকেট ডায়েরির আকারে **'নীহার প্রেস'** এই রচনাকে মুদ্রিত করে স্বল্প মূল্যে ভগবতপ্রেমী জনসাধারণের নিকট তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটির একত্রিংশ সংস্করণের রূপ আমাদের সংগ্রহে আছে। গ্রন্থটি যে পূর্ণাঙ্গ ভাগবতের ভাব-নির্যাস তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। স্বল্প শিক্ষিত পাঠকের নিকট এই গ্রন্থ সুখপাঠ্য রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। সংস্কৃত ভাগবতের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি শ্লোক চয়ন করে কবি জগন্নাথ সংক্ষেপে ওড়িয়াতে অনুবাদ করে ভাগবতের গুরুগম্ভীর তত্ত্বকে সরলীকরণ করে সাধারণের সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 'ভাগবতসার' বা 'টীকা ভাগবত' পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

'টীকা ভাগবত' বা **'ভাগবতসার'** পুস্তিকার শেষাংশে কবি জগন্নাথ মূল ভাগবতের সাতটি শ্লোকের অংশবিশেষ নিয়ে ওড়িয়া অনুবাদ করেছেন সহজ সরল ভাষায়। প্রথম শ্লোকটি অনূদিত হয়েছে এইরূপ :

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহ
সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশঃ

বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।"

কবির ওড়িয়া অনুবাদ :

"ক্রোধরে হিতাহিত জ্ঞান।

সরবে লুঅন্তি বিলীন।।

স্মৃতি ভ্রম তঁহু প্রকাশ।

স্মৃতি ভ্রমরু বুদ্ধিনাশ।।

বুদ্ধি নাশরু জীবমান।

থাঅন্তি মৃত জন সম।।"

বঙ্গানুবাদ : ক্রোধ হতে সকল হিতাহিত জ্ঞান বিলীন হয়। তার ফলে স্মৃতিভ্রম বা মতিভ্রম ঘটে। মতিভ্রষ্টতার ফলে বুদ্ধির বিনাশ ঘটে। বুদ্ধি বিনাশের ফলে মানুষ মৃতবৎ অবস্থায় থাকে।

তৃতীয় শ্লোকটি অনুদিত হয়েছে এইরূপ ঃ

"সত্য মৃদু প্রিয়ং বাক্যং

ধীরোহিতকরং বদেৎ।

আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং

পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।।"

কবির ওড়িয়া অনুবাদ :

"সত্য, মৃদু, প্রিয় বচন।

ভাষন্তি সর্ব্বে ধীর জন।।

আত্ম প্রশংসা পরনিন্দা।

সুজনে ত্যজিব সর্বদা।।"

বঙ্গানুবাদ : ধীর ব্যক্তি সর্বদা সত্য, মৃদু ও প্রিয় বচন ভাষে। সুজন ব্যক্তি সর্বদা আত্মপ্রশংসা, পরনিন্দা ত্যাগ করে চলেন।

পঞ্চম শ্লোকটি কবি অনুবাদ করলেন এইরূপ :

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং।

ভজত্যেকত্ত্বমাস্থিতং।।

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি।

স যোগী ময়ি বর্ত্তন্তে।।

কবির ওড়িয়া অনুবাদ :

"সর্ব্বভূতে মো অবস্থান।

এ তত্ত্ব জানে যেঁহু জন।।

সে যোগী কর্ম্ম মধ্যে থাই।

মোতে সকল সমর্পই।।"

বঙ্গানুবাদ : সর্বভূতে আমার অবস্থান। এই তত্ত্ব যে জন মেনে চলে সে-ই যোগীপুরুষ এবং সেই ব্যক্তি তাঁর কর্মের মাধ্যমে সকল কিছু আমার নিমিত্তে সমর্পণ করেন।

এইভাবে **'টীকা ভাগবত'** বা **'ভাগবতসার'** গ্রন্থের মাধ্যমে কবি সংস্কৃতের দুরূহ তত্ত্ব-ভাণ্ডার থেকে সহজ-সরল ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অনুভবের জগতে ভগবত লীলাকে অধিগত করতে সক্ষম হয়েছেন। **'টীকা-ভাগবত'** বা **'ভাগবতসার'** গ্রন্থের জনপ্রিয়তা মালাধর বসুর **'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'** কাব্যের তুলনায় এই অঞ্চলের মানুষের নিকট অধিক জনপ্রিয়। একত্রিংশ সংস্করণের দ্বারা এই পুস্তিকার কতখানি জনপ্রিয়তা আছে তা সহজে অনুমান করা যায়।

গ্রন্থ ৬. শ্রীমদ্ভাগবত : একাদশ স্কন্দ ঃ

'নীহার প্রেসের' অনবদ্য কর্ম ওড়িয়া কবি জগন্নাথ দাসের অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবতের একদশ স্কন্দের বাংলা লিপ্যন্তর। এই গ্রন্থটি ওড়িয়া প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের মানুষের কাছে অধিক সমাদৃত। গবেষক সংগৃহীত পুস্তিকাটি দ্বাদশ সংস্করণের রূপ। সুতরাং পাঠাগ্রহ ও জনপ্রিয়তার বিচারে গ্রন্থটির অধিক সমাদর আছে বোঝা যায়। ভূমিকা অংশে গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার সম্পর্কে প্রকাশক বলেছেন এইরূপ :

"মহাত্মা জগন্নাথ দাস কৃত উৎকল নবাক্ষরী শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দ ভগবত প্রেমিক নরনারী মাত্রেরই অতি আদরের জিনিস। গ্রন্থখানির মধ্যে ধর্ম্মজীবন

গঠনের উপায়সমূহ উপাদেয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাদেয় গ্রন্থ সাধারণের নিকট সমাদরে গৃহীত হওয়ায় এবার দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার কোন চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। সাধারণের মনোরঞ্জক হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।"

দ্বাদশ সংস্করণের প্রকাশকাল ১৪০৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৯৮ সাল। সুতরাং এযাবৎকাল গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অটুট। প্রকাশক এই পুস্তিকাটিকে '**পকেট সংস্করণ**' রূপে উল্লেখ করেছেন। অনূদিত ভাগবতের এই একাদশ স্কন্দের আলোচ্য বিষয়কে কবি জগন্নাথ বত্রিশটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছেন। কবি কর্তৃক প্রদত্ত শিরোনামের অধ্যায়গুলি যথাক্রমে বৈরাগ্য নিমিত্ত মুষল ছলে যদু বংশের নাশ; নারদ-জয়ন্ত সংলাপ ও ভাগবত ধর্ম বর্ণন; ত্রিবিধ বৈষ্ণব কথন; নিমি রাজার প্রশ্নে যোগীগণের উত্তর; দ্রুমিল সপ্তম কর্ত্তৃক অবতার ঘটিত কার্য্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তর; বিষ্ণুপূজার যুগ-যুগান্তর বিধি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর; শ্রীকৃষ্ণকে স্বধাম গমনের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক অনুরোধ; আত্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত হরি কর্ত্তৃক অবধূত ইতিহাসোক্ত অষ্ট গুরুর বিষয় বর্ণন; উর্দ্ধবের আত্মতত্ত্ব জ্ঞানসাধনরূপ দেহসম্বন্ধ বিষয় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বর্ণন; বদ্ধ, মুক্ত, সাধু ও ভক্তের লক্ষণ বর্ণন; সাধুসঙ্গের মহিমা, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্মত্যাগের ব্যবস্থা বর্ণন; বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির বিঘ্নস্বরূপ চিত্তধারণানুগত অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সাধন; জ্ঞান, বীর্য, প্রভাবাদি বিশেষ দ্বারা হরির আবির্ভাব যুক্ত বিভূতি বর্ণন; ভগবান কর্ত্তৃক ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থের হংস কথিত বর্ণাশ্রম বর্ণন; বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম নির্ণয়াদি বিশেষ কথন; অধিকারি বিশেষে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগের কথন; কামাসক্ত ব্যক্তিদের দোষ-গুণ কথন; ভিক্ষুগীতা কথন ও বুদ্ধির দ্বারা মনের সংযম বর্ণন; আত্মার ও অন্য সকল পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব বর্ণন; অসৎসঙ্গ বশতঃ যোগনিষ্ঠার ব্যাঘাত ও সৎসংসর্গে ইহার উন্নতি সাধনের জন্য অসৎ সঙ্গ নিবৃত্তির উপায় বর্ণন; সদা চিত্তপ্রসাদক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্তির হেতু ক্রিয়াযোগ বর্ণন; জ্ঞানযোগের সংক্ষেপ বর্ণন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে গমনেচ্ছায় মূষলচ্ছলে যদুবংশের ধ্বংস সাধন ও শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে স্বীয়ধামে গমন ও বসুদেবাদির তাহার অনুগমন বর্ণন।

গ্রন্থ ৭. উষাহরণ

কবি জগন্নাথ দাসের '**উষাহরণ**' কাব্যটিও ভাগবতের অনুবাদ বিশেষ। শুকদেব মুনি ও পরীক্ষিতের কথোপকথনের মাধ্যমে অনিরুদ্ধ কর্তৃক উষাহরণের কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কৃষ্ণের বীরত্ব ও ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়েছে এই কাব্যে। '**উষাহরণ**' কাব্যে হর ও হরির ঘোরতর যুদ্ধের বর্ণনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কবি জগন্নাথ দাস মাত্র দুটি অধ্যায়ে '**উষাহরণ**' কাব্যের কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন। **প্রথম অধ্যায়ে** স্থান পেয়েছে স্বপ্নযোগে উষার খেদ ও অনিরুদ্ধের সহিত মিলন এবং অনিরুদ্ধের নাগপাশে বন্ধন। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** বর্ণিত হয়েছে মহেশ্বরজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের প্রভাব এবং বাণাসুরের বাহুচ্ছেদন ও হরির স্তুতি। কাব্যটি বীর রসাত্মক ও আখ্যানধর্মী। এই কাব্যের রচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায় জগন্নাথ দাসের স্বভাবসিদ্ধ নবাক্ষরী ছন্দের পংক্তি বিন্যাস। ভাগবতের কোন তত্ত্বকথার বর্ণনা এই কাব্যে স্থান পায়নি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য লীলার প্রকাশ বর্ণিত হয়েছে এই রচনায়। হর ও হরির যুদ্ধ সংঘটনে নারদের অনন্য ভূমিকা এই কাব্যে লক্ষণীয়।

গ্রন্থ ৮ ঃ শুকদেব ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত

'**শুকদেব ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত**' কাব্যটি মহাত্মা জগন্নাথ দাস বিরচিত ভাগবতাশ্রয়ী কাব্য। এই কাব্যের বিষয়বস্তু জগন্নাথ দাস রচিত দ্বাদশ স্কন্দ বিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের বর্হিভূত অংশ। কবি জগন্নাথ দাস তাঁর '**শুকদেব ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত**' কাব্যটির কাহিনীবস্তু তেরটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। কাব্যটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে '**নীহার প্রেস**' -এর প্রকাশক গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন এইরূপ;

> ***"এই গ্রন্থখানি মহাত্মা জগন্নাথ দাস কৃত দ্বাদশ স্কন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের বহির্ভূত অংশ বিশেষ। উহা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় অতীব উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে পরিপূর্ণ। ভগবৎ পিপাসু নর-নারীবৃন্দ এই গ্রন্থখানি পাঠে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠার্থীগণ এই পুস্তকখানি পাঠ না করিলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদনের আংশিক অভাব থাকিয়া যাইবে। এই সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের ভুলভ্রান্তি সংশোধন ও আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি সাধারণের আদরণীয় হইলে শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে।"***

দ্বাদশ স্কন্দে রচিত জগন্নাথ দাসের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত এই কাব্যটি কবির অপর একটি রচনা। ভাগবতের প্রথম স্কন্দ থেকে '**শুকদেব ঋষির জন্মবৃত্তান্ত**' কাব্যটির কাহিনীবস্তু গ্রহণ করেছেন। সমগ্র কাব্যটি নবাক্ষরী ছন্দে রচিত। পাঁচালীধর্মী এই কাব্যটি মোক্ষকামী ভগবতপিপাসু মানুষের কাছে অতি উপাদেয় বলে স্বীকার করেছেন প্রকাশক।

কাহিনীর প্রথম অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন ও জন্মেঞ্জয়ের কথোপকথনে উঠে এসেছে কলি রাজার জন্মবৃত্তান্ত এবং রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ প্রাপ্তির বর্ণনা। গুরু সন্দীপন মুনির আশীর্বাদে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ মোচনের কাহিনী আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাই। তৃতীয় অধ্যায়ে উত্থান বনে হরপার্ব্বতীর অষ্টাদশ পুরাণের গোপন আলোচনা শ্রবণ করতে থাকে শুক ও শারী। শিবের অভিশাপে কবি রূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণভক্ত শুকুরা শবর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়মিত সেবা করে প্রসন্ন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে নিজমূর্তি প্রকাশ করে পরম ভক্তকে দর্শন দেন। জন্ম-মৃত্যু কষ্টের বর্ণনা করা হয়েছে কৃষ্ণ এবং শুকুরা শবরে কথোপকথনের মাধ্যমে। পঞ্চম অধ্যায়েও কৃষ্ণ ও শুকুরা শবরের কথোপকথন লক্ষ্য করি। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় হল জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ কাতর শুকুরা শবরকে ব্যাসদেবের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করতে আজ্ঞা প্রদান করেন। সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয় হল শুকুরা শবর ও শবরী দেহত্যাগ করেন ও দেবগণ মৃতদেহ নিয়ে অগ্নি সৎকার করেন। তারপর শুকদেব জ্যোতিরূপ ধারণ করে ব্যাসদেবের স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশের পূর্বে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দর্শনলাভ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এইরূপ যে, দ্বারকায় ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবের জন্মকালীন গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি করণীয় কর্তব্যসমূহের পরামর্শ দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বজ্রকচ্ছ দান, যে বজ্রকচ্ছ ভক্ষণ করলে গর্ভমধ্যে শুকদেব ঋষি তা পরিধান করে মাতৃযোনীতে মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করবেন। কারণ মাতৃযোনীতে যাতে উলঙ্গ শরীর স্পর্শ না করে তার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে শুকদেব সত্যপালন করেছিলেন। নবম অধ্যায়ে মুনি-ঋষি নিয়ে ব্যাসদেবের যজ্ঞের বর্ণনা আছে এবং ব্যাস সরোবরে শুকদেবের জন্ম দেখবার জন্য দেবাসুরের আগমনের কথা বর্ণিত আছে। ব্যাস সরোবরে দেবকন্যাগণের জলক্রীড়া দেখে দেবাসুরগণ তাদের লজ্জাহানি করলে ব্যাসদেব দেবাসুরদের অভিশাপ দেন —এইরূপ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দশম অধ্যায়ে। একাদশ অধ্যায়ে ব্যাস সরোবরে শুকদেব ঋষির জন্মগ্রহণের বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে শুকদেবের বৈরাগ্যলাভের কাহিনী

বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ অধ্যায় অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে শুকদেব ঋষি চব্বিশজন গুরুর উপদেশ গ্রহণ করে কঠোর তপস্যা করে লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন এবং ঋষিগণের সহিত নানাদি তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী। এবং শেষে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে তাঁর মিলন দৃশ্যও বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থ ৯. রাসলীলা

জগন্নাথ দাস রচিত **'রাসলীলা'** কাব্যটি অতি জনপ্রিয় একটি রচনা। এই কাব্যের জনপ্রিয়তা কতখানি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টাবিংশ সংস্করণে মুদ্রিত পুস্তিকাটি লক্ষ্য করলে। **'রাসলীলা'** কাব্যের বিষয়বস্তু ভাগবত থেকে নেওয়া হয়েছে। কাব্যটি প্রাঞ্জল ওড়িয়া ভাষায় নবাক্ষরী ছন্দে অর্থাৎ নয় অক্ষর বিশিষ্ট পংক্তি বিন্যাসে রচিত হয়েছে। পাঁচালীর ঢঙে কাব্যটি পঠিত হয়।

কাব্যটির সমগ্র কাহিনীবস্তু পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রাস বিহারার্থে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন এবং রাসলীলার শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সন্তপ্ত গোষ্ঠীগণ অতি গভীর নিশায় উন্মত্তবৎ হয়ে বনে বনে ভ্রমণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিণীত প্রার্থনা জানাচ্ছে একত্রে কুঞ্জবনে গমনের জন্য। গোপীগণের বিরহ বিলাপ শুনে দয়াদ্র শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সমক্ষে আবির্ভূত হলেন এবং প্রেমবিহ্বল গোপীগণের প্রতি সান্ত্বনা প্রদান করলেন চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে। পঞ্চম অধ্যায়ে গোপীগণের সহিত রাসলীলার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সুনিপূণ শব্দালংকার প্রয়োগে **'রাসলীলা'** কাব্যটি অনন্য মাত্রা পেয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণনায় কবি জগন্নাথ অনুপ্রাসের প্রায়োগিক কৌশলে কাব্যমাধূর্যের মাত্রাকে অনেকটা উর্দ্ধমুখী করে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবি বলেছেন —

"রাস বিলাস রস রঙ্গ।
ভ্রুকুটি কুটিল অনঙ্গ।"

অথবা গোপীগণ যখন একান্তভাবে কৃষ্ণকে চুম্বন করলেন সেই দৃশ্য কবি বর্ণনা করলেন এইভাবে—

"কুণ্ডল তটে মুখ দেলা।
চুম্বনে তাম্বুল লাগিলা।"

অথবা "গোপ গোবিন্দ মায়া মোহি।
কোপ ন কলে গোপ সাঞ্ঞি।।"

'অতিবড়ি' কবি জগন্নাথ দাস সমগ্র মধ্যযুগীয় ওড়িয়া সাহিত্যে ভাগবতবেত্তা রূপে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা সন্দেহাতীত। নবাক্ষরী ছন্দের মাধ্যমে অর্থাৎ শব্দের সামান্য সম্বল (মাত্র নয়টি অক্ষর) নিয়ে অসামান্য শিল্প নির্মাণের দক্ষ কারিগর হলে কবি জগন্নাথ দাস।

গ্রন্থ ১০. জন্মাষ্টমী ব্রত

'জন্মাষ্টমী ব্রত' গ্রন্থটি পাঁচালী বিশেষ। ব্রতকথাধর্মী সাহিত্য নয়। কারণ ব্রতপালনের প্রথা-পদ্ধতি বা আচরণ-পারণের কোন নির্দেশিকা এই রচনায় পাওয়া যায়না। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং বসুদেবের দ্বারা নন্দালয়ে প্রেরণ পর্যন্ত এই কাব্যের কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও তার পরবর্তী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে। এই কাব্যের আখ্যানধর্মীতা পাঠককে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। নামকরণের ক্ষেত্রে **'ব্রত'** শব্দটি থাকলেও স্বাভাবিকভাবে এটি কোন ব্রতকথাধর্মী সাহিত্য নয়। অন্যান্য মোক্ষলাভের পথ ব্রতকথাধর্মী সাহিত্যের মতো এই রচনায় নির্দেশিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণেরই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করলে সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়। এইরকম উপদেশ ছাড়া কাব্যের কোথাও মোক্ষলাভের পন্থা নির্দেশিত হয়নি।

ওড়িশা সীমান্তবর্তী বাংলার জনজীবনে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের এই অনূদিত সাহিত্যের প্রতি যে পাঠাগ্রহ তার অন্যতম কারণগুলি হল—

এক।। গীতিপ্রাণতা এই সকল কাব্যের প্রধান লক্ষণ। এই সকল কাব্যের প্রচার মাধ্যম গান হওয়ার কারণে ওড়িয়া লিপি পাঠে অক্ষম মেদিনীপুরের মানুষের কাছে এর প্রসার দ্রুততর হয়েছে।

দুই।। তত্ত্বভারশূন্য এই সকল অনুবাদকর্ম স্বল্পশিক্ষিত মানুষের কাছে সহজবোধ্য

সাহিত্যরূপে বিবেচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও মালাধরের ভাগবতের বিশালাকৃতির কাছে এই সকল পুস্তিকার ক্ষুদ্র সংস্করণ অল্প শিক্ষিত, শ্রমব্যস্ত নারী-পুরুষের কাছে অধিক সমাদৃত হয়েছে।

তিন।। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আকর্ষণীয় বিষয়, যেমন— সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, রামের বনবাস, সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি বিষয় কাব্যের কাহিনী হওয়ায় অল্পশিক্ষিত পাঠক ও অশিক্ষিত শ্রোতা পাঠাগ্রহ নিবৃত্তিতে ও রসাস্বাদনে কৌতুহলী হয়েছেন। মূল ভাগবতের তত্ত্ব জটিলতা অপেক্ষায় সহজ-সরল ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার মাধ্যমে অনুবাদক সাধারণ মানুষের ধর্ম ও মোক্ষলাভের পন্থা নির্দেশ করেছেন।

চার।। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের ব্যয়ভারের তুলনায় এই সকল ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট পুস্তিকাগুলির ক্রয়মূল্য যৎসামান্য এবং তা সহজপ্রাপ্য হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

পাঁচ।। উত্তর কলিঙ্গে প্রচলিত **'উত্তরা ওড়িয়া'**[১১] উপভাষা এবং তার শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের উপস্থিতি এই সকল অনুবাদ কর্মে আছে এবং দক্ষিণ মেদিনীপুরের **'মালঝিটা'**[১২] উপভাষার প্রভাব ও মিশ্রণ এই ওড়িয়া ভাষার উপর বর্তেছে। এছাড়া স্থানীয় লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনের উপস্থিতি এই সব কাব্যের মধ্যে লক্ষিত। সুতরাং এইরূপ সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য থাকা স্বাভাবিক।

প্রেমানন্দ প্রধান তাঁর **'মালঝিটা উপভাষা'** নামক গ্রন্থে **'নীহার'** প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন যে, ***"১৮৯৫ সালে কাঁথি নীহার প্রেসের ভূমিকা এই প্রশংসার দাবী রাখে। এই ছাপাখানাটি জীর্ণ তালপত্র বা অনুরূপ দ্রব্যের উপর লিখিত বহু প্রাচীন ওড়িয়া পুঁথি বাংলা হরফে প্রকাশ করে এতদ্‌ঞ্চলীয় লোকভাষা ও লোকসাহিত্যের গতিপথ নির্ণয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই পুস্তিকাগুলির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। মালঝিটার উপভাষিকপ্রজন্মের চরিত্র ও লোকসাহিত্যের পটভূমি নির্ণয়ে এই পুস্তকগুলির অন্ততঃ কয়েকটির নামোল্লেখ করার প্রয়োজন"***[১৩] এইরূপ বলে তিনি নীহার প্রকাশিত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনূদিত গ্রন্থগুলির তালিকা তুলে ধরেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, ওড়িয়া সাহিত্য, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা - ১৭।

২. দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।

৩. দ্রষ্টব্য ঃ প্রেমানন্দ প্রধান, অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত, প্রবন্ধ ঃ দক্ষিণ মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসাহিত্য, পৃষ্ঠা - ১৯৯।

৪. দ্রষ্টব্য ঃ ভুদেব মুখোপাধ্যায়, আচার প্রবন্ধ, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ২১৬।

৫. দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।

৬. দ্রষ্টব্য ঃ ওড়িয়া পোর্টাল.কম, অনন্ত ব্রত কথা, পৃষ্ঠা - ৭।

৭. দ্রষ্টব্য ঃ রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণী, পৃষ্ঠা - ৭১৫।

৮. দ্রষ্টব্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা - ২৯২।

৯. দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২০।

১০.দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।

১১.দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।

১২.দ্রষ্টব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশনী, নারায়ণ গড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৭১৫।

১৩.দ্রষ্টব্য ঃ প্রেমানন্দ প্রধান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৯৮।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা হরফে ওড়িয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা : বিবরণ উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা

১.	শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন	—	নিত্যানন্দ দাস
২.	রসকেলী	—	দ্বিজমুরারি
৩.	নাবকেলী	—	দ্বিজমুরারি
৪.	চোরকেলী	—	কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা হরফে ওড়িয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা : বিবরণ উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা

গ্রন্থ ১. শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন, কবি - নিত্যানন্দ দাস ঃ

অধুনা পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের মথুরিবাড় গ্রামের কবি নিত্যানন্দ দাস '**শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন**' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি বাংলা হরফে ওড়িয়া ভাষায় রচিত। কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীরাধার চরিত্রের কলঙ্কলেপন এবং সেই কলঙ্কভঞ্জন করেন শ্রীহরি - এইরূপ বিষয়ের একটি জনপ্রিয় এবং লোকমুখে প্রচারিত কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ফটোকপি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। যেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> ***"শ্রীশ্রীহরিজীউ শরণং/শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন/-ঃ০ঃ-/রচয়িতা ও প্রকাশক শ্রী নিত্যানন্দ দাস/সাং - মথুরিবাড়/পোঃ- জানকাপুর/মেদিনীপুর/সংশোধনকারী - শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল/বাং সন ১৩৫৮/মূল্য - ৯ টাকা বার পয়সা মাত্র।"*** **(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৬ক দ্রষ্টব্য)**

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। পুস্তিকাটি ১৩.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। এতে প্রচ্ছদপত্র (১) পশচাদপত্রসহ মূলগ্রন্থ (১৩) সহ মোট ১৪টি পৃষ্ঠা আছে।

রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে — **"শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন/রাজন কুহই শুন ভাবগ্রাহী/ শ্রীরাধা কলঙ্ক কথা"**

কাব্য-কাহিনী ঃ

ষোল সহস্র গোপিনী সমেত যমুনার কূলে শ্রীরাধা দূতীকে বলছে 'সখা শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে যাই চল। সে তো আমাদের সকলের সখা।' শ্রীমতীর কথা শুনে সকলেই তাকে বোঝাতে

থাকে যে, সেই নন্দবালক অতি লম্পট। তার পাশে যাওয়া নিরাপদ নয়। শ্রীরাধাকি সত্যি বাতিকগ্রস্থ হলো নাকি? যে কৃষ্ণ পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেয় তার কাছে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। রাধিকা গোপীগণকে আস্বস্ত করে যে, নন্দবালক মোটেই সে প্রকৃতির ছেলে নয়। তাকে সে ভয় করেনা, তাদেরও ভয় করার কোন মানে হয়না। বৃন্দাবনে গোপীসহ রাধারানি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। গোপীদের দর্পচূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের বস্ত্রহরণ করলেন। গোপীরা কৃষ্ণের কাছে আকূতি করে তাদের পরিধেয় বস্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। বালক কৃষ্ণ বলেন তাদের কোন কথা সে শুনবে না। এই অবস্থায় তাদের সাথে খেলা করতে চায়। বালক কৃষ্ণের এইরূপ আক্কেল দেখে সকাতর ভাবে তারা যশোদাকে ডাকলে। যশোদা ছুটে এল কৃষ্ণ কান্না জুড়লেন। যশোদা কৃষ্ণের কান্নার কারণ জানতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন ‘এই গোপীদের সাথে খেলছিলাম, এরা আমরা খেলনা বল (Ball) লুকিয়ে রেখেছে।’ গোপনারীরা বলে ‘আমরা কেউ ওর খেলনা বল লুকাইনি, কৃষ্ণ আমাদের সাথে কপটতা করছে।’ যশোদা পুত্রের অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়। যশোদা তাদের বস্ত্রগুলি ঝাড়তে বললেন এবং কৃষ্ণের লীলায় সেই বস্ত্রপুঞ্জ থেকে বল বেরিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। তা দেখে যশোদা গোপীদের ধিক্কার জানায়। এই ঘটনায় গোপীরা রীতিমত হতবাক হয়ে যায়। এই ঘটনার পর গোপীরা লজ্জিত হয়ে যে যার ঘরে চলে যেতে কৃষ্ণ কান্না শুরু করেন এবং বলেন ‘তারা আমার খেলার সাথী। আমি তাদের কাছে যাবো।’ এই কথা শুনে যশোদা বিরক্ত হয়ে বলেন যে, এই নারীরা ভালো নয়, এদের সঙ্গ নেওয়া উচিৎ কাজ হবেনা। পুত্রকে বাধা দিয়ে কলসী কাখে যশোদা যমুনায় জল আনতে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন কৃষ্ণ নেই। বাড়িতেও নেই। নন্দরাণী ভয় পেলেন। গোপপুরে সন্তানকে দেখতে পেলেন শ্রীরাধার পালঙ্কে রাধার কোলে সুখনিদ্রায় রত। সচক্ষে মা দেখলেন পুত্রের এই লীলা। যশোদা জটিলাকে ডেকে জানাতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ বিড়াল রূপ ধারণ করলেন এবং রাধারানী হয়ে গেলেন ইঁদুর। হঠাৎ কৃষ্ণ কোথা থেকে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে জানতে চায় যে, মা এতক্ষণ কোথায় ছিলো। এইভাবে শ্রীহরি রাধারানীর কলঙ্কভঞ্জন করলেন।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক উপরোক্ত কাহিনী নিয়ে **‘শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন’** কাব্যটি রচিত। কবি কাব্যের শেষাংশে স্বীকার করেন যে, শাস্ত্র-পুরাণকে নির্ভর করে এই কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু এই কাব্যকাহিনী পুরাণ বা ভাগবতসম্মত নয়। কবি সম্ভবত বাল্যলীলা রচনা করতে গিয়ে লোকমুখে প্রচলিত আদিরসাত্মক ভাগবত-অনুচিত বৃন্দাবনী-লীলার কাহিনীকে গুলিয়ে ফেলে

আদিরসের-ভিয়েন রচনা করেছেন। পুরাণনির্ভর কাহিনী মোটেই নয়, লোকমুখে কানুকথার কাহিনীকে সরাসরি কাব্যের বিষয় করেছেন কবি। দুগ্ধপোষ্য কানাইর এইরূপ অকালপক্কতা বা বস্ত্রহরণের মত গর্হিত যৌনাচার শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিষয় নয়, তা বৃন্দাবনলীলার বিষয়। কবি নিত্যানন্দের এইরূপ ধারনা পুরাণ পাঠলব্ধ নয়, তা লোকমুখে প্রচলিত কানুকথা থেকে আহৃত — এই নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারেনা।

চরিত্র চিত্রণ ঃ

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' কাব্যে মূল চরিত্র তিন জন। মা যশোদা, বালক কৃষ্ণ ও রাধারানি। এছাড়া দূতী চরিত্র একজন আছে। এই দূতী চরিত্রের নামের উল্লেখ করেন নি কবি। জটিলা চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও কাব্যকাহিনীতে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। এছাড়া রাধার সঙ্গে পরোক্ষভাবে আছে অন্যান্য গোপিনীরা। উল্লেখ্য এই যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় দৌত্যকর্ম সম্পাদনার জন্য দূতী সম্বোধনে একজন গোপীর উল্লেখ থাকলেও বড়াই চরিত্রের কোন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। কবি নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্যে বৃন্দাবনলীলার প্রণয় কাহিনীকে এনেছেন। স্বাভাবিক কারণে বড়াই চরিত্রের আনয়ন এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন বলে কবি মনে করতে পারেন।

কৃষ্ণ চরিত্রের অকালপক্কতা ও কপটচারিতা রচনাটিতে উল্লেখযোগ্য। মায়ের আঁচলে যে শিশু লালিত সেই শিশুর এইরূপ দুরভিসন্ধিকে বালসুলভ ক্রটী বলে মেনে নেওয়া যায় না। কবির কাব্যকৃতির ক্রটী এই কারণে বলতে হয় যে, বাল্যলীলার ক্রিড়াকৌতুকের মধ্যে কামপ্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য আরোপ না করে গোষ্ঠলীলার বা বালক কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক শৈশবকে চিত্রণ করলে ভক্তিধর্ম বজায় থাকত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার বিষয়বস্তুতে নিম্নরুচির প্রকাশ থাকায় লোকসাধারণের কাছে গুপ্ত পুস্তিকায় পরিণত হয়েছিল। যার ফলে এই সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা বয়স ও রুচি নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে না থাকায় এর কোন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

যশোদা চরিত্রের অন্ধবাৎসল্য ও বিচারবোধহীন- মায়ের রূপ ফুটে উঠেছে। পৌরাণিক যশোদা চরিত্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি রাধাকৃষ্ণের খুনসুটির মধ্যে এক নিরপেক্ষ অভিভাবিকা রূপে। এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে যশোদা চোখ-কান বন্ধ রেখে কৃষ্ণের অন্যায়-আবদারকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন এবং নির্দোষ গোপিনীদের দোষারোপ করেছেন। একথা সত্যি যে, পুত্র কৃষ্ণের অলৌকিক

মহিমায় যশোদা বিভ্রান্ত এবং কৃষ্ণের স্বরূপকে জানতে অপারগ হয়েছেন। এর ফলে গোপিনীদের প্রতি সে অন্যায় দোষারোপ করেছেন। রাধা চরিত্রের মধ্যে এক বাঁধভাঙ্গা কৃষ্ণপ্রেমের উচ্ছ্বাস কাব্যের শুরুতে লক্ষ্য করা গেলেও কবি শেষপর্যন্ত তা বজায় রাখতে পারেন নি। তবে কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং চরিত্রে কালিমা নিতে হয়েছে। কলঙ্কভঞ্জন কৃষ্ণ রাধাচরিত্রের কালিমাকে মুছে দিয়েছে অনায়াসে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায়। শ্রীরাধা তাঁর কলঙ্কভঞ্জন কৃষ্ণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এইভাবে —

"শ্রীমতী কুহন্তি শুনহে শ্রীপতি
মু অটে নারী অবলা
মোহর কলঙ্ক ভঞ্জন করিল
ধন্য তুম্ভ হরি লীলা গো।
মোতে ন কর হেলা।" (পৃষ্ঠা - ১০)

ভাষা ঃ

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' কাব্যের ভাষা ওড়িয়া। ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুর তথা কবির জন্মস্থান জানকাপুর এলাকার কথ্য ওড়িয়া ভাষায় কাব্যটি রচিত। বিশশতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই সব অঞ্চলে ওড়িয়া ভাষায় গ্রাম্য কাব্য-কবিতার লিখিত ধারা প্রচলিত ছিল। ১৯৫১ সালে কবি নিত্যানন্দ এই কাব্যটি রচনা করেন। কবি সমগ্র কাব্যটি রচনা করার পর শেষে আত্মপরিচিতি দিয়েছেন অভিনব কৌশলে। আত্মপরিচিতি বাংলা ভাষায় লিখলেন কবি —

"শ্রীচৈতন্য সঙ্গ পাইয়া কহে নিত্যানন্দ
মাকে ভজ বাপকে পাবে ঘুচবে মনের ধন্দ
প্রাণের উপর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে
সাপের মাথায় হংসের ডিম তাহে হরিণ চরে
ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ডিমের বাজার তায়
শাপের মুখে ফুল ফুটেছে কর্তা বসে তায়
সাধ করে ঘর কোরেছ দ্বার করেছ নটা —
ভুতের মুখে ফুল বাগিচে পাড়ায় পাড়ায় ছটা

ভুতের মুখে ফুল বাগিচে পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে

জলের ভিতর আগুন দিয়া বউ দেখে চেয়ে।” (পৃষ্ঠা - ১২)

এইরকম কিছু দূরুহ হেয়ালীপূর্ণ চরণ প্রয়োগ করে কবি কোন একটি তত্ত্ব বিষয়কে বোঝাতে চেয়েছেন, কীকারণে এই হেয়ালীপূর্ণ বাক্যবন্ধ ব্যবহার করলেন তা বোঝা খুব শক্ত। এই অংশের সামগ্রিক অর্থ আমাদের কাছে অস্পষ্ট।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

‘শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন’ পুস্তিকাটি শুরু হয়েছে পুরাণকথক এবং ভাবগ্রাহী শ্রোতার কথোপকথনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পুরাণকথক রাজন অর্থাৎ জনৈক রাজা যার নাম কবি উল্লেখ করেননি। এই রাজা আসলে কে, তা কাব্যের মধ্যে কোথাও উল্লেখ নেই। রাধাকৃষ্ণ আসলে যুগল বিগ্রহ এবং একাসনে ক্রীড়ারত - এই কথাটি কবি নিত্যানন্দ দাস প্রকাশ করলেন এইরূপ —

“শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা নুহে ভিন্ন একা
ক্রীড়া করুছন্তি সঙ্গে।
গোপপুর নারী ব্রজপুর হরি
রঙ্গ করুছন্তি সঙ্গে গো।।
সে যে যশোদা বাল।” (পৃষ্ঠা - ৩)

বঙ্গানুবাদ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ভিন্ন নহে একা
ক্রীড়া করিতেছে সঙ্গে
গোপপুর নারী ব্রজপুর হরি
রঙ্গ করে নানা ভঙ্গে।।
সে যে যশোদা সুত।

শ্রীরাধা রাসলীলার নিমিত্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে গোপীগণ রাধাকে বুঝিয়েছেন এইরূপ —

"শ্রীমতীর বাণী শুনি গোপবালী
কুহন্তি সবু বুঝাই।
সে যে নন্দবাল লম্পট অছন্তি
তাঙ্ক পাশে যিবা নাই গো।।
তুম্ভে হেল কি বাই।" (পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ ঃ

শ্রীমতীর বাণী শুনিয়া গোপিনী
কহিল সবাই বুঝায়ে।
সে যে নন্দসুত আছয়ে লম্পট
তাহার পাশে না যাইব গো।।
তুমি হইলে বাতিক নাকি ?

এক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনেক আগে থেকে গোপিনীদের কৃষ্ণের সম্পর্কে ধারনা এই যে, সে একজন লম্পট যুবক। শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য আদি-মধ্যযুগের রচনা বড়ু চণ্ডীদাসের **'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'** কাব্যে পাই। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রগাথা লোকজীবনে অজানা নেই। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা মোহিনী মায়া আসলে সাধারণ জনরুচির কাছে লম্পট যুবকের ছল-চাতুরী —এই ভাবনা এহেন সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এই রচনাটির সামগ্রিক বিচার করলে কৃষ্ণের দেবমহিমার প্রকাশ বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। লৌকিক মহিমাই এই **'শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কভঞ্জন'** পুস্তিকার মূলকথা।

গোপিনীদের বস্ত্রহরণ পর্বে যখন মাতা যশোদার কাছে গোপিনীরা নালিশ করে আর সেই কারণেই যশোদা কৃষ্ণের কাছে জানতে চায় যে কেন গোপিনীদের প্রতি এরূপ আচরণ করল। তখন কৃষ্ণ হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে আমার খেলার বল বস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল গোপিনীরা। তাই বল ফিরে পেতে গিয়ে গোপীদের বস্ত্রহরণ করতে বাধ্য হয়েছে সে। কবি লিখলেন—

"শ্রীকৃষ্ণ বোইলে শুন মাতা মোর
কহুচি সত্য খবর।

গোপীমান সঙ্গে খেলিথিলু আন্তে

বল লুচাইচি মোর গো।।” (পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদ : *কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ মাতা মোর শোন*

কহিতেছি সত্য বারতা

গোপীগণ সঙ্গে ক্রিড়াকালে রঙ্গে

বল লুকায়েছে মোর গো–

শ্রীকৃষ্ণ কপট ক্রন্দন করে মা যশোদাকে এইরূপ কথা বুঝিয়ে গোপীদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। এই ঘটনা ভাগবতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না। গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বল খেলা যেন লৌকিক অনুষঙ্গ। ‘বল’ বা Ball এই রূপ ক্রীড়া সামগ্রী পুরাণ উল্লিখিত নয়। কবির এইরূপ প্রক্ষিপ্ত বিষয় উপস্থাপন আসলে লৌকিক অনুষঙ্গের বিষয়।

শুধুমাত্র যে লৌকিক বিষয়বস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য প্রকাশ পেয়েছে তাই নয় কবি নিত্যানন্দ দাস শ্রীকৃষ্ণের এহেন কার্যকে তত্ত্বের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

“শ্রীকৃষ্ণঙ্ক লীলা ভবজলে ভেলা

মায়া কেহি ন জানহি।

যোগী ঋষি মানে করুচন্তি ধ্যান

তেবে ন পারিবে কহি গো।।”

বঙ্গানুবাদ : *শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভবজলে ভেলা*

তাহার মায়া কেবা জানে?

যোগী ঋষিগণে আস্বাদিছে ধ্যানে

তথাপি বর্ণিবে কেমনে?

শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন দৃশ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কবি নিত্যানন্দ দাস নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে Suspension বা নাট্য-চমৎকারিত্ব এনেছেন এইরূপ— শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিকট যেতে চাইলে মা

যশোদা বলেন যে গোপীদের বিশ্বাস করা যায়না, তারা বিশ্বাসঘাতক। তারা শ্রীকৃষ্ণর অনিষ্টসাধন করতে পারে। কৃষ্ণকে যেতে বারণ করে মা যশোদা কাখে কলসী নিয়ে জল আনয়নে গেলেন। জল নিয়ে ফিরে এসে গৃহে দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ নেই। তৎক্ষণাৎ গোপপুরে গিয়ে যশোদা যে দৃশ্য দেখলেন তা এইরূপ বর্ণিত—

"নন্দরাণী ভয়ে বিকল মনরে
আসিলে গোপপুরকু
রাধাকৃষ্ণ দোহে পলঙ্কু উপরে
সুখরে নিদ্রা যাউচি গো
মাতা নেত্রে দেখিলে
রাণী জটিলাকু ডাকিলে গো।
বিড়াল মূর্ত্তি ধরিলে শ্রীপতি
রাধাকু কলে মুসিক
কৃষ্ণ মায়া কলে মর্জার হইলে
ঘরকু হেলে বাহার
মাতার পাশকু যাই
মাতা তুম্ভে যাইথিল কাঁহি গো।"

বঙ্গানুবাদ :
ভয়ে নন্দ জায়া আকুল হইয়া
ধাইলেন গোপপুরে।
রাধা সঙ্গে হরি পালঙ্ক উপরি
সুখের নিদ্রা ঘোরে।।
দেখিলেন যশোমতী–
দেখগো জটীলা রাধা গোপবালা
এ হেন তোমার বধূ?
দুষিছ কানুরে রাধার সঙ্গরে
দুর্নাম দিতেছ শুধু।।

সহসা বিড়াল আকার হইল
চতুর নন্দসুত।
রাধা কলেবরে সে যে রূপ ধরে
ক্ষুদ্র মুষিকের মতো।।

জটিলার কাছে শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন করলেন শ্রীকৃষ্ণ নিজে বিড়ালের রূপ ধারণ করে এবং শ্রীরাধাকে মুষিকে রূপান্তরিত করে। পুত্রের এ হেন লীলা দেখে যশোমতী রীতিমতো স্তম্ভিত। জটিলার নিকট হতে তাকে ধিক্কার পেতে হয়েছিল সেদিন।

কবি নিত্যানন্দ '**শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন**' পালার শেষে বলেছেন যে, এই পুস্তিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্রমতে চলেছেন অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু রচনাংশে যে ঘটনা বা ক্রিয়ার আরোপ করেছেন তা লৌকিক বিষয়বস্তু নির্ভর। অর্থাৎ পৌরাণিক আধারে কবি লোকজীবনের কৃষ্ণলীলা নির্ভর কাহিনীর মাধ্যমে পাঠকের রসতৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণরে লীলাকৌতুক মহিমা প্রকাশই ছিল কবি নিত্যানন্দের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাঙালি কবি নিত্যানন্দ যাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার মথুরাবাড় গ্রামে অর্থাৎ বাংলার মূল ভূখণ্ডে। কবি কাব্যের শেষাংশে বলেছেন —

"মুহি মুঢ় নর মেদিনীপুর জেলার
গ্রাম মো মথুরিবাড়।
পোষ্ট জানকাপুর জেলা মোহনপুর
সর্ব্বে দোষ ক্ষমাকর মোর গো।।" (পৃষ্ঠা - ১২)

কবি নিত্যানন্দ জন্মস্থানের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে তথ্যগত ভুল রয়েছে। কবি জেলা হিসেবে মোহনপুর বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সাবেক কালে মোহনপুর বলে কোন অঞ্চল জেলা রূপে ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি থানা মোহনপুর। এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান হলো ওড়িশার বালেশ্বর জেলার সীমানা ঘেঁষা একটি জায়গা। এই অঞ্চল এককালে ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত বালেশ্বর পরগনার তালুক ছিল। কবির কাব্যরচনার প্রেক্ষাপট পৌরাণিক অর্থাৎ দ্বাপর যুগের কিন্তু কবি বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে

কাব্যরচনা করেছেন। বিশশতকে এইরূপ কাব্যরচনার প্রবণতা অর্থাৎ পৌরাণিক বিষয় নিয়ে বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের লৌকিক কৃষ্ণকথা নির্ভর কাব্য রচনার তাগিদ এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় না। কবি কাব্যরচনার জন্য যে প্রকৌশল অবলম্বন করেছেন তা সমসাময়িক লিখিত সাহিত্যচর্চার ধারায় বেমানান। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় কবি নিত্যানন্দ স্মৃতি এবং শ্রুতিকে অবলম্বন করে কৃষ্ণকথা ধারার মৌখিক সাহিত্যকে লিখিত রূপে প্রকাশ করেছেন। এই কাজে স্মৃতি যেখানে কবিকে বিভ্রমে ফেলেছে সেখানে কবি নিজস্ব কবিত্বশক্তি দিয়ে পূরণ করেছেন এবং সে কথা কবি শাস্ত্র-পুরাণকে অবলম্বন করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। কাব্যের একাংশে বলেছেন —

"কলঙ্ক ভঞ্জন কলি রচণ
নেই শাস্ত্র পুরাণর গো
মুহি মুড় অজ্ঞান
(মাতা) সরস্বতী পাদে মো প্রণাম গো।" (২৮ সংখ্যক পদ, পৃষ্ঠা - ১১)

অর্থাৎ 'শাস্ত্র-পুরাণ নিয়ে '**কলঙ্কভঞ্জন**' অর্থাৎ '**শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন**' রচনা করলাম। আমি মূঢ় ও অজ্ঞানী। মা সরস্বতীর পায়ে প্রণাম জানাই।' এক্ষেত্রে অনুমান যে কবির শাস্ত্রজ্ঞানের এই স্বীকৃতি অসত্য নয়, তবে শাস্ত্রপাঠ নির্ভর জ্ঞান এটা নয়। কারণ ভগবৎ ধারনা নির্ভর কৃষ্ণকথা লিখতে বসে কবি অনেক অশাস্ত্রীয় ও লৌকিক স্তরের রঙ্গ-রসিকতাকে কাব্যে ঠাঁই দিয়েছেন। কিংবদন্তি বা লোকমুখে প্রচারিত কানুকথাকে অবলম্বন করে কবি এই কাব্যের অবতারণা করেছেন।

ভাষা ঃ

কাব্যটি বাংলা লিপিতে ওড়িয়া ভাষায় লিখিত। উল্লেখ করা যায় যে, কবি কাব্যের মূল অংশ অর্থাৎ আখ্যানভাগ ওড়িয়া ভাষায় রচনা করলেও শেষাংশ বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন। কিছু উদ্ভট ও এলোমেলো ভাবনাবস্তু দিয়ে হেয়ালীপূর্ণ কথায় কাব্য সমাপ্ত করেছেন। লৌকিক ছড়ার আঙ্গিকে তিনি সমাপ্তিসূচক শব্দ '**নমস্কার আশি**' বলে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

এই কাব্যে ব্যবহৃত ওড়িয়া শব্দগুলি এখনও মোহনপুর, দাঁতন, এগরা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই এলাকার মানুষের মৌখিক ভাষায় যে শব্দগুলি উচ্চারিত হয় সেগুলি অনেকাংশ এই কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন — কেহি - কেউ, মানে - বহুজান (সমষ্টিবাচক অর্থে), লুচাই -

লুকিয়ে, হাঁসি - হেসে, কাখোই - কাঁখে নেওয়া, উদা - ভেজা, কলি - কলহ ইত্যাদি।

ছন্দ ঃ

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' কাব্যে কবি ২৯টি পদকে ত্রিপদী ছন্দের মাধ্যমে বিন্যাস করেছেন। সমগ্র কাব্যটিতে ৬+৬+৮ মাত্রা বিশিষ্ট চরণ সজ্জায় ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কবি এক্ষেত্রে ছন্দের কোন বৈচিত্র্যসাধন আনতে চাননি। ৬+৬+৮ মাত্রার পংক্তিবিন্যাসের চিত্রটি এইরূপ—

গোপপুর নারী ব্রজপুর হরি ৬+৬
রঙ্গ করুছন্তি সঙ্গে। ৮

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' -এর ছন্দ নির্মাণে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য এনেছেন কবি। কাব্যটি যেহেতু গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হবে সে কথা মাথায় রেখে কবি ত্রিপদীর শেষে অতিরিক্ত চরণ যোগ করে গায়েনদের ধুয়ো ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন, যেমন —

"বিড়াল মূর্ত্তি ধরিলে শ্রীপতি
রাধাকু কলে মুসিক
কৃষ্ণ মায়া কলে মর্জ্জার হইলে
ঘরকু হেল বাহার
মাতার পাশকু যাই
মাতা তুম্ভে যাই থিল কাঁহি গো।" (২১ সংখ্যক পদ)

ত্রিপদী ছন্দের অতিপর্ব যোগ করে কবি বৈচিত্র্য এনেছেন এইভাবে —

"যশোমতী মাতা কুহন্তি বারতা
(পুত্র) কিপাই কর রোদন।" (পৃষ্ঠা - ৬)

(অথবা)

"সে একা দিনরে যমুনা কুলরে

(ষোল) সহস্র গোপী

শ্রীরাধা কুহন্তি শুন সখি দুতি

(চল) কৃষ্ণ সঙ্গে করি দেখা।" (পৃষ্ঠা - ৩)

অলংকার ঃ

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' কাব্যের মধ্যে কবি শব্দালংকার রূপে অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন বহু ক্ষেত্রে। কাব্যের একটি অংশে **'হ'** ধ্বনির অনুপ্রাস সৃষ্টি করে বৃত্তানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন কবি —

"হিন্দলারে বসি কৃষ্ণ হঁসি হঁসি

কুহন্তি মাতাঙ্কু হরি

মুঁহি তো লম্পট করি থিলি মাত

দেখ হে সত্য ঘটন

মাতা হঁসি উঠিলে।

কবির অলঙ্কার সৃষ্টির বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। অনুপ্রাস ব্যতীত কবি অন্য কোন শব্দালংকার বা অর্থালংকার প্রয়োগের প্রচেষ্টাই করেন নি।

গ্রন্থ ২. রসকেলী, কবি - দ্বিজমুরারি ঃ

ওড়িয়া ভাষার জনৈক কবি দ্বিজ মুরারি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অবলম্বনে **'রসকেলী'** নামে একটি কাব্য রচনা করেছেন। আমাদের সংগ্রহে যে Text বা পাঠটি আছে তা বাংলা হরফে ওড়িয়া ভাষায় প্রণীত। গ্রন্থটি কাঁথির নীহার প্রেস থেকে যতীন্দ্রনাথ জানার মুদ্রণ ও সম্পাদনায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

"(All right reserved)/রসকেলী/(নীহার প্রেসের Logo চিহ্নিত/কাঁথি নীহার প্রেস হইতে/শ্রী যতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা/মুদ্রিত ও প্রকাশিত/—ঃ০ঃ—/সন ১৩৪১ সাল/মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র/মূল্য ৭৫ পয়সা মাত্র।"

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৬খ দ্রষ্টব্য)

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। ১৩.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ১১ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই পুস্তিকা। এতে প্রচ্ছদপত্র (১) মূলগ্রন্থ (১৬) এবং পশ্চাদপত্র (১) সহ মোট ১৮ টি পৃষ্ঠা আছে।

রচনাটি শুরু হয়েছে এই ভাবে — **"প্রথম ছাঁদ/একদিনে স্বর্গে সে ব্রহ্মরাশি। নিশ্চিন্ত হোইন অছই বসি।"**

কাব্য-কাহিনী ঃ

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনার মাধ্যমে কবি এই **'রসকেলী'** কাব্যের কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন। নারদ ও ব্রহ্মার কথোপকথনের মাধ্যমে উঠে এসেছে কৃষ্ণ অবতারের কারণ প্রসঙ্গ। কৃষ্ণের অপার লীলার মাধ্যমে পৃথিবীর পাপ খণ্ডন এবং পাপীদের বিনাশ ও পুণ্যবানের পরিত্রাণ ঘটবে বলে ব্রহ্মা উল্লেখ করেছেন। কাব্যের প্রথম ছাঁদে নারদ ও ব্রহ্মার কথোপকথনের মাধ্যমে কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ছাঁদে কবি দ্বিজমুরারি ভাদ্র পূর্ণিমা অর্থাৎ গুরুপূর্ণিমার একটি মনোরম প্রকৃতির চিত্র উপস্থাপন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের রসকেলী বর্ণনার এক উপযুক্ত পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। শ্রীকৃষ্ণের মায়াজালে গোপপুরবাসী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, জেগে আছে শুধু রাধারানী ও গোপিনীরা। কৃষ্ণের প্রেমে পাগলিনী গোপনারীরা রান্নাবাড়া শেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার আগে তাদের স্মরণে ও স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে শৈশব ও যৌবনসঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের কথা। গোপীদের মনে কৃষ্ণের কালীয়দমন, গোচারণ, শ্রীদাম-সুদামের সাথে খেলাধূলা, ননীচুরি, যমলার্জ্জুন উদ্ধার এইভাবে কত ঘটনা ভীড় করে আসে। অবশ্যই যমুনার কূলে এবং কদম্বের মূলে মনমোহিনী কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনি তাদের কর্ণকূহরে আজো ভেসে আসে। তারা অর্থাৎ গোপনারীরা এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণভাবে বিভোর হয়ে প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জের অভিমুখে রওনা হয়। দ্বিতীয় ছাঁদ কবি দ্বিজমুরারি এইখানে শেষ করেছেন।

তৃতীয় ছাঁদে অর্থাৎ শেষ ছাঁদে যমুনার কূলে শ্রীকৃষ্ণ পুণরায় তাঁর মোহন বাঁশি বাজালে গোপিনীরা কাতর হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন ভাই-ভাজের ভয়কে উপেক্ষা করে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যাবেন। কেউবা বলে বসলেন যমুনার জলে নেমে কৃষ্ণের সাথে জলকেলী

করবেন। আবার কেউ ভেবে বসেন সংগোপনে কৃষ্ণের সাথে মিলিত হবেন এবং ভোর না হতে ফিরে আসবেন। ঠিক অনুরূপ ভাবে রাধার মনেও চিন্তা হয় কীভাবে সে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হবে। ঘরের দুয়ারে শুয়ে আছে স্বামী, শ্বাশুড়ী ও ননদ শুয়ে আছেন ঘরের ভিতরে। এমতাবস্থায় রাধারানী মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করেন। তৎক্ষণাৎ সকল বাধা দূর হয়ে যায়। রাধা দেখে স্বামী নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সধীরে সালঙ্কারা হয়ে গোপিনীদের সাথে কৃষ্ণাভিমুখে অভিসার করেন। সকলে মিলে যমুনার কূলে এসে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ এক্ষনই বাঁশি বাজিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়লেন — এইরকম একটি সংশয় সৃষ্টি হয় রাধা ও গোপীদের মনে। কৃষ্ণ পুণরায় বংশী ধ্বনি করেন গাছের উপর থেকে। গোপীরা বংশীধ্বনি অনুসরণ করে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করে কিছুতেই কৃষ্ণকে চাক্ষুষ করতে পারে না। তারা বলতে থাকে নন্দপুত্র কৃষ্ণ অতিচালাক। তাঁর সাথে পারা যায় না। কোথায় সে লুকোবে। তাঁকে তারা খুঁজে বের করবেনই। তারা কৃষ্ণমিলনে অস্থির হয়ে পড়েন।

তারা সকাতরে বিণীতভাবে কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানায় দেখা দেওয়ার জন্য। গোপীরা বলতে থাকেন যে, কুলশীল পরিত্যাগ করে তারা কৃষ্ণের কাছে এসেছেন। এই অবস্থায় কৃষ্ণ যদি তাদের সহায় না হন তাহলে তাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। নানা রঙ্গে কৃষ্ণ তাদের সাথে কতবার মিলিত হয়েছেন, বিপদের সময় আজ তাদের ছেড়ে চলে যেতে পারলেন কী করে। এই পাপ বৃথা যাবে না, কৃষ্ণ তাদের সাথে দেখা না করলে তাঁকে পাপের ফলভোগ করতে হবে। পুণরায় কদম্বের মূলে বাঁশি বেজে উঠলো। সকলে কদম্বের শাখায় তাকাতেই শ্রীহরিকে তাঁরা দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে সকল গোপী মনের মধ্যে **'কেলী'** করবার কামনা পোষণ করেনি। সহস্র বছর যার জন্য তারা সাধনা করে আসছে আজ তা সফল হতে চলেছে। মুনি-ঋষিগণ যাকে পাওয়ার জন্য ধ্যান করেন সেই পরমাত্মা কৃষ্ণ আজ তাদের সন্নিকটে। সকলে স্বামীত্বে (প্রভুত্বে) কৃষ্ণকে বরণ করে নিতে চান। সকল লজ্জা ছেড়ে গোপীগণ সমেত রাধা কৃষ্ণের সাথে রসক্রীড়ায় নিমগ্ন হলেন। কাব্যের কাহিনী এখানেই শেষ করেন দ্বিজমুরারি।

চরিত্র ঃ

'রসকেলী' কাব্যে চরিত্র-চিত্রণে কবি নতুনত্ব আনতে পারেন নি। কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের

যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে তাদের মাঝে পড়ে রাধা চরিত্রটি নিষ্প্রভ হয়ে থেকেছে। কৃষ্ণ চরিত্রের ছলাকলার মধ্যে এই চরিত্রটির ভগবত মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি। সালঙ্কারা রাধার মধ্যে পরকীয়া গৃহবধূর হাব-ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন কবি। রাধা বলেছেন —

''আসিন শ্রীহরি রখ মো প্রাণ।
ন আসিলে তুম্ভে যিব জীবন।।
স্বামী ঘর ছাড়ি তুম্ভে ধইলে।
কাঁহি তুম্ভে গল কি দোষ কলে।
কুলরু বাহারি যমুনা কূলে।
বাহার হোইছি তুম্ভর মেলে।।'' (পৃষ্ঠা - ১৪)

অর্থাৎ শ্রীরাধা বলে '**শ্রীহরি তুমি এসে মোর প্রাণ রক্ষা করো। তুমি না এলে আমার জীবন চলে যাবে। স্বামীর সংসার ছেড়ে আমি তোমায় ধরলাম। তুমি কোথায় চলে গেলে, আমি কীবা দোষ করলাম। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল ছেড়ে আমি যমুনার কূলে এলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।**'

ভাষা ঃ

কাব্যটি বাংলা হরফে ওড়িয়া ভাষায় রচিত। কবি দ্বিজ মুরারি ওড়িয়া ভাষায় ওড়িয়া হরফে রচিত করলেও পরবর্তী কালে নীহার প্রেস সেই পুথি উদ্ধার করে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তরিত করে পুস্তিকাকারে ওড়িশা প্রান্তবর্তী বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

পুস্তিকাটি শ্রীকৃষ্ণের লীলারস প্রচারধর্মী রচনা। গ্রন্থের শুরুতে ব্রহ্মা এবং নারদের কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, কলিকাল আসন্ন। কেমন করে মানবকুল উদ্ধার পাবে এই প্রশ্ন ব্রহ্মার নিকট নারদ রাখলেন। ব্রহ্মা বললেন একটি উপায় আছে। তিনি গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সময় যে লীলাকার্য সম্পাদন করবেন সেই লীলাকথা ধ্যানস্থ হয়ে যে পড়বে বা শুনবে সেই একমাত্র পাপখণ্ডন করতে পারবে। নারদ এই কথা শুনে লীলাকাহিনী শোনার

জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। লীলারসের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি বললেন—

"ভক্তি শ্রদ্ধারে পড়িব শুনিব।
তেবে যে তুস্তর পাপ খণ্ডিব।।
অশ্রদ্ধা করিব যেবা অধম।
পাপী নাহি মর্ত্তে তাহার সম।।"(পৃষ্ঠা - ৩)

বঙ্গানুবাদ :

শ্রদ্ধা ভক্তিভরে পড়িবে শুনিবে।
তখনি তোমার পাপ খণ্ডিবে।।
অশ্রদ্ধা করিবে অধম যে জন।
এহেন পাপী আছে বা ক'জন।।

কবি দ্বিজমুরারি শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে পৃথিবীতে আসার কারণ রূপে যে তথ্য দিয়েছেন তা পুরাণসিদ্ধ নয়। বিষ্ণুর অবতংশ রূপে শ্রীকৃষ্ণ মর্তে জন্মগ্রহণ করেন। এই কাহিনী বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত। কবি দ্বিজমুরারি ব্রহ্মার অবতার রূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাঠকের নিকট উপস্থাপন করলেন। সুতরাং কৃষ্ণলীলার কবিরূপে দ্বিজমুরারির এ হেন তথ্যের আরোপ কবির পৌরাণিক জ্ঞানের অনভিজ্ঞতাকে মনে করিয়ে দেয়। কবির পুরাণ অভিজ্ঞতার অভাব যথেষ্ট ছিল – এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

'রসকেলী' পুস্তিকাটি ৩টি ছান্দে কৃষ্ণলীলার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ছান্দ অর্থাৎ **'ছাঁদ'**। ছাঁদ কথার অর্থ পদবন্ধ বা পদাংশ। সুতরাং তিনটি পদবন্ধে বা পদাংশে রচিত হয়েছে কৃষ্ণলীলার কাহিনী অংশ। পুস্তিকাটির নাম **'রসকেলী'** হওয়ার কারণ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে এই পুস্তিকাতে। এক্ষেত্রে 'রস' কথার অর্থ রতিরস এবং 'কেলী' কথার অর্থ ক্রিড়া।[১] সুতরাং রসকেলী আসলে রতিরসক্রিড়া। দ্বিতীয় ছাঁদ থেকে কাব্যের মূল কাহিনী শুরু হয়েছে এইরূপ–

"ভাদ্রর মাসর গুরুর দিন।
সে দিন জনের পূর্ণ যৌবন।।

মনরে পাইন অতি আনন্দ।
রসকেলী কলে নিজ গোবিন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণ পাইন জোছনা দিন।
রঙ্গ করি থিলে রাধা সঙ্গেন।। ”(পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ :

ভাদ্রের এক পুণ্য গুরুবারে।
পূর্ণ চন্দ্রিমার যৌবন ঝরে।।
হরষ মনে আনন্দিত প্রাণে।
মজিলা হরি রসে গোপী সনে।।
জোছনালোকে অতিব পুলকে।
রাধা সঙ্গেন রসে গোপ লোকে।।

উদ্ধৃত পদের অংশ বিশেষ থেকে জানা যায় যে ভাদ্র মাসের গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে রসকেলী বা রাসলীলা করলেন। এক্ষেত্রে কবি দ্বিজমুরারি পৌরাণিক অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। শাস্ত্রমতে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা হয়। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা রূপে পরিগণিত হয়না। এছাড়া কবি ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাকে গুরু পূর্ণিমা বললেও পঞ্জিকা মতে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা রূপে মেনে চলা হয়। কবি দ্বিতীয় ছাঁদে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন এইভাবে—

“টোকা কালে সে যে গরু চরাই।
শ্রীদামে সুদামে সঙ্গরে নেই।।
কেতি ক্রীড়া কলে তা মান সঙ্গে।
কেতি রূপ হেলে কেমন্তে রঙ্গে।।
গোপর ননী যে করিলে চুরি।
গোপ গোপী মানে ন ধরি পারি।।
শেষরে কহিলা মতি পাখর।
তুম্ভর পুয়কু জবদ কর।।” (পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদ :

নন্দ বালক যায় গোচারণে
শ্রীদাম সুদাম বন্ধুর সনে।।
লীলা খেলা যত তাদের সঙ্গে।
কতরূপ ধরে বিবিধ রঙ্গে।।
ননীচুরি করে গোপের ঘরে।
গোপ গোপীগণে না ধরি পারে।।
বিবাদ করে যশোদা সমীপে।
গোপীর নালিশে যশোদা কাঁপে।

পূর্ণিমার রাত্রে গোপীরা সুস্বর বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বিচলিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে বংশীধ্বনি অনুধাবন করে গৃহের বাইরে পা বাড়ানোর জন্য আকুল হয়ে পড়ে। শ্রীরাধারও একই অবস্থা। ঘরের দুয়ারে স্বামী শুয়ে আছেন। ঘরের ভিতরে ননদ শ্বাশুড়ি জেগে আছেন। এমতাবস্থায় রাধা কী করবেন ভেবেই পাচ্ছেন না। রাধা হরির নিকট প্রার্থনা করেন এইরূপ–

"হে হরি তুম্ভে যে মোহর সখা।
উপায় নাহি মোর করহ রক্ষা।।
স্বামী শুই অছি ঘর দুয়ারে।
ননদ শ্বাশুড়ি ঘর ভিতরে।।
এতে কহি রাধা হরিঙ্কু ডাকে।
ডাক দেই সে যে মনরে কুপে।।" (পৃষ্ঠা - ৯)

বঙ্গানুবাদ :

হে হরি তুমি যে প্রাণের সখা।
কী করি উপায় করহ রক্ষা।।
নিদ্রা যায় পতি গৃহের দ্বারে।
ননদ শ্বাশুড়ি ভিতর ঘরে।।
কেমনে যাইব জাগিছে লোকে।

লহ লহ মোরে হরিরে ডাকে।।

পরক্ষণে দেখা যায় স্বামী ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। শ্বাশুড়ি ও ননদ নিদ্রিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রাধার সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায়। সন্তর্পণে রাধিকা অভিসারে যাবেন তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সালঙ্কারা হয়ে রাধা কৃষ্ণাভিমুখে অভিসার করবেন। নানাবিধ অলংকারে ভূষিত হচ্ছেন এইরূপ—

"সাজসজ্জা হেলা সবু অলংকারে।
মহল পরিলা বেণি পয়রে।।
হস্তরে নেলা চুড়ি বটফল।
গলারে ঘেনিলা নানাধি মাল।।
আউরি নেলা যে ঝুটিয়া মুদী।
বস্ত্র যে পিন্ধিলা ক্ষিরোদ আদি।।
অন্টারে সে নেলা ঝিঞ্জিরি কেড়া।
মথারে ঘেনিলা মোহনচূড়া।।
বলা বাজুবন্ধ ঘেনিলা করে।
নেপুর ঘেনিলা পদ্ম পয়রে।।
গলারে ঘেনিলা পোহলা ছড়া।
বেণীরে সে দেলা মালতী বেড়া।।" (পৃষ্ঠা - ১০-১১)

বঙ্গানুবাদ :

নানা আভরণে সাজিল সাজে।
ঝুম্ ঝুম্ মল পায়েতে বাজে।।
হস্তে পরিল বটফল চুড়ি।
নানাধি মালিকা সে বক্ষ জুড়ি।।
পায়েতে পরিল ঝুটিয়া মুদি।
বস্ত্রযে পরিল ক্ষিরোদ আদি।।

কটি দেশে নিল ঝিঞ্জিরি কেড়া।

শিরোপরে শোভে মোহনচূড়া।।

বালা বাজুবন্ধ পরিল করে।

চরণ কমলে নূপুর পরে।।

গলায় পরিল পোহলা ছড়া।

বিনুনিতে দিল মালতী বেড়া।।

অভিসারিকা রাধিকা সালঙ্কারা হয়ে অভিসার করছেন— এ দৃশ্য বাংলা বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিরল। কারণ অলংকারের শব্দ অভিসারের সময় প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সৃষ্টি করে। গোবিন্দ দাসের একটি অভিসারের পদে লক্ষ্য করা যায় যে, রাধা অভিসারে যাবেন, পায়ের মঞ্জীর কাপড়ের টুকরোয় জড়িয়ে ফেলেছেন যাতে অভিসারের সময় নূপুরের নিক্কণ না হয়। ওড়িয়া ভাষায় এইরূপ কৃষ্ণলীলা কাব্য '**রসকেলী**'তে তার ভিন্নরূপ দেখতে পাওয়া যায়। সালঙ্কারা রাধিকার যে অলংকার দেখা গেল তা কিন্তু ওড়িশা সন্নিহিত বাঙালি নারীর পরিধেয় অলংকার। সে সবের অস্তিত্ব এখনও লক্ষ্য করা যায়। বটফল চুড়ি, ঝুটিয়া মুদি, ঝিঞ্জিরি কেড়া, মোহনচূড়া, বালা, বাজুবন্ধ এই সমস্ত অলংকার ও তার ব্যবহার এককালে ওড়িশা ও মেদিনীপুরের সমাজ জীবনে বহুল ব্যবহার হতো। দ্বিজমুরারির এই কাব্যে সুন্দর ভাবে তা বর্ণিত হয়েছে।

ছন্দ ঃ

রচনাটি পয়ার ছন্দে লেখা। প্রতিটি চরণে একাদশ অক্ষরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওড়িয়া সাহিত্যে বিশেষ ভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যে '**নবাক্ষরী**' ছন্দের অর্থাৎ নয় অক্ষর বিশিষ্ট চরণের পয়ার ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে এই কাব্যটি এগার অক্ষর বিশিষ্ট চরণের দ্বারা রচিত হয়েছে। ফলে মধ্যম লয় বিশিষ্ট ছন্দের মাধ্যমে কাব্যটি অগ্রসর হয়েছে। এগার অক্ষর বিশিষ্ট চরণ সজ্জার নিদর্শন এইরূপ —

"কেঠারে উঠিলা বংশীর ধ্বনি।

কাঁহি রহি গলা নন্দর ননী।।

নন্দর পুঅ সে অতি চতুর।

কেহ্নে লুচি গলা সে দণ্ডধর।।" (পৃষ্ঠা - ১৩)

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি বৈচিত্র্য আনেন নি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবি একাদশ অক্ষর বিশিষ্ট পয়ার ছন্দে মাঝারি লয়ে কাব্যটি রচনা করেছেন।

অলংকার ঃ

'রসকেলী' কাব্যটিতে কবি অলংকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যত্নশীল প্রয়াস করেন নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে বৃত্তানুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণের মহিমার বিবরণ দিতে গিয়ে গোপীদের কথায় —

"গোপীঙ্ক সহন সহি ন পারি।

কালন্দী কূলরে কালকু মারি।।

কালরে তঁহির হইলা নাশ।

নাশ হোই গলা তাহার বিষ।।

* * * * * * * * * * * * * *

কেতি ক্রীড়া কলে তা মান সঙ্গে।

কেতি রূপ হেলে কেমন্তে রঙ্গে।।" (পৃষ্ঠা - ৬)

উপরোক্ত উদাহরণে **'ক'** ধ্বনির বৃত্তানুপ্রাস সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এই কাব্যটি ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় রচনা। বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা হওয়ার কারণে এবং সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল ওড়িয়া শব্দগুলি বাংলা লিপিতে মুদ্রিত থাকায় বুঝে নিতে অসুবিধে হয়না বাঙালি পাঠকদের। এই সংক্ষিপ্ত আকারের কৃষ্ণলীলার কাব্য পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য থেকেছে আজও। তত্ত্বভারমুক্ত এই সহজ-সরল ভাষায় রচিত কাব্যটি অল্পশিক্ষিত পাঠকগণের কাছে আজও সমাদৃত হয়ে আসছে।

গ্রন্থ ৩. নাবকেলী, কবি - দ্বিজমুরারি ঃ

পূর্বোক্ত কাব্যের কবি দ্বিজমুরারি রচিত অপর একখানি কৃষ্ণলীলাকথার পুস্তিকা নীহার প্রেসের দপ্তর থেকে পাওয়া গেছে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদপত্র না পাওয়ায় (ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে) কাব্যের রচয়িতা, সংস্করণ, মূল্য এবং অন্যান্য তথ্য জানা যায়নি। ১৩.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ১১ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট এই পুস্তিকা। প্রচ্ছদপত্র ব্যতীত এই কাব্যের মূল কাব্যাংশ আছে ২৮ পৃষ্ঠা।

কাব্যটি শুরু হয়েছে এই ভাবে — **"ওঁ চিহ্নের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চিত্র/শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নাবকেলী/ প্রথম কল্প/—ঃ০ঃ—/একদিনে বসি দেবাদিদেব।/সভারে উঠিলা একপ্রস্তাব।।/ কলি আগমনে পাপ করিণ/ কেমন্তে তরিব কহ কারণ।।"**

(পুস্তিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৬গ দ্রষ্টব্য)

কাব্যকাহিনী ঃ

একদিন ব্রহ্মার সভায় একটি প্রস্তাব আসে যে কলির আগমনে পৃথিবীতে যে পাপাচার হবে তা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে কী উপায়ে। এই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ কী হবে ব্রহ্মার কাছে সভামণ্ডলী জানতে চাইলেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণ অবতাবের লীলাকথা পাঠ ও শ্রবণের বিধান দিলেন। কৃষ্ণের লীলাকথা পাঠে বা শ্রবণে পাপ রূপ বিষ থেকে উদ্ধার পাবে। কৃষ্ণের লীলা শ্রবণে পাপের বিনাশ ঘটবে। এরপর ব্রহ্মা সভামণ্ডলীর কাছে নৌকালীলার (নাবকেলী) বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। কবি দ্বিজমুরারি প্রথম থেকে চতুর্থ কল্পের মধ্যে কৃষ্ণের নৌকালীলার বর্ণনা করেছেন। আমরা কাব্যের কাহিনীর মধ্যে দেখতে পাই চতুর কৃষ্ণ ছলে-বলে-কৌশলে শ্রীমতী রাধার সঙ্গ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। **'কেউট'** বা নৌকার মাঝি রূপ ধারণ করে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

পুস্তিকাটি শ্রীকৃষ্ণের লীলারস প্রচারধর্মী রচনা। **'নাবকেলী'** শব্দটির অর্থ নৌকা ক্রীড়া। কৃষ্ণলীলায় নৌকাবিহার বা নৌকালীলার কাহিনী আছে। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নৌকার মাঝি। মথুরার হাটে গোপবধূ রাধিকাকে দধি বেচতে যাওয়ার পথে যমুনা পারাপার হতে হয়। সেই যমুনার ঘাটে নৌকা চালায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে হয়। নৌকায় রাধাকে

নিয়ে কৃষ্ণ মাঝ যমুনায় লীলাকেলী করেন শ্রীরাধার মন পাওয়ার জন্য। এই হল প্রচলিত কাহিনী বা পুরাণ কাহিনী। **'নাবকেলী'** গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের নৌকালীলা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। **'নাবকেলী'** গ্রন্থের কাহিনীবস্তু চারটি কল্প বা কাহিনী অংশে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ওড়িয়া **'কল্প'** শব্দটি বাংলা কল্পন শব্দের সমার্থক। কল্পি + অন = কল্পন। কল্পন শব্দের অর্থ রচনা, নির্মাণ, বিন্যাস ইত্যাদি।[২] সুতরাং কাহিনীর বিন্যাস করতে গিয়ে কবি 'কল্প' শব্দাটির ব্যবহার করেছেন।

প্রথম কল্প শুরু হয়েছে এইরূপ– একদিন দেবসভায় দেবতারা প্রশ্ন করে বসলেন কলি আগমনের ফলে মর্ত্যের মানুষেরা পাপাচারী হয়ে উঠবে। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ কুকর্ম করবে। এমতাবস্থায় নরগণ উদ্ধার পাবে কেমন করে। এই কথা শুনে সহাস্য বদনে ব্রহ্মা দেবকুলকে আস্বস্ত করলেন এইভাবে–

"শ্রীকৃষ্ণ জন্মিব যাই মর্ত্ত্যর।
ভারা নাশিতে সে কলি রাজার।।
তাঙ্কর লীলাযে অতি অপার।
পড়িব শুনিব করি আদর।।
মনকু করিব দৃঢ় ধারণা।
তেবে সে পূরিব মন বাসনা।।" (পৃষ্ঠা - ২-৩)

বঙ্গানুবাদ :

শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবে মর্ত্য ধামেতে।
কলি রাজের পাপ বিমোচিতে।।
কৃষ্ণলীলা যে অতীব মধুর।
শ্রবণে তাহা পাপ হবে দূর।।
দৃঢ় মনে চিন্ত সে লীলামৃত।
চিত্ত বাসনা হইবে পূরিত।।

প্রথম কল্পে একটি দৃশ্যে দেখা যায় গোপিনীগণ দধি মন্থনে রত। দধি মন্থনরত অবস্থায় কৃষ্ণের গুণগান করছেন তারা এইরূপ–

“কে বলে শ্রীকৃষ্ণ করুণানিধি।
মোহিনী বাণরে মনকু বান্ধি।।
কে বলে শ্রীকৃষ্ণ গোকুল রাজা।
নারী মানঙ্কর গরব ভুঞ্জা।।
কে বলে শ্রীকৃষ্ণ জগত সাঁই।
কাহার নহে সে সর্বত্র থাই।।” (পৃষ্ঠা - ৫)

বঙ্গানুবাদ :

কেহ বলে কৃষ্ণ করুণা ধারা।
মোহিনী বাণে মন পড়ে ধরা।।
কেহ বলে সে গোপ দণ্ডধারী।
রমনীকুলে মান ভঞ্জকারী।।
কেবা বলে কৃষ্ণ জগত সাঁই।
কাহার নহে সে সর্বত্রে ঠাঁই।।

প্রথম কল্পের শেষে কবি ভণিতায় নিজেকে হীন কৃষ্ণদাস বলে পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় কল্পে দেখা যায় রাধা গোপিনীদের সঙ্গে মথুরার বাজারে দধি বিক্রি করতে যাওয়ার জন্য পসরা প্রস্তুত করছেন। নানা অলংকারে শোভিতা হয়ে, সুবেশ হয়ে রাধারানী গোপিনী সহযোগে পথে বাহির হলেন। অবশেষে যমুনার তীরে রাধা পৌঁছে গেলেন। স্রোতস্বিনী যমুনা দেখে রাধা এবং সখীগণ হকচকিয়ে গেলেন। কীভাবে যমুনা পার হয়ে ওপারে মথুরার বাজারে যাবেন। যমুনার দিকে তাকাতে হঠাৎ একটি বহমান নৌকা রাধা দেখতে পেলেন। খড়ের দড়ি টেনে ওপার থেকে একজন মাঝি নৌকা ভাসিয়ে এপারে আসছেন। **‘কেউটিয়া গীত’** অর্থাৎ মাঝি মাল্লার গান গাইতে গাইতে ধীর ছন্দে নৌকা বাইতে বাইতে একজন বুড়ো মাঝি এলেন। চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে বুড়োর। তাকে দেখলে হাসি পায়। দুটি চোখে পিচুটি পড়েছে। চোখ দুটিতে বঙ্কিম চাহনি। ডান পা খানি ফোলা এবং মোটা। বুকের পাঁজর গোণা যাচ্ছে। পায়ের গোড়ালি ফেটে গেছে। দন্তহীন মাড়ি দেখিয়ে ফোকলা হাসি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে রাধার চোখে। কথা বলতে গেলে জড়তা আসছে।

তার হাসিতে প্রপঞ্চনা বা শয়তানি ফুটে উঠছে। তাকে দেখে সকল গোপিনী এগিয়ে আসে এবং নৌকাটি তীরে ঠেকানোর জন্য অনুরোধ করে। উচিত কড়ি পারানি সরূপ প্রদান করবে বলে মাঝিকে লোভ দেখায়। দধি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। অবিলম্বে বাজারে নিয়ে যেতে না পারলে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং অধিক কড়ি দিয়ে যমুনা পার হতে তাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বুড়ো মাঝি কিছুতেই টাকায় ভুলতে চায়না। গোপিনীগণ মাঝিকে গালমন্দ ও শাপশাপান্ত করতে থাকে। যেন মাঝির নৌকা ডুবে যায়, মাঝিকে যেন সাপে খায় নতুবা খড়ের দড়ি কেটে নৌকাডুবি হয় এবং মাঝিকে যেন কুমীরে টেনে নিয়ে যায় -এইভাবে অভিশাপ দিতে থাকে। তখন বুড়ো মাঝি বিরক্ত হয়ে বলতে থাকে–

“এ নাব করিছি মীন মারিতে।
পারে ন যাইবি কহুছি তোতে ।।
বেতন দেইন রাখিছ মোতে।
কি পাঁই করুছ রাগ যে এতে।।” (পৃষ্ঠা - ১২)

বঙ্গানুবাদ :

এ নৌকা করেছি মাছ ধরতে।
পারাপার কভু না করি এতে।।
বেতন দিয়ে কি রেখেছ মোরে?
রাগ অভিমান কিসের তরে?

উপযুক্ত কড়ি দেওয়ার কথা গোপিনীরা বললে তখন বুড়ো মাঝি (শ্রীকৃষ্ণ) সম্মত হলেন। গোপিনীরা এক সঙ্গে নৌকায় উঠতে চাইলে চতুর মাঝি বাধা দেয়। মাঝি বলে একসঙ্গে অনেকজন নৌকায় উঠলে নৌকা ডুবে যাবে। সুতরাং এক এক জন করে পারাপার করতে হবে। প্রথমে শ্রীরাধা নৌকায় উঠতে চায়। কারণ নন্দের ব্যাটা কৃষ্ণ পথে রাধার পিছু ধাওয়া করেছিল। যমুনার ঘাটে অধিক বিলম্ব করলে পাছে কৃষ্ণ কাছে এসে পড়ে। সুতরাং তার আগে যমুনা পেরিয়ে গেলে কৃষ্ণ আর রাধার নাগাল পাবেনা। রাধার মনে এক সন্দেহ হয় এই যে কৃষ্ণ হয়তো নৌকার মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে। তখন চন্দ্রাবলীকে রাধা বলে নৌকাটি ভালো করে দেখে নিতে। চন্দ্রাবলী বলে যে নৌকার মধ্যে মাঝি ব্যতীত আর কেউ নেই। রাধা চন্দ্রাবলীর কথায় আস্বস্ত হয়ে চন্দ্রাবলীকে সঙ্গে

নিয়ে নৌকায় ওঠে। এই অংশে রাধা বলেন—

"সে মোর ভনজা মু তার মাই।
তা সঙ্গে মো সঙ্গে পটই নাই।।
বাটরে দেখিলে করই রঙ্গ।
ভণ্ড কথা কহি মিশে মো সঙ্গ।।
কেমন্তে কিক্ষণে জাত হোউছি।
মাই মাউসি তো ন মানে কিছি।।" ((পৃষ্ঠা - ১৩)

বঙ্গানুবাদ :

আমি যে মামী সে মোর ভাগিনা।
হেন দুর্মতি কেন যে জানিনা।।
পথে সে দেখিলে করিবে রঙ্গ।
ছল কৌশলে লইবে সঙ্গ।।
কি যে কুক্ষণে লয়েছে জনম।
মামি মাসির হরিছে সম্ভ্রম।।

এই ভাবে দ্বিতীয় কল্পের সমাপ্তি হয়েছে।

তৃতীয় কল্পের শুরুতে দেখা যায় রাধা নৌকায় গিয়ে বসে। কটাক্ষ চাহনিতে মাঝিকে তাকায়। ধীরে ধীরে নৌকা মাঝ নদীতে পৌঁছালে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় সারা প্রকৃতি কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়। রাধিকা কুয়াশায় মাঝিকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। রাধিকা এবং চন্দ্রাবলী ভাবতে থাকেন যে, বুড়ো মাঝিকে হয়তো কুমীরে খেয়েছে নতুবা বৃদ্ধ পা পিছলে হয়তো নদীতে পড়ে গেছে। রাধিকা কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন যে, বুড়ো মাঝি নিজে মরলো এবং আমাদেরকেও মেরে ফেলল। শ্রীরাধা আবার ভাবতে থাকে বুড়ো মাঝি আসলে অনন্তরূপী শ্রীকৃষ্ণ নয়তো? দেখতে দেখতে নৌকায় জল ঢুকতে শুরু করে। নৌকার সংযোগকারী দড়ি ছিঁড়ে গেছে। এমতাবস্থায় শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই। কুয়াশাচ্ছন্ন নৌকার অভ্যন্তরে বুড়ো

মাঝিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ মাঝির গলায় কেউ যেন বলছে যে, নৌকার ওজন বেড়ে যাওয়ায় এ হেন বিপত্তি। শ্রীরাধার গয়নাগাঁটি নৌকার ভার বাড়িয়ে তুলছে। মাঝি শ্রীরাধাকে বলেন যে, শরীর থেকে গয়না খুলে ফেলতে। গয়না খুলে নদীতে নিক্ষেপ করতে বলে। রাধা বলে গয়নাগাঁটিগুলি নদীতে ফেলে লাভ নেই। বৃদ্ধ মাঝিকে বলে যে, এই গয়নাগুলি যথা নুপুর ও কঙ্কন কেড়ে মাঝিকে দিয়ে দেন এবং তার দ্বারা দুঃখের দিন অতিবাহিত করতে বলেন। বিনিময়ে শ্রীরাধার প্রাণ বাঁচানোর জন্য আকুল আর্জি জানান। মাঝি বলেন রাধার জীবন বাঁচানোর তার কোন ক্ষমতা নেই। অবশেষে রাধাকে বলেন যে, তার অঙ্গের বস্ত্রের ভার নৌকা সইতে পারছে না। সুতরাং রাধাকে বিবস্ত্র হতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ হেন অবস্থায় রাধা কিছুতেই তা করতে রাজি নন। মাঝি অবশেষে বলে যে, কী কারণে এ সকল গয়না তাকে দেওয়া হল। এই সকল বস্তুতে তার কোন মোহ নেই। মাঝি রাধাকে বলে ইচ্ছে মতো রাধাকে তার সাথে কৌতুক করতে। ফলে মনের সুখে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারবে। বুড়ো মাঝির এহেন কুপ্রস্তাব শুনে রাধার প্রাণ উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। দ্বিজমুরারি তৃতীয় কল্পের শেষে ভণিতায় নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করে কল্পের শেষ করেন।

চতুর্থ কল্পের শুরুতে দেখা গেছে যে, মাঝির কাছে অলংকার রেখে পণ করে বসে আছে রাধিকা। তখন মাঝি (শ্রীকৃষ্ণ) বললেন —

"শ্রীকৃষ্ণ বোইলে শুন যুবতী।
তো সনে মোহর অনেক প্রীতি।।
কেউট বলিন পাউ তু লাজ।
নন্দ পুত্র আম্ভে দেবাধিরাজ।।
রাধিকা বোইলে শ্রীকৃষ্ণ নোহু।
মোতে মায়া করি এমন্ত কহু।।" (পৃষ্ঠা - ২১)

বঙ্গানুবাদ :

কহিল শ্রীপতি শুন যুবতী।
তব প্রতি মোর অনেক প্রীতি।।
হেন পেশা দেখি পাইছ লাজ।
নন্দ সুত মই দেবাধিরাজ।।

রাধা কহে তুমি নহে শ্রীহরি।

ছলিছ মোরে মায়া রূপ ধরি।।

রাধা বলতে থাকেন, '**শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বেশ হতে পারে না। কোথায় তার সেই মুরলীধারী রূপ? কাঠফাটা রোদ পিঠে নিয়ে তুমি নৌকা বাইছো। পরিশ্রম করতে করতে তোমার চোখ দুটি বাঁকা হয়ে গেছে। এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে রেখেছো। একটা পা মোটা গোদা হয়ে গেছে। একটাও দাঁত অবশিষ্ট নেই। খালি চোয়ালে ফোকলা হাসি হাসছো। কোমর বেঁকে গেছে। হাঁটতে পারছো না। তুমি আমাকে কৃষ্ণ পরিচয় দিয়ে ভাঁড়ামো করছো।**' রাধা মাঝিকে বলেন—

"গোপী বিনে তোর ন রুচে জল।

তো দেহে কাঁহি সে কানাই বল।।

তুহি যদি কৃষ্ণ নন্দর পুঅ।

সুন্দর বদন প্রকাশ হুঅ।।

আন্তর শ্রীকৃষ্ণ মোহন রূপ।

গোপী মানঙ্কর অমিয় কূপ।।" (পৃষ্ঠা - ২৩)

বঙ্গানুবাদ :

গোপী বিনে মুখে রোচেনা জল।

তব দেহে কোথা কানুর বল।।

যদি তুমি কানু নন্দের সুত।

সে চাঁদ বদনে হও দরশিত।।

মোদের কানাই মোহন বঁধু।

গোপিনীগণের অমিয়া সিঁধু।।

এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আস্বস্ত করতে থাকেন এই ভাবে— '**আমি কানু তুমি রাই। আমি মামা ও মামিমার শপথ করে বলছি এটাই সত্য কথা।**' তাতেও রাধা আস্বস্ত হতে পারেনি।

অবশেষে মাঝি রূপ ধরলেন এইরূপ—

"এতেক রাধাকু কানু কহিলে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা মুরতি হেলে।।
অধরে মুরলী চূড়ায় শোভা।
কপোলে দিশই তিলক আভা।।" (পৃষ্ঠা - ২৪)

বঙ্গানুবাদ :

পরক্ষণে কৃষ্ণ রাধারে বলি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ধরে বনমালী।।
অধরে মুরলী চূড়ায় শোভা।
ললাটে শোভিত তিলক আভা।।

অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ ধারণ করেন। পরক্ষণে রাধা বলেন চতুর্ভূজ রূপধারী বিষ্ণুরূপে প্রদর্শিত হতে। কৃষ্ণ চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপে দর্শন দিলেন। আবার পরক্ষণে বালক কানাইতে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরাধার কোলে ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কানাইর আবদার রক্ষা করে রাধা কৃষ্ণকে কোলে তুলে যমুনা তীরে বিপিন বৃন্দাবনে অদৃশ্য হলেন। পরে অন্যান্য গোপীগণকে কৃষ্ণ যমুনা পার করিয়ে দিলেন। গোপীগণ মথুরার বাজারে দধি-দুধের পসরা নিয়ে বিক্রয়ার্থে চললেন। **'নাবকেলী'**র শেষাংশে এই গ্রন্থের পাঠ ও শ্রবণের ফলাফল সম্পর্কে কবি বললেন এইভাবে—

"এবে নাবকেলী হোইলা শেষ।
রাধাকৃষ্ণ কথা অতি সন্তোষ।।
যে জন পড়ই যে জন শুনে।
তা দেহে পাপযে ন লাগে ক্ষণে।।" (পৃষ্ঠা - ২৬)

বঙ্গানুবাদ :

এই ক্ষণে নাবকেলী হইলা শেষ।
লীলাময় কৃষ্ণের মহিমা অশেষ।।

যেজন শোনে এ লীলামৃতসিন্ধু।
না পরশে দেহে তার পাপের বিন্দু।।

ছন্দ ঃ

'নাবকেলী' কাব্যটি আগাগোড়া পয়ার ছন্দে লেখা। এগার অক্ষর নিয়ে লেখা চরণ, পূর্বে আলেচিত দ্বিজ মুরারির **'রসকেলী'** কাব্যের ছন্দ যেমন একাদশ অক্ষর বিশিষ্ট পয়ার অনুরূপ **'নাবকেলী'** কাব্যের মধ্যে একই রীতি মেনে চলেছেন কবি। উভয় কাব্যের কাহিনী ও গঠনগত সাজুয্য এতটা যে সাধারণভাবে একই কাব্যের দুটি কাব্যাংশ বলে মনে হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তিকায় কাব্য দু'খানি মুদ্রিত বলে দুটি ভিন্ন কাব্য রূপে ধরে নেওয়া হয়েছে। দ্বিজমুরারি রচিত কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায়নি। নীহার প্রেসের সংগৃহীত পুথিপত্রের মধ্যে **'রসকেলী'** এবং **'নাবকেলী'** শীর্ষক কোন পুথির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। অবশ্যই এককালে নীহার প্রেস ওড়িশা কবিদের রচিত পুথিগুলি সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করে। সুতরাং দ্বিজমুরারির পুথি তাদের কাছে এককালে সংগৃহীত থাকলেও অযত্নে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। মধ্যযুগের ওড়িয়া কবিদের তালিকায় **'রসকেলী'** বা **'নাবকেলী'** শীর্ষক রচনার রচয়িতা রূপে বেশ কয়েকজন কবির নামোল্লেখ থাকলেও দ্বিজমুরারি নামে কবির নামোল্লেখ নেই।

অলংকার ঃ

এই কাব্যে কবি অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রযত্ন অবলম্বন করেন নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর লেখনিতে সুবোধ্য ও সহজ-সরল কাব্যভাষা এসেছে। তার মধ্যে দুয়েক ক্ষেত্রে অনুপ্রাস অলংকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে পড়েছে। **'ক'** বর্গের ধ্বনি বিন্যাসে কবি শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি করেছেন এইভাবে —

মুখরু ঘঙ্গ যে খুল গো রাই।
হরষে কথা যে কহ গো সই।। (পৃষ্ঠা - ২৪)

কবি এই দুটি চরণে **'ক'** বর্গের পাঁচটি ধ্বনি যথা — **'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ'** ও **'ঙ'** ধ্বনির সজ্জার দ্বারা একটি ধ্বনিমাধূর্য্যের সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার অনায়াসে কবির লেখনীতে চলে

এসেছে।

এই কাব্যটির বিষয়বস্তু কৃষ্ণের নৌকালীলা নির্ভর হওয়ায় সাধারণ পাঠকের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে আছে। সংক্ষিপ্ত রূপে কৃষ্ণের নৌকালীলা এবং গোপীগণের সহিত রাধিকার যমুনা বিহারের মতো চমকপ্রদ ঘটনা বিন্যাসে কাব্যটি লোকমানসে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। কৃষ্ণের কৌশলে শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মতো কামকৌতুককলার দৃশ্য স্থূলরুচির সম্পন্ন স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের কৌতুহলকে জাগিয়ে তুলেছে। শ্রীকৃষ্ণের মনস্তত্ত্বের যে কামনার ছবি আমরা দেখতে পাই তা পৌরাণিক মহিমাকে অনেকটা ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সব ত্রুটীবিচ্যুতিকে স্বীকার করে দ্বিজ মুরারি বলেন যে, প্রতিবেশী কবির প্রতি পাঠক যেন ক্ষমা করে দেন —

"নাবকেলী কথা হোইল শেষ।
তুম্ভ প্রতিবাসী ন ধর দোষ।।" (পৃষ্ঠা - ২৮)

গ্রন্থ ৪. চোরকেলী, গায়ক ও প্রকাশক - ভুবনমোহন জানা ঃ

কবি পরিচিতি ব্যতীত একখানি কৃষ্ণলীলাধর্মী কাব্য '**চোরকেলী**'। এই পুস্তিকাটি এক অনবদ্য রচনা। এই কাব্যের প্রচ্ছদপত্রে সংগ্রাহক, গায়ক ও প্রকাশকরূপে ভুবনমোহন জানা নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতার নাম মুদ্রিত। গবেষকের সংগ্রহে যে Text বা পাঠটি আছে তার ভাষা ওড়িয়া এবং বাংলা লিপিতে মুদ্রিত। পুস্তিকাটি এগরা থানার ভবানীচকের পূর্ণিমা প্রিন্টার্স থেকে ভুবনমোহন জানার প্রকাশনায় ১৪০৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রের বিবরণ নিম্নরূপ —

"চোরকেলী/'ওঁ' চিহ্নের মধ্যে স্থিত পদ্মে দণ্ডায়মান রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি/*সংগ্রাহক, গায়ক ও প্রকাশক*/শ্রীভুবনমোহন জানা/সাং - নস্করপুর ঃ পোঃ- আটবাটী/ জেলা - মেদিনীপুর/সন - ১৪০৩ সাল/মূল্য - ১.৫০ টাকা/মুদ্রণে - পূর্ণিমা প্রিন্টার্স* ভবানীচক।"

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৬ঘ দ্রষ্টব্য)

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। পুস্তিকাটি ১৬.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ৮.৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট। এতে প্রচ্ছদপত্র (১), পশ্চাদ পত্র (১), মূল কাব্যাংশ (১০) সহ মোট ১২টি পৃষ্ঠা আছে।

রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে — "**হে শুন সুজন সুমন দেই। মন কিস কলা নন্দ কানাই।।**"

কবি-পরিচিতি ঃ

'**চোরকেলী**' পুস্তিকাটি এগরা থানার ভবানীচকের পূর্ণিমা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। কাব্যের বিষয়বস্তু, ছন্দ, গ্রন্থনরীতি এবং কাব্যকলা ইত্যাদি দেখে সহজে অনুমান হয় রচনাটি দ্বিজমুরারির। কিন্তু কাব্যটির মুদ্রণ ও সম্পাদনার কাজ করেছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত নস্করপুর গ্রামনিবাসী ভুবনমোহন জানা। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে সম্পাদক নিজেকে কাব্যকথার সংগ্রাহক রূপে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং এই কাব্যের কবি অন্য কোন ব্যক্তি। ভুবনমোহন জানা তাঁর স্মৃতি থেকে কিংবা কোন প্রাপ্ত পুথি থেকে মুদ্রিত করতে পারেন। অথবা ওড়িয়া হরফের মুদ্রিত পুস্তক থেকে বাংলা হরফে লিপ্যন্তর করে থাকতে পারেন। পুস্তিকাটির রচনাংশে কোথাও কবি পরিচিতির উল্লেখ নেই। কাহিনীর মুখবন্ধ, বন্দনা বা ভণিতা এই পুস্তিকায় লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র মূল কাহিনী বা আখ্যান অংশ পুস্তিকাটিতে স্থান পেয়েছে। সুতরাং এই কাব্যের কবি পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত বা অনুল্লিখিত। একাদশ অক্ষরে চরণ বিন্যাস এবং লঘুরসের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের লীলারস পরিবেশন রীতি লক্ষ্য করলে পূর্ব আলোচিত দ্বিজমুরারিকৃত '**নাবকেলী**' বা '**রসকেলী**' কাব্যের সমধর্মী বলা যেতে পারে। এছাড়া কাব্যে নামকরণের ক্ষেত্রে দ্বিজমুরারিকৃত কাব্যনামের সমধর্মী। নামকরণের ক্ষেত্রে '**কেলী**' শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। '**কেলী**' শব্দটি ক্রীড়া অর্থে কবি ব্যবহার করেছেন। দ্বিজমুরারি রচিত অধিকাংশ কৃষ্ণলীলা কাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রে '**কেলী**' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নীহার প্রেসে এককালে '**চোরকেলী**' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হতে পারে। বা পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো পুস্তক বিক্রেতা ভুবনমোহন জানা বহুল জনপ্রিয় এই পুস্তিকাটির কবি পরিচিতি বাদ দিয়ে নিজ দায়িত্বে ও সম্পাদনায় নিতান্ত বাণিজ্যিক স্বার্থে নতুন করে পুনর্মুদ্রণ করতে পারেন। পুনর্মুদ্রণ নীহার প্রেস করেনি, অখ্যাত একটি প্রেস অর্থাৎ পূর্ণিমা প্রেস কাজটি করেছে। নীহার প্রেসের মধুসূদন জানা বা তার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রনাথ জানা সম্পাদনার কাজটি করে থাকলে কবি পরিচিতি অবশ্যই প্রদান করতেন। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের

সম্পাদনা কার্যে এইরূপ দায়িত্বশীলতার চিহ্ন পাওয়া গেছে।

কাব্য কাহিনী ঃ

আমরা এই কাব্যটির বিষয়বস্তু এবং কাব্যশৈলীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হবো। **‘চোরকেলী’** কাব্যের শুরুতে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ চোর সেজে আয়ানের ঘরে উপস্থিত হয়ে মায়াবলে নিদ্রিত রাধিকার সমস্ত অঙ্গভূষণ চুরি করবেন এবং জটিলার হাতে ধরা পড়ে প্রহৃত হবেন। গ্রামবাসীদের সামনে কৃষ্ণকে চোর বলে প্রমাণিত করতে চাইবেন জটিলা। কিন্তু ছলনাময় কৃষ্ণ মায়াবলে পুনরায় শ্রীরাধার অঙ্গে অলংকার সংস্থাপন করে নিজেকে নির্দোষ রূপেপ্রমাণ করবেন গ্রামবাসীর সমক্ষে। কৃষ্ণের অহেতুক সম্মানহানি করার জন্য জটিলাকে গ্রামের লোকেরা ধীক্কার জানান। এইরূপ সংক্ষিপ্ত কাহিনী কাব্যটিতে লক্ষ্য করা যায়। কাব্য-কাহিনীতে গ্রাম্য প্রকৃতির রূপ ধরা পড়েছে। কৃষ্ণ চরিত্র নির্মাণে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম্য যুবক কাহ্নের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু **‘চোরকেলী’**র কৃষ্ণের মধ্যে লাম্পট্য বিন্দুমাত্রই নেই। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্যমণ্ডিত রূপই এক্ষেত্রে প্রকট হয়েছে।

কাহিনীবস্তুতে দেখা যায় কৃষ্ণ চোর সেজে রাধার গৃহে পৌঁছলেন। তারপর—

“গোবিন্দ বোইলে ওগো রাধিকা।
পালঙ্ক উপরে শুইছ একা।।
কর প্রদানিলে শ্রীরাধা অঙ্গ।
তেবে রাধা নিদ্রা ন হেলা ভঙ্গ।।
নাকরু নথ যে কাড়িলা খর।
চেতনা নোহিলা রাধা অঙ্গর।।” (পৃষ্ঠা - ২)

বঙ্গানুবাদ :

গোবিন্দ বলিলে ওগো রাধিকা।
পালঙ্ক উপরে শুয়েছো একা।।
হেন বলি কর স্থাপিলা অঙ্গে।
ঘুমঘোর হতে রাধা না জাগে।।

নাসা হতে নথ হরিলে হরি।

তবু অচেতন রাধা সুন্দরী।।

এরপর কৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে রাধার গলা থেকে মুক্তোমালা, কণ্ঠ থেকে কণ্ঠমালা, অঙ্গ থেকে অঙ্গরত্ন, হাত থেকে সোনার কঙ্কন এবং সুবর্ণ চুড়ি, চরণ থেকে রত্নের পাহুড়ি বা তোড়া, বাহু থেকে বাজুবন্ধ, কান থেকে কর্ণভূষা, অঙ্গুলি থেকে অঙ্গুরীয়, খোঁপা থেকে কেশবন্ধনী, গলা থেকে মোহনমালা, কটীদেশ থেকে সোনার ঝিঞ্জির একে একে চুরি করে নিয়ে অঙ্গকে অলংকারশূন্য করে পালঙ্কের সঙ্গে রাধাকে বন্ধন রে কৃষ্ণ তার শিয়রে বসে আছেন। এমতাবস্থায় জটিলা দেখতে পেলেন আবছা অন্ধকারে অচেনা এক যুবা পুরুষ পুত্রবধূর শিয়রে বসে আছেন। জটিলা গৃহের চৌকাঠে বসে পাহারা দিতে থাকে। কৃষ্ণ গৃহের কোণে লুকিয়ে থাকলেন। জটিলা কৃষ্ণকে ধাওয়া করলে কৃষ্ণ সেখান থেকে পালিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পালঙ্কের নিচে লুকিয়ে থাকলেন। জটিলা পালঙ্কের নীচে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন কৃষ্ণ সেখানে লুকিয়ে আছেন। বেগতিক দেখে কৃষ্ণ সেখান থেকে পালিয়ে ঘুঁটে মাচার উপর উঠে শুয়ে পড়লেন। ননদিনী হাতে ছড়ি নিয়ে ধাওয়া করলেন। নন্দপুত্রকে হাতে পেয়ে উপর্যুপরি প্রহার করতে থাকলেন কুটিলা। গোবিন্দের অঙ্গ এই প্রহারে বিন্দুমাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হলনা। জটিলা বধূ রাধিকাকে ডাকতে থাকে। রাধা বিরক্তভাবে শয্যাত্যাগ করে শ্বাশুড়ির সামনে এলে জটিলা বলতে থাকে যে, তোমার অঙ্গ থেকে সমস্ত অলংকার চুরি হয়ে গেছে। ইতস্তত হয়ে রাধা নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে অলংকারশূন্য অঙ্গ দেখে হতবাক হলেন। রাধা ভুল বুঝলেন শ্বাশুড়িকে। রাধা বললেন—

"থালা কঁসা সবু অছি মোহর।

অলঙ্কার পাঁই অইলা চোর।।

ন জানি বুড়ি কি খসাই নেলে।

চোর নেলা বলি মিছ কহিলে।। " (পৃষ্ঠা - ৫)

বঙ্গানুবাদ :

বাসন কোসন সকলি আছে।

কেবলি গহনা চুরি গিয়াছে।।
ভাবি নাহি পারি কিবা এ চোর।
ঘনিয়াছে মনে বিষম ঘোর।।
অঙ্গের ভূষণ লইয়া কাড়ি।
ছলনা চাতুরী করিছে বুড়ি।।

বৌমার এইরূপ কথা শুনে বুড়ি জটিলা রাধাকে শাপশাপান্ত করতে লাগলেন। রাধা শ্বাশুড়িকে বললেন তার গয়নাগুলি ফিরিয়ে দিতে। উপায়ান্তর না দেখে জটিলা গ্রামের লোকেদের ডেকে এনে সমস্ত বিষয় বোঝাতে চাইলেন এবং ঘুঁটের মাচা থেকে কৃষ্ণকে টেনে বের করে দেখাতে চাইলেন। মায়ারূপী কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মায়ারূপ ধারণ করলেন এইভাবে—

"বুড়ি বলে মুণ্ড কাটিবি তোর।।
কার পুঅ তুরে কেঁউ দেশে ঘর।
কেঁউ জাতি তুরে সিন্দুয়া চোর।।
বউ অলংকার নেলু তু যেতে।
মিছ মিছ দোষ দেউছি মোতে।।
কঁহু কঁহু কৃষ্ণ কলে যে মায়া।
বিস্তার কলে সে আপন কায়া।।
যেঁউ হস্ত ধরি থিলা জটীলা।।
সেই হস্ত মোটা হোইন গলা।।
ধরিন পারিলা জটিলা তা হস্ত।
তঁহু পলাইলে সে গোপীনাথ।।" (পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদ :

বুড়ি বলে মুণ্ড হানিবি তোর।
কেবা তোর পিতা কোথা বা ঘর।
জাতিতে কে তুই সিঁদেল চোর।।
বধূর গহনা লয়েছিস শুধু।

বিনা দোষে মোরে দুষিছে বধূ।।

পলকে শ্রীহরি মায়া বিস্তারি।

প্রকাশিল রূপ নিজ মুরারি।।

জটিলা ধরিল চোরের হস্ত।

পলকে সে হস্ত হইল মস্ত।।

না ধরি পারিল গহনা চোরে।

ধাইলা সহসা রাধার ঘরে।।

পরক্ষণে কৃষ্ণ রাধার শয়নকক্ষে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। জটিলা সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা বাহির থেকে শিকল দিয়ে দেন। কলসী-কলসী জল ঢেলে সারাটা উঠোন এবং গৃহের দ্বার পিচ্ছিল করে দেন জটিলা। এই কৌশল শুধুমাত্র কৃষ্ণকে ধরবার জন্য। জটিলা ছড়ি আনতে যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করার জন্য। ফিরে এসে দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণ রাধার কক্ষ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। জটিলা কৃষ্ণকে ধরবার জন্যে পিছু ধাওয়া করেন। ফল হল না। ফলস্বরূপ জটিলা পা পিছলে পড়লো কর্দমাক্ত আঙিনায়। কবি কৌতুকপূর্ণভাবে জটীলার এহেন দুর্গতির বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপ—

"বুড়ি যে গোড়াই থিলা পছর।

গোড় হড়কি পড়িলা কাদর।।

রজনী কালরে হোইলা ডঙ্কা।

বুড়ি কঙ্কালিরে লাগিলা রকা।।" (পৃষ্ঠা - ৭)

বঙ্গানুবাদ :

কালার পিছনে ধায় জটীলা।

আনমনা পায়ে পিছলি পড়িলা।।

আঁধার উঠোনে পড়িলা সজোরে।

লাগিলা আঘাত বক্ষ পাঁজরে।।

এরপর কোন প্রকার জটিলা উঠে দাঁড়ায়। তারপর কৃষ্ণকে ধরার জন্য আর একটি বুদ্ধি ফাঁদলেন। ঘরময় তুষের আগুন জ্বালিয়ে ধুঁয়ো লাগালেন। যাতে কৃষ্ণ দিগ্-ভ্রান্ত তথা দিশাহারা হয়ে পড়ে

এবং জটিলা সহজে ধরতে পারে। কিন্তু বিপরীত ফল ফললো – ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে জটিলা আটকে পড়ে কাশতে কাশতে হাঁপাতে থাকলেন এবং দিশাহারা হয়ে পড়লেন। এইসব কিছু অলৌকিক ঘটনা মায়াময় কৃষ্ণ ঘটালেন।

এরপর অর্থাৎ কাব্যের শেষাংশে রাধা ও কৃষ্ণের একান্ত আলাপচারিতার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে যে, সে রাধার অলংকার হরণ করেছেন। কারণ রাধাকে সে একান্তরূপে ভালোবাসে। শ্বাশুড়ি জটিলার এ হেন আচরণের জন্য সে অসন্তুষ্ট। ফলে জটিলাকে এরূপে লাঞ্ছনা সইতে হল। কাব্যের শেষে লীলাময় কৃষ্ণ রাধাকে শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর শয়ন করতে বললেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করতে বললেন। রাধিকা নন্দপুত্রের কথা অনুযায়ী তাই করলেন। দেখতে দেখতে রাধিকার অঙ্গে অলংকারসমূহ পুনরায় সংস্থাপিত হল।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র **'হারখণ্ড'** অংশে অলংকার চুরির প্রসঙ্গের সঙ্গে **'চোরকেলী'** কাব্যের কাহিনীর পার্থক্য রয়েছে। **'হারখণ্ড'** -এ যমুনার পথে রাধার হার চুরি করেছেন কৃষ্ণ। আইহনের কাছে বড়াই রাধার হার চুরি যাওয়ার প্রসঙ্গ জানিয়েছে। রাধা কৃষ্ণের নামে যশোদার কাছে অভিযোগ করলে কৃষ্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। **'চোরকেলী'** কাব্যে রাধার শয়নকক্ষে কৃষ্ণের আগমন ও অলংকার চুরির প্রসঙ্গ এবং অলৌকিক মহিমার দ্বারা জটিলাকে যৎপরনাস্তি হেনস্তার বিবরণ কবির নিজস্ব ভাবনা থেকে এসেছে। রাধার প্রতি জটিলার অনুশাসন নতুন ঘটনা নয়, কিন্তু পুত্র আইহনের কানভারী করার স্বভাব এই কাব্যে জটীলার মধ্যে লক্ষ্য করিনা। কুটীলা ও আইহন চরিত্র দুটি সক্রিয় ভূমিকায় নেই। কবি গ্রামের লোকসাধারণের চরিত্রটি উপস্থাপন করে কৃষ্ণের অলৌকিক মহিমাকে প্রমান করতে চেয়েছেন কবি। পুত্রবধূর শয্যায় কৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষ্য করে এবং রাধার অলংকার চুরির ঘটনা গ্রামবাসীকে জানানোর উদ্দেশ্যে জটিলার গণজমায়েত করার দৃশ্য কবির অভিনব ভাবনার পরিচয় দেয়। হরিবংশ পুরাণ, ভাগবত, বৈষ্ণব পদাবলী বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জটিলা চরিত্রের মধ্যে পুত্রবধূ রাধিকার কলঙ্ক গোপন করার চেষ্টা দেখা গেছে। এই কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জটিলার চেষ্টা কৃষ্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন তাঁর অলৌকিক মহিমার দ্বারা। ফলে গ্রামবাসীর মুখ থেকে সেদিন জটিলাকে বহু নিন্দাবাদ শুনতে হয়েছে।

স্বল্প চরণের মাধ্যমে একটি দীর্ঘায়ত কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার অপূর্ব দক্ষতা কবির মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ১১ অক্ষরের কঠিন পরিমাপকে মেনে চলে চরণ বিন্যাসের যে দক্ষতা কবি দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। সহজ-সরল ওড়িয়া শব্দের বিন্যাসে কবি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি। গলারু = গলা থেকে, কমরু = কোমর থেকে, আঁঠু = হাঁটু, ঘসি মচা = ঘুঁটে মাচা, কঁসা = কাঁসার বাসন, হড়কি = পিছলে পড়া এইরকম অসংখ্য শব্দ এবং ক্রিয়ারূপ আছে যা মেদিনীপুর অঞ্চলের কথ্যভাষায় ব্যবহার হয়ে আসছে।

ছন্দ ঃ

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে '**চোরকেলী**' কাব্যের কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়না। পূর্বালোচিত '**নাবকেলী**' বা '**রসকেলী**' কাব্যের মতো এক্ষেত্রে কবি এগার বর্ণ বিশিষ্ট পয়ার চরণের মাধ্যমে কাব্যসৃষ্টি করেছেন। মাঝারি লয়ে লেখা চরণ গুলিতে পাঁচালী ছন্দের আদল বজায় থেকেছে। কৃষ্ণের চুরির দৃশ্য ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে, যেমন —

> **''অঙ্গরু কাড়িলে আট রতন।**
> **হস্তরু কাড়িলে সোনা কঙ্কণ।।**
> **কররু কাড়িলে সুবর্ণ চুড়ি।**
> **পাদরু কাড়িলে রত্ন পাহুড়ি।।**
> **হস্তরু কাড়িলে মুদিকা গোটি।**
> **মথারু কাড়িলে চঁউরি মুঠি।।" (পৃষ্ঠা - ২)**

অলংকার ঃ

কাব্যগত তাৎপর্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কবি একই ধ্বনিযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করে লাটানুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি করেছে, যেমন —

> **''ধূঁয়া জ্বালি বুড়ি গলা কণকু।**
> **অণ্ডালি অণ্ডালি ন পাই তাকু।।**

কাশিতে কাশিতে উঠিলা ধঁক।
যে সনে ডাকিলা কমার যাঁত।।
দাণ্ড দ্বারে বুড়ি পড়িলা যাই।
ধঁকি ধঁকি বুড়ি পড়িলা শোই।।”

অর্থের দিক থেকে শব্দ জোড়াগুলির অর্থ অভিন্ন থাকলেও তাৎপর্যের দিকে ‘বারম্বার’ বা ‘পুনর্বার’ -এইরূপ অর্থ বোঝাচ্ছে। বুড়ির কাশির শব্দকে কবি কামারে যাঁতাকলের শব্দের সঙ্গে তুলনা করে উপমা অলংকার সৃষ্টি করেছেন।

এই অধ্যায়ে আলোচ্য সাহিত্য সমূহের উদ্ভব ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ধারণার স্পষ্ট রূপরেখা এবং আলোচ্য সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা জরুরী। ভাগবতানুসারী কৃষ্ণমহিমাজ্ঞাপক এই সকল সাহিত্যের উদ্ভবের সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা এইরূপ গবেষণায় প্রয়োজন আছে। বঙ্গদেশ এবং উৎকলে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ এবং ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণমহিমা জ্ঞাপক সাহিত্যের উদ্ভব শুরু হয় মধ্যযুগে। পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং ওড়িশায় ভাগবত ধর্মের বিকাশ ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদও আছে।

আমাদের বঙ্গদেশে মূলত মধুর রসের প্রেমধর্ম বা রাগানুগা ভক্তিবাদকে প্রধান রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাধবেন্দ্রপুরীই কোমলকান্ত রসের এবং রাগানুগা ভক্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে স্থিত প্রেমধর্মের প্রথম প্রচারক। তাঁর নির্দেশিত পথে পরিচালিত হন শিষ্য ঈশ্বরপুরী। বিশ্বম্ভরের দীক্ষাগুরু এই ঈশ্বরপুরী গৌড়ীয় প্রেমধর্মকে পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম ভারত এবং উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর প্রেমধর্ম বিস্তারে সচেষ্ট হন। আচার্য সুকুমার সেনের মতে মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্তিধর্মের উন্মেষ ঘটে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।[৩] মাধবেন্দ্রপুরী ত্রয়োদশ শতকের মানুষ এবং তিনি ত্রয়োদশ শতকে এই ধর্মমত প্রচার করেছেন – এই রূপ মন্তব্য করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪] বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, অদ্বৈত্য আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে ১৪৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ‘**অনন্ত সংহিতা**’ পাঠ করেছিলেন।[৫] সুতরাং অন্যান্য বিশিষ্ট গবেষকগণ সুকুমার সেনের মন্তব্যকে স্বীকার করে নিয়ে বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে ভাগবতের প্রেমদর্শন পুষ্ট

বৈষ্ণবধর্মের উন্মেষকাল রূপে পঞ্চদশ শতককে চিহ্নিত করেছেন।

ভাগবতের প্রেমধর্মের উৎস কথা সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব এক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই কারণে যে, বক্ষ্যমান গবেষণাপত্রের অধ্যায়ের শিরোনাম বাংলা হরফে ওড়িয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার বিবরণ উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা। সুতরাং কৃষ্ণকথা বিষয়ক আলোচ্য পুস্তিকাসমূহে দেবমহিমা জ্ঞাপক বিষয় অর্থাৎ ভগবতনিষ্ঠ প্রেমভাবনা যেহেতু প্রকাশ পেয়েছে তার পর্যালোচনার জন্য ভাগবত বর্ণিত প্রেমধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে বলতেই হয়। এই সাহিত্য ওড়িয়া সাহিত্য কিন্তু বাংলা হরফের। কবিগণ বাংলার অধিবাসী এবং ওড়িশারও অধিবাসী। এককালে ওড়িশার কবিদের দ্বারা রচিত হয়– এই তথ্য অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয়-বঙ্গপ্রদেশের এই প্রান্তভূমিতে এই সাহিত্য কেন এত সমাদৃত হয় বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আসলে আজ যেখানে বাঙালির অবস্থিতি তা এককালে উৎকলভূমিরূপে চিহ্নিত ছিল। মালাধর বসু উক্ত অঞ্চলের মানুষকে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার মাধ্যমে কৃষ্ণকথার মহিমাজ্ঞাপক কাব্যকে পাঠকের মণিকোঠায় পৌঁছে দিতে অক্ষম হয়েছেন– ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে। অপর ক্ষেত্রে শ্রী নিত্যানন্দ দাস, দ্বিজ মুরারি, প্রমুখ কবিবৃন্দ খুব অনায়াসে ওড়িয়া ভাষায় ওড়িয়াবোদ্ধা বাঙালির কাছে কৃষ্ণলীলার মধুরকথা পৌঁছে দিতে পেরেছেন এবং সঙ্গে লিপ্যন্তরে সহযোগিতা করেছেন ঁমধুসূদন জানা ও তাঁর নীহার প্রেসের দোভাষী কর্মচারীবৃন্দ। সুতরাং জল যে প্রদেশেরই হোক না কেন তা যদি সুপেয় এবং পানযোগ্য হয় তাহলে তৃষ্ণার্ত মাত্রেই সে জলে পিপাসা মেটাবে — এক্ষেত্রে পাঠকের রসরুচির বিকৃতি বলে কোন অবজ্ঞা করা যায় না।

ষোড়শ শতকে মেদিনীপুর জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। *"মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর নবভক্তিবাদ বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যে তিন প্রভুর আবির্ভাব হয়, তাঁদের মধ্যে শ্যামানন্দ প্রভু দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে এবং ওড়িশায় এই নবধর্ম প্রচারে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রধানত দক্ষিণ-মেদিনীপুর ও ওড়িশা প্রভু শ্যামানন্দের কর্মক্ষেত্র ছিল। এর ফলে প্রায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবসাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমায় লক্ষ্য করা গেছে, গ্রাম-গ্রামান্তরের সাধারণ পল্লীকুটিরে; কৃষিজীবি পরিবারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য গ্রন্থ কতখানি আদরণীয় হয়ে উঠেছিল"।*[৬] আমার আলোচ্য সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষীণ

যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের কাছে এই গ্রন্থসমূহের সমান সমাদর ছিল। শাস্ত্রাভিমানী বৈষ্ণবের কাছে লৌকিক লীলাকৌতুক মিশ্রিত আদিরসাত্মক এই সাহিত্য অপাংক্তেয় বলে অবহেলিত হলেও অল্পশিক্ষিত আপামর বাঙালির কাছে এইরূপ কৃষ্ণকথার লীলাগাথা গীতিমধুর ও সুখপাঠ্য হওয়ায় অনেক বেশি সমাদৃত হয়ে আসছে।

কৃষ্ণলীলার লঘুরসের কাহিনীর প্রতি অন্য প্রদেশের মানুষের মত এই অঞ্চলের মানুষের অনুরাগ কোন অসঙ্গত ঘটনা নয়। ***"চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম ও ভাগবতের আদর্শের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকলেও ভাগবতের বর্ণিত কৃষ্ণচরিত কথা সমাজেপ্রায় সর্বস্তরে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মরণীয়। শিবকে কেন্দ্র করিয়া যেমন এক শ্রেণীর কৃষি সংস্কৃতি নির্ভর শিবায়ণ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা মূলতঃ নিষাদ সংস্কৃতি বা আদীম অস্ট্রিক কৌমের সঙ্গে কৌলিক বন্ধনে সংযুক্ত— ঠিক তেমনি গোষ্ঠগাথা, রাখালী সঙ্গীতকথা বা আভীর পল্লীর গালগল্প সমন্বিত একপ্রকার গ্রামীণ কাহিনী শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল"।***[৭]

বাংলা সাহিত্য এবং ওড়িয়া সাহিত্য উভয়ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, মধ্যযুগে যতক্ষণ ভাগবতের সুউচ্চ তত্ত্বগাম্ভীর্য ছিল ততক্ষণ লৌকিক কৃষ্ণকথাগুলি গ্রামীণ স্তরে বিস্তৃত থাকলেও প্রভাব ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের অঙ্গ থেকে দৈবীবাদের ভূষণ খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানববাদের সূচনা হয়। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এই লৌকিক কৃষ্ণকথামূলক সাহিত্য মুখরোচক হয়ে ওঠে। ভারতের সমগ্র প্রদেশের কৃষ্ণলীলা সাহিত্য মূলত দ্বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যথা—(১) ভাগবতের অনুসরণে রচিত কৃষ্ণলীলা, (২) ভাগবত বহির্ভূত কৃষ্ণলীলা।

বক্ষ্যমান গবেষণাপত্রের আলোচ্য কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সাহিত্যে দ্বিজ মুরারিকৃত **'রসকেলী'** এবং **'নাবকেলী'** গ্রন্থ দুটি ভাগবতের রাসলীলা এবং বিষ্ণুপুরাণের নৌকালীলার কাহিনীর সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য রেখে লিখিত রচিত। তা সত্ত্বেও এই দুটি সাহিত্যের মধ্যে নৌকালীলা নির্ভর **'নাবকেলী'** কাব্যটির কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাস ভাগবতের কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। অপরক্ষেত্রে নিত্যানন্দ দাস বিরচিত **'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন'** কাব্যের কাহিনীও ভাগবত নির্ভর নয়। ভুবনমোহন জানা মুদ্রিত অজ্ঞাত পরিচয় জনৈক কবির কাব্য **'চোরকেলী'** গ্রন্থটির বিষয়বস্তু শুধুমাত্র **'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'** কাব্যের হারখণ্ডে পাওয়া গেলেও খিলহরিবংশম্, শ্রীমদ্ভাগবতম্, বিষ্ণুপুরাণ,

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ফলে এই কাব্যে লৌকিক জীবনের কৌতুকপূর্ণ কামকেলীই প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং এই দুটি সাহিত্যে যুগরুচির অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রচ্ছন্ন কামচর্চায় মগ্ন কবি প্রায়শ ক্ষেত্রে আদিরসাত্মক লীলাকে বিষয় রূপে বেছে নিয়ে উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থ দুটি ভাগবত মহিমার পরিবর্তে লীলাকৌতুক কৃষ্ণের কামনা চরিতার্থতার ঘটনাবলীকে বড় করে দেখানো হয়েছে।

দ্বিজ মুরারির **'রসকেলী'** এবং **'নাবকেলী'** নিঃসন্দেহে ওড়িয়া সাহিত্য। ভাগবতের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। শুধুমাত্র ভাগবতের আখ্যান অংশ নিয়ে ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ভাগবতের তত্ত্বকথা এবং দার্শনিকতা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে অনাড়ম্বর সহজ সরল ওড়িয়া ভাষায় একাদশ অক্ষর সমন্বিত চরণে এবং পয়ার ছন্দে কাব্যের রূপায়ণ করেছেন।

ওড়িশায় ভাগবত অনুসারী কাব্য-সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতকে। মহাপ্রভুর **'পঞ্চসখা'** রূপে পরিচিত কবি পঞ্চকের অন্যতম **'অতিবড়ি'** কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের একাদশ স্কন্দ পর্যন্ত অনুবাদ করেন নবাক্ষরী পয়ারে। পরবর্তীকালে দ্বারিকা দাস, অচ্যুতানন্দ দাস প্রমুখ কবি ষোড়শ শতকে ভাগবতের ওড়িয়া অনুবাদ করেন। সপ্তদশ শতকে দীনবন্ধু দাস, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক, শ্রীহরি দাস প্রমুখ কবি ভাগবতের অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।[৮]

এই অধ্যায়ে আলোচ্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় —

(ক) মুখবন্ধ, বন্দনা ইত্যাদি চিরাচরিত রীতি এই সকল সাহিত্যে অনুপস্থিত।

(খ) শুধুমাত্র মূল আখ্যান বা কাহিনী সন্নিবেশিত করে যতটা সম্ভব ব্যয়ভার কমিয়ে ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

(গ) অনেক ক্ষেত্রে ভাগবত প্রসঙ্গের বাইরে অন্যান্য পুরাণের বিচ্ছিন্ন অংশ, কিংবদন্তি নির্ভর লৌকিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রচলিত লৌকিক কৃষ্ণকথার প্রভাব পড়েছে পুস্তিকাগুলির মধ্যে।

(ঘ) কবিবৃন্দের পৌরাণিক অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী পরিকল্পনায় পুরাণপাঠের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায়না।

(ঙ) এই লীলাকথা পাঠের ফলাফল রূপে কবিগণ ভণিতায় পুণ্যার্জন ও পাপ স্খালনের কথাই বলেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা - ১৮৯৮।

২. দ্রষ্টব্য : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৫৬৭।

৩. দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (অপরার্ধ), পৃষ্ঠা - ৩১।

৪. দ্রষ্টব্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৭৪।

৫. দ্রষ্টব্য : বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, পৃষ্ঠা - ৪১৯।

৬. দ্রষ্টব্য : বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণবরঞ্জন রায় (সম্পা.), মেদিনীপুরঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৩।

৭. দ্রষ্টব্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৪৮৯।

৮. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা (সম্পা.), রঘুনাথ দাস কৃত ভুবনমঙ্গল, পৃষ্ঠা - ২৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা হরফে প্রাপ্ত ওড়িয়া লৌকিক বিষয়বস্তু নির্ভর সাহিত্য : লোকসাহিত্যের ভিন্নধারার লিখিত রূপের পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

ক. সমসাময়িক ঘটনা, অবৈধ সম্পর্ক ও প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য

১. অজা নাতুনী রহস্য — কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

২. মাই ভনজা ও নটুচুরি — ভুবনমোহন জানা

খ. জনপ্রিয় পূজা ও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সাহিত্য

১. ত্রিনাথ মেলা — কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

২. পঞ্চানন মেলা — কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

গ. নারীর সমস্যাকেন্দ্রিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য

১. গেহ্লা ঝিঅ — চন্দ্রমোহন ধল

২. সুনা ঝিঅ — কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

৩. জেমা রোদন — বনমালী

৪. অলসী বহু গীত — কবি পরিচিতি অনুপস্থিত

৫. পরশমণি — ভাবুকচরণ দাস

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা হরফে প্রাপ্ত ওড়িয়া লৌকিক বিষয়বস্তু নির্ভর সাহিত্য : লোকসাহিত্যের ভিন্নধারার লিখিত রূপের পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলা হরফে ওড়িয়া লৌকিক বিষয়বস্তু নির্ভর সাহিত্যকে আমরা বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচন করেছি। বাংলাদেশে অলিখিত ধারার সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যকে লিখিতরূপে সংরক্ষণ করার প্রয়াস বিশ শতকের শুরু থেকে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর '**লোকসাহিত্য**' **(১৯০৭)** গ্রন্থে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে ছেলে ভুলানো ছড়া, কবি সঙ্গীত, গ্রাম্যসঙ্গীত ইত্যাদি সংগ্রহণ করে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। লোকগবেষণার কাজে নিয়োজিত উচ্চকোটির গবেষকরা এই ধরণের সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনার কাজে এগিয়ে এসেছেন তা আমরা সকলে জানি। অপরদিকে লোককবির দ্বারা সংকলিত তথা মুদ্রিত লোকসাহিত্যের একটি ভিন্নধারা যে বহমান ছিল এই অধ্যায়ে সেগুলির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে। এই স্বল্প প্রতিভাবান মানুষেরা বুঝেছিলেন স্মৃতি ও শ্রুতিকে নির্ভর করে লোকসমাজে যে ওড়িয়া ভাষার রঙ্গরসধর্মী কৌতুক কবিতা, ব্রতকথাধর্মী পাঁচালী, নারীর প্রতি নীতিশিক্ষা, অবৈধ সম্পর্ক নির্ভর আদিরসের কাব্যকথাগুলি প্রচলিত আছে তা চিরকাল মানুষের স্মৃতিতে থাকবেনা। কারণ এই অঞ্চলের মানুষের মুখ থেকে ওড়িয়া ভাষা ক্রমশ হারিয়ে যাবে আর তার সাথে সাথে স্মৃতি থেকে মুছে যাবে এই সাহিত্যধারা-তাই তাঁরা বাংলা লিপিতে সেই সাহিত্যের কয়েকটি জনপ্রিয় নিদর্শনকে মুদ্রিতরূপে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এই কাজে তাঁদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা ছিল না, নিতান্তই ব্যক্তিগতভাবে ওড়িয়া ভাষার প্রতি আশৈশব অনুরাগ তাঁদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছে। মোক্ষকামী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং নারীদের অন্দরমহলে পঠিত হত ব্রতকথাধর্মী দেবমাহাত্ম্য, যুবক-যুবতীদের মধ্যে আকর্ষণীয় ছিল প্রণয়নির্ভর পুস্তিকাগুলি। নারীর প্রতি নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্যও ছিল বেশ কয়েকটি পুস্তিকা। এমনকি এই নীতিশিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকাগুলি বিবাহে নববধূকে উপহার দেওয়া হতো। উৎসর্গপত্রে তা উল্লিখিত আছে। প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা রসিয়ে রসিয়ে পড়তো সতীনকোন্দল, তরুণী ভার্য্যার জীবনযন্ত্রণা, বৃদ্ধের ভীমরতি ও গুপ্তপ্রণয়ের আখ্যান। এই সাহিত্যপাঠের আগ্রহ এককালে ব্যাপকহারে থাকলেও আজ তা দেখা যায় না। বাংলা ভাষার প্রতি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের ফলে তাঁদের মন ও মনন থেকে ওড়িয়া ভাষা আজ ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে এই বিলীয়মান লোকসাহিত্যের লিখিত নিদর্শন রূপে পুস্তিকাগুলির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই সাহিত্যকে বিষয়বস্তুগত ভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা — **ক.** সমসাময়িক ঘটনা, অবৈধ সম্পর্ক ও প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য, **খ.** জনপ্রিয় পূজা ও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সাহিত্য এবং **গ.** নারীর সমস্যা কেন্দ্রিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য। সর্বমোট ৯টি পুস্তিকার পর্যালোচনা এই অধ্যায়ে ধরা থাকছে।

ক. সাময়িক ঘটনা, অবৈধ সম্পর্ক ও প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য

গ্রন্থ ১. অজা নাতুনী রহস্য, কবি - কবি পরিচিতি অনুপস্থিত ঃ

ওড়িয়া ভাষায় অজ্ঞাত পরিচয় এক লোককবি **'অজা নাতুনী রহস্য'** শীর্ষক একটি কাব্যকাহিনী রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু দাদু-নাতনির অবৈধ প্রণয় প্রসঙ্গ। গবেষকের সংগৃহীত পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে সংস্করণ সংখ্যার উল্লেখ না থাকায় এটিকে প্রথম সংস্করণ বা একমাত্র সংস্করণ রূপে ধরে নেওয়া যায়। রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> **"নূতন/অজা নাতুনী রহস্য।/—০—/কাঁথি নিহার প্রেস হইতে/প্রকাশিত।/পুষ্প চিত্র অঙ্কিত/সন ১৩৫৮ সাল।/—ঃ০ঃ—/মূল্য দুই আনা মাত্র।"**
>
> **(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭ক দ্রষ্টব্য)**

পুস্তিকাটির চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। মাঝখানে একটি পুষ্প চিহ্ন অঙ্কিত আছে। পুস্তিকাটি ১২.৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৯.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। এতে প্রচ্ছদপত্র (১), মূলগ্রন্থ (৭) সহ মোট ৮টি পৃষ্ঠা আছে।

রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে — **"নাতুনী—গাআঁ মুণ্ডরে গোহিরী/ মো দেহ ছুইঁল কি সত্য করি/বুঢ়া অঙ্গরে সে কথা দেল পাসোরি।"**

কবি পরিচিতি ঃ

আমাদের আলোচ্য পুস্তিকাটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। 'অজা' অর্থাৎ দাদু এবং নাতনির অবৈধ সম্পর্কের রহস্য উন্মোচন করেছেন এই লোককবি। সমাজ-বিরুদ্ধ এক সম্পর্ক যা পাপকর্ম

এবং অবৈধ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজে ঘটে – তা অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ এক বাস্তব সামাজিক বিকৃতির উপস্থাপক ছিলেন কোন এক কালে কোন এক লোককবি যিনি মৌখিক মাধ্যমে গান রচনা করে থাকতে পারেন। নীহার প্রেসের প্রকাশক হয়তো একটি কারণে এই কাহিনীর সংগ্রাহক বা লোককবির কবি পরিচিতি আড়াল করে গেছেন। যেহেতু অপরাধ জগতের এক কাহিনীগাথা এবং স্থূলরুচিসম্পন্ন এক কাহিনী, সুতরাং আত্মসম্মান রক্ষার্থে সংগ্রাহক এবং রচয়িতা তাঁদের নাম অপ্রকাশিত রেখেছেন। নীহারের প্রতিটি পুস্তিকায় প্রকাশকের নাম থাকে, কিন্তু এই পুস্তিকার ক্ষেত্রে রুচিশীল প্রকাশক নিজের নাম মুদ্রিত করেন নি। নিছক বাণিজ্যিক স্বার্থে এবং সাধারণের চাহিদার কারণে কাহিনীটি পুস্তিকারূপে প্রকাশ করেছেন।

কাব্যকাহিনী ঃ

'অজা নাতুনী রহস্য' পুস্তিকাটির কাহিনী বস্তু সামান্য। দাদু এবং নাতনির অবৈধ সম্পর্কের কারণে **'অজা'** অর্থাৎ দাদু তার নাতনিকে বিবাহ দেওয়ার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। দাদু নাতনিকে সেবাদাসী করে রাখতে চায় এবং সাধ্যমত নাতনির মনের আকাঙ্খা ও ইচ্ছা পূরণ করতে চায়। কিন্তু বাধ সাধে নাতনি। দাদুর এহেন কদর্য প্রস্তাবে সে ভীত, সন্ত্রস্ত ও লজ্জিত। নাতনি দাদুকে বারবার বলে যে বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ দুর্মতি ছাড়তে কিন্তু দাদু কিছুতেই পিছু পা হতে চায়না। বুড়ো বলে–

"দেশ দুনিয়ারে যেতে
খোজুছি মু বর ন মিলে তোতে
নাতুনী লো থর হুঅ দিনাকেতে।
তোতে ছব্বিশ বরষ
বেশি হোই নাহি তোতে বয়স
নাতুনী লো দেবি যুবক পুরুষ।" (পৃষ্ঠা - ৩)

বঙ্গানুবাদ :

দেশ দুনিয়ায় যত
হন্যে হয়ে খুঁজেও বর, পাইনা মনের মত
সাধের নাতনী লো, ধৈরজ ধর দিন কত।

বয়স মোটে ছাব্বিশ

করছো কেন হা পিত্যিশ

যুবা পুরুষ বরা জুটাবো,   করছি আমি প্রমিশ্।

প্রত্যুত্তরে নাতনি জানায়—

"পুরী সর খির ঘণ

যেতে খাইলে ন বুঝছি মন

বুঢ়া অজারে বিভা ঘর কেউদিন।" (পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ :

ক্ষীর পুরী ঘণ সর

কত কি খাওয়ালে,   তবু না মিটে অন্তর।

কবে যে দিবে বিভা,   কবে যে পাবো বর।।

নাতনির এতো অভিযোগ-অনুযোগ সত্বেও দাদু কিছুতেই নাতনির বিবাহ দেওয়ার পক্ষপাতী নন। অবশেষে বুড়ো দাদুর অবচেতন মন ধরা পড়ে এইভাবে–

"অষ্ট অলংকার মান

দাসী পরিবারী দেবি মো ধন

নাতুনী লো সুখে কটি যিব দিন।" (পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদ :

অলংকার আর মণি-মুক্তা মতি

সাথে দাস-দাসী ধন সম্পত্তি

নাতনি গো, সুখে যাবে দিন লয়ে বৃদ্ধপতি

বুড়ো বরকে নিয়ে ঘর-সংসার করার বাস্তব সমস্যার কথা নাতনি উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

"দধড়া কান্থরে মাটি
কেতে মু ছাটিবি করি রিপিটি
বুড়া অজারে অল্পদিনে যিব ফাটি।" (পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদঃ

ফেটে চৌচির মাটির দালান
রিপিট করে করে হব হয়রান
সাধের বুড়ো—
দালানবাড়ি পড়বে খসে হবি রে খান খান।

কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়, দাদু তার নাতনিকে একের পর এক প্রলোভন দেখিয়ে যাচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নাতনিকে রাজী করিয়ে ছাড়ে। আগামী মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে বিয়ে করবে বলে স্থির সিদ্ধান্তে আসে। কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

আলোচ্য পুস্তিকাটির সাহিত্যবস্তু উৎকৃষ্ট রূপে ধরা পড়েনি। এক সামাজিক ব্যাধি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন বইটিতে। দাদু-নাতনীর সম্পর্ককে চিরকাল সমাজ বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে আসছে। এই পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কটি ইয়ার্কি ও রঙ্গ-রসের সম্পর্ক। সুতরাং লঘু রসাত্মক এইরূপ এক কাহিনী সমাজের কাছে মুখরোচক হবে কবি বুঝতে পেরেছিলেন। পুস্তিকাটি সমাজের এক অন্ধকার স্তরের মানুষের অবচৈতনিক মনোবিকলন ও তার প্রতিফলন। লোকসমাজ এই পুস্তিকাটির পাঠাস্বাদনের ক্ষেত্রে এবং সংগ্রহের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতেন। লোকসমাজের স্থূলরুচি নির্ভর এক লিখিত ফোক-পর্ণোগ্রাফি বলা যেতে পারে। লোকসমাজের রসরুচির ক্ষেত্রে কোন নিষিদ্ধ আইন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অবদমিত ইচ্ছা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু শিষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে রুচিবোধের কিংবা রসবোধের code of conduct বা সমাজ নির্দিষ্ট আদর্শ আছে। শিষ্ট সাহিত্যিক সেই বৃত্তের মধ্যে থাকতে বাধ্য হন। লোক সাহিত্যের রুচিবৃত্তের পরিধি বড়ই অনিয়ন্ত্রিত

ও শিথিল।

পুস্তিকাটির সাহিত্য আঙ্গিকে নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই রচনাটি ডুয়েট বা দ্বিতসঙ্গীতধর্মী এবং নারী ও পুরুষে দ্বিত্ব কণ্ঠে গীত এক গীতিনাট্য। গীতিনাট্য এই কারণেই বলা যায় যে, কাহিনীর উত্থান-পতন এবং পরিণতির পথে অগ্রধাবমান গতি আছে, আছে climax বা চূড়ান্ত পরিণতি। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তুলে ধরা হয়েছে। গানের সুরে গীত হয় এই নাটিকা। আমরা জানি লোকনাট্যে অভিনীত হওয়ার সময় একঘেয়েমি কাটানোর জন্য মাঝে মাঝে রঙ্গরসিকতাপূর্ণ ডুয়েট গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এই ডুয়েটের একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু থাকে যা মূল নাটকের কাহিনী থেকে আলাদা। দর্শক অধীর আগ্রহে বসে থাকেন এই উপরিপাওনার জন্য। অশ্রুসজল কাহিনীর একটানা পরিবেশনের মাঝে দর্শকের ঘুম ছাড়ানোর এক অব্যর্থ ওষুধ।

'অজা নাতুনী রহস্য' লোকনাট্যের অন্তর্ভূক্ত এক ডুয়েট গান রূপে এখনও অভিনীত হয়। ডুয়েট গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা এবং একমুখিনতা। এই বৈশিষ্ট্য **'অজা নাতুনী রহস্য'**-এর কাহিনীতে আছে। মেদিনীপুর জেলার লোকনাট্যে নানা ধরণের হাস্যরসাত্মক গান এককভাবে বা দ্বৈতভাবে পরিবেশন করা হয়। **''সাধারণ একক কণ্ঠের গানকে ক্রমিক এবং দ্বৈত কণ্ঠে গীত গানকে ডুয়েট বলে। অভিনয়ে দর্শকদের রুচির পরিবর্তনের জন্য এই ধরনের গান (অভিনয়ের মাধ্যমে) পরিবেশন করা হয়ে থাকে।''**[১] বাংলা ও ওড়িশার সীমানা বরাবর সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরবর্তী বাংলা ও ওড়িশার গ্রাম গুলিতে বাংলা লিপিতে লিখিত ওড়িয়া ভাষায় অভিনীত অনেক নাটক এখনও অভিনীত হয়। এই নাটকগুলির অভিনয়ের মধ্যে **'অজা নাতুনী রহস্য'** এর মতো অশ্লীল ও কৌতুকপূর্ণ ক্ষুদ্র নাটিকাগুলি অভিনীত হতো। **''একসময় এই ভূখণ্ডে (গোপীবল্লভপুর থেকে দাঁতন পর্যন্ত) ললিতা পালা ছাড়াও চড়িয়া-চড়িয়ানী, শবর-শবরী, বাগাম্বর প্রভৃতি লোকযাত্রা পালা ছিল সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় বিনোদন।...সুবর্ণরৈখিক এলাকায় উল্লিখিত যাত্রাপালাগুলো সবই ওড়িয়া ভাষায় বাংলা লিপিতে রচিত।''**[২]

ছন্দ ঃ

‘অজা নাতুনী রহস্য’ পুস্তিকাটি ৬+২, ৬+৫ মাত্রা বিন্যাস রীতিতে অতিপর্ব সংযুক্ত কলাবৃত্ত ছন্দে পংক্তিগুলোকে সাজানো হয়েছে, যেমন —

‘‘কপট করু কি/পাই ৬+২
পরকু ন দেই/রখিবু তুহি ৬+৫
(বুঢ়া অজারে,) মোতে জনা যাত্র/ সেহি’’ ৬+২

উপরোক্ত ৫ মাত্রার অতিপর্ব সবকটি স্তবকে একবার করে আছে। গানের জন্য এই অতিপর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গানের ধূয়া হিসেবে এটা গাওয়া হতো। কাব্যের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত কবি একই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়না, লোকসাহিত্যের লিখিত রূপের এই সাহিত্যে তাই মেনে চলা হয়েছে।

অলংকার ঃ

অলংকারের ব্যবহার নেই বললেই চলে। লোকসাধারণের বুঝে ওঠার জন্য সহজবোধ্য কাব্যভাষার প্রয়োজন — কবি তাই করেছেন। তবে দুয়েক ক্ষেত্রে উপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন কবি। যেমন —

‘দদড়া কান্থরে মাটি
কেতে মু ছাটিবি করি রিপিটি’ (পৃষ্ঠা - ৬)

বৃদ্ধের শরীরের সাথে ফাটল ধরা মাটির দেওয়ালের তুলনা করেছে যুবতী। ফাটল ধরা জীর্ণ দেওয়ালকে গৃহস্থ যেমন ‘রিপিট’ বা সংস্কার করতে করতে নাজেহাল হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি এই বৃদ্ধ দাদুকে বিবাহ করলে সারাজীবন তাকেও পস্তাতে হবে। লোককবির ভাবনা চিন্তায় এইরূপ উপমা অলংকারের উপস্থাপন সত্যিই প্রশংসনীয়। এক জায়গায় কবি এই বুড়ো দাদুকে **‘কাঠুআ হুলি’** বা কাঠ পিঁপড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নাতনী এক জায়গায় দাদুকে বলেছে — **‘নঈ পাণি তলে পঙ্ক’** অর্থাৎ নদীর জলের নীচে ডুবে থাকা পাঁক বলে নিন্দা করেছে। বাইরে থেকে স্বচ্ছতোয়া নদী কিন্তু গভীরে আছে কাদা —দাদুর চরিত্রটি ঠিক অনুরূপ।

অবশেষে বলা যায়, জনপ্রিয়তার বিচারে এই লোকসাহিত্যের লিখিত রূপটি প্রথম সারির সাহিত্য। শ্লীল-অশ্লীল বিচার সময়ের মাপকাঠিতে হয়। সেই সময় লোকসমাজের এইরূপ একটি অবক্ষয় বাস্তবোচিত বলে সাধারণ পাঠকের রুচিবোধে তা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। বরাবর লোকসাহিত্য অকপট ভাবে সমাজের বিষ ও অমৃত উভয়কে তুলে আনার চেষ্টা করে। এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। Popular Literature কে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে। গবেষণার এই অধ্যায়ে এই রচনার জনপ্রিয়তার যে যে কারণ তা অণ্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থ ২. মাই ভণজা ও নটু চুরি, গায়ক ও প্রকাশক - ভুবনমোহন জানা ঃ

জনৈক পুস্তক বিক্রেতা ভুবনমোহন জানার সংগ্রহীত ও প্রকাশিত রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয় নির্ভর একটি পুস্তিকা হল **'মাই ভণজা ও নটুচুরি'**। আমাদের সংগ্রহে থাকা পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে কোন সংস্করণ সংখ্যার উল্লেখ নেই। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৪০৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> **"মাই ভণজা নটুচুরি/নারীর মুখচ্ছবি মুদ্রিত/গায়ক ও প্রকাশক—/ শ্রীভুবনমোহন জানা/সাং - নস্করপুর ঃঃ পোঃ- আটবাটী/ জেলা - মেদিনীপুর/সন ১৪০৩ সাল।/মূল্য - ১.৫০ টাকা/মুদ্রণ ঃ পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, আটবাটী।"**
>
> **(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭খ দ্রষ্টব্য)**

পুস্তিকাটির প্রচ্ছদের চারিপাশে অলংকবণ করা হয়েছে। মাঝখানে আছে একটি নারীর ছবি। গ্রন্থটি ১৬ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১০ সেন্টিমিটার চওড়া। এতে প্রচ্ছদপত্র (১), মূলগ্রন্থ (১০), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ মোট ১২টি পৃষ্ঠা আছে। পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত আছে গায়ক ও প্রকাশক ভুবনমোহন জানার প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনে ২৪ খানি পুস্তিকার নাম তালিকাভুক্ত করা আছে।

রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"দিনে বনমালী করু থিলে কেলি,

কেলি কদম্বর মূলে

বৃষভানু সুতা, সেঠারে আসিণ,

বেণি নয়নে দেখিলে গো

কৃষ্ণ হরষ মন, যেহ্নে হরাই পাইলে ধন গো

কৃষ্ণ হরষ মন।।"

এইভাবে ৩১ সংখ্যক স্তবক পর্যন্ত কাব্যের কাহিনীবস্তুর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি স্তবকে সংগ্রাহক স্তবকসংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

সংগ্রাহক ও সম্পাদক পরিচিতি ঃ

আলোচ্য পুস্তিকাটি যেহেতু লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ সেই হেতু কাব্যটি কোন নির্দিষ্ট কবি বা একক কবির রচনা নয়। দীর্ঘদিন গানের সুরে লোকসমাজের স্মৃতিপটে বেঁচে থাকে এবং শ্রুতিপথে প্রবাহিত হতে থাকে। স্থূলরুচির এই কৃষ্ণলীলার বিষয়গুলো খুব সহজে লোকশিল্পীর স্মৃতিতে অটুটভাবে থেকে যায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা গেয়ে যায়। ওড়িয়া মৌখিক সাহিত্যের (লৌকিক কাব্য, গান, ছড়া ইত্যাদি) সংগ্রাহক এবং গায়কের মধ্যে এমন একজন মানুষ হলেন ভুবনমোহন জানা। কাঁথি মহকুমায় অবস্থিত এগরা থানার নস্করপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। ওড়িয়া লোকগান, কাব্য, গাথা, ব্রতকথা ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলো ছোট ছোট পুস্তিকায় প্রকাশ করে আসছেন। এছাড়া সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া সামাজিক ও দৈবিক ঘটনাবলীর উপর গান লিখে তাতে সুর দেন এবং হারমোনিয়াম সহ গান করে আসছেন। বিক্রি করবার জন্য মুদ্রিত পুস্তিকাগুলো গ্রামীণ মেলায় বিক্রি করেন। পায়ে বাঁধা থাকে ঘুঙুর হাতে থাকে হারমোনিয়াম। উচ্চকণ্ঠে করুণ সুরে (মুদ্রিত পুস্তিকার পাঠ বা text) গান করে লোক জমায়েত করেন এবং পুস্তিকাগুলো বিক্রি করেন। ভদ্রলোকের বয়স ৭২ বছর। এখনও তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টার ঘাটতি নেই। তাঁর এই দীর্ঘজীবনে সংগৃহীত ও মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি হল — **'মাই ভণজা বা নটুচুরি'**, **'সন্ধ্যারানীর চিঠি'**, **'কঙ্কাবতীর চিঠি'**, **'স্নেহলতার চিঠি'**, **'চন্দ্রাবতীর চিঠি'**, **'জলকেলী'**, **'দোল'**, **'পরশমণি'**, **'রাধিকা রোদন'**, **'সন্ধ্যা রোদন'**, **'নুয়া বহু সরগ তরা'**, **'সখী সেনা'**, **'শিব চতুর্দশী ব্রত'** ইত্যাদি। এইসব লোকসাহিত্যগুলি ক্ষুদ্র আখ্যানধর্মী রচনা। উপরোক্ত তালিকা থেকে আমরা **'মাই ভণজা নটুচুরি'**

পুস্তিকটি আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি।

কাব্যকাহিনী ঃ

এই পুস্তিকাটির একমাত্র বিষয়বস্তু লৌকিক কাহিনী নির্ভর রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা। এই কাব্যের কাহিনী ভাগবতলব্ধ নয়। কিংবদন্তী বা লোকমুখে প্রচলিত এক কাহিনীবস্তু। প্রচ্ছন্ন কামচর্চার একটি ঘটনা এই কাব্যের আখ্যান কথা। **'মাই'** শব্দটির উৎকলীয় আভিধানিক অর্থ মাতুলানী অর্থাৎ বাংলা প্রতিশব্দ মামিমা। **'ভনজা'** শব্দটির উৎকলীয় আভিধানিক অর্থ 'ভউনীজা' অর্থাৎ ভগ্নিজা যার বাংলা প্রতিশব্দ ভাগিনেয়। মামিমা এবং ভাগিনেয় অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের এক প্রচ্ছন্ন কামকেলী। **'নটু'** অর্থাৎ ওড়িয়া আভিধানিক অর্থ ক্ষুদ্র করতাল বিশেষ যা শিশুরা খেলনা হিসেবে ব্যবহার করে। কৃষ্ণের নটু অর্থাৎ করতাল হারিয়ে গেলে মামিমা চুরি করেছে বলে মিথ্যা দোষারোপ করতে থাকে কৃষ্ণ। রাধার প্রতি এ হেন অপবাদে যশোদা লজ্জিত হয়। মা যশোদার সাক্ষাতে কৃষ্ণ রাধাকে হাজির করায়। মা যশোদা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কৃষ্ণ মা যশোদাকে বলে যে, মামিমা তার বক্ষ-বন্ধনীর মধ্যে করতাল জোড়াটি লুকিয়ে রেখেছেন। সুতরাং বক্ষবন্ধনী শিথিল করলে করতাল পাওয়া যাবে। কৃষ্ণের এ হেন আপত্তিকর অভিযোগে মা যশোদা কিঞ্চিত কুণ্ঠিত হয়ে রাধাকে বক্ষবন্ধনী শিথিল করতে বলে এবং তৎক্ষণাৎ লীলাময়ের লীলায় করতালজোড়া বক্ষ হতে ভূপতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কানাই-এর অবচেতন আকাঙ্খা চরিতার্থ হয়। এইরূপ একটি লৌকিক কৃষ্ণকথা স্থান পেয়েছে এই পুস্তিকার কাহিনী কল্পনায়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

ত্রিপদী ছন্দে সংগ্রাহক ভুবনমোহন কাব্যটিকে মোট ৩১টি স্তবকের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত করেছেন। কাব্যকথার সূচনা করলেন কবি এইরূপ—

"দিনে বনমালী   করুথিলে কেলী,
কেলী কদম্বের মূলে।
বৃষভানু সুতা   সেথা সমাগতা
বেণি নয়নে দেখিলে গো
কৃষ্ণ হরষ মন   (যেহ্নে) হরাই পাইলে ধন

কৃষ্ণ হরষ মন গো।। "(পৃষ্ঠা - ২)

বঙ্গানুবাদ :

হরি বনমালী   করিছেন কেলী
একদা কদম্ব মূলে।
বৃষভানু সুতা   সেথা সমাগতা
গোচরি আঁখি যুগলে গো–
কানু হরষিত মনে   যেন পাই হারাধনে
কৃষ্ণ হরষিত মনে গো–

বালক কৃষ্ণকে গভীর বৃন্দাবনে দেখে শ্রীরাধা রীতিমতো চমকিত হলেন। কৃষ্ণকে রাধা জিজ্ঞাসা করলেন একাকি কীভাবে এই বৃন্দাবনে সে এলো। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বলে যে, সে খেলবার জন্য বৃন্দাবনে এসেছে। কৃষ্ণ আবদার করে মামিমার কোলে বসার জন্য। বালক কৃষ্ণের আবদার মামিমা (রাধিকা) ফেলতে পারলেন না। কবি বর্ণনা করলেন এইভাবে —

"যশোদার বাল,   নীলা কুতুহল,
রাধা জানি ন পারিলে।
তক্ষণে জগত   নাথঙ্কু রাধিকা
কোলরে বসাই নেলে গো–
কৃষ্ণ হেলে আনন্দ   মুখ বিকশিত চান্দ
কৃষ্ণ হেলে আনন্দ গো–"(পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ :

কৃষ্ণ বনমালী   লীলা কুতুহলী
সে লীলা না জানি রাই
সহসা কানুরে   কোলে তুলি ধরে
প্রবোধিল কানাই রে–

এই পর্যন্ত কৃষ্ণের বালখিল্য সুলভ লীলা সঙ্গত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বালক কৃষ্ণের যে প্রণয়লীলা তা বিস্ময়কর। কবি বর্ণনা করলেন এইভাবে–

"অতি স্নেহভরে, বাম কুচ পরে,
হস্ত দেলে পীতবাস।
কহন্তি অচ্যুত কহ মাই সত্য
ইহার নামটি কিসগো
ইহা পাইলু কাঁহি দেই আছি ইয়া কিয়ে গো–"(পৃষ্ঠা - ৪)

দুগ্ধপোষ্য বালকৃষ্ণ স্বভাবসঙ্গত ভাবে কোলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে আচরণ করলো তার বঙ্গানুবাদ এইরূপ–

"অতি স্নেহ ভরে, বাম কুচ পরে,
হস্ত রাখি পীতাম্বর।
কহিলা অচ্যুত কহ মামী সত্য
কীবা এবস্তু হেন মনোহর।।"

কৃষ্ণের কৌতুহল আসলে নিতান্তই মাতৃবক্ষে থাকা দুগ্ধপোষ্য শিশুর কৌতুহল বলে মনে করাটা এক্ষেত্রে কতটুকু সঙ্গত হবে—এ প্রশ্নের উত্তর লোকসমাজের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। শাস্ত্রের উর্ধ্বে উঠে লোক সমাজ তাদের মতো করে লীলাময় কৃষ্ণের লীলাকে উপলব্ধি করেছে। রসরুচির মানদণ্ডে লোকসমাজের এই কানু **'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'** -এর কাহ্নাইর চেয়েও অধোগামী রূপে ধরা পড়ে। শ্রীরাধার কুচযুগলে বালক কৃষ্ণের হস্ত সঞ্চালন আসলে কবির যুক্তিতে কৃষ্ণের হারিয়ে যাওয়া **'নটু'** অর্থাৎ করতালের অনুসন্ধান। এই করতাল কুচযুগের সমাকৃতি বিশিষ্ট। সুতরাং বালক কৃষ্ণের অনুমান এক্ষেত্রে সঙ্গত। এই ঘটনা কার্য-কারণহীন বলা যাবে না। কিন্তু কালক্রমে বালকের এই সারল্য আসলে প্রচ্ছন্ন কামনা বলে প্রমাণিত হয়, বালক কৃষ্ণের প্রতি আমাদের সরল বিশ্বাস ভেঙে যায়—

"শ্রীকৃষ্ণ বোইলে বালুতো বোইলে

মোঠারে নাহি কি রতি

ছোট সর্পর কি   বিষ জ্বালা নাহি

ইহা ভাবিছু কি মোতি গো–” (পৃষ্ঠা - ৫)

বঙ্গানুবাদ :

কহিলে সাত্যকী   বালক বলে কি

নাহিকি অঙ্গে রতি।

ক্ষুদ্রাকার অহী   বিষ জ্বালা নাহি

কেমনে ভাবিছ শ্রীমতী।।

যশোদা পুত্রের অন্বেষণে এলে রাধা ও কৃষ্ণকে কদম্বের মূলে একত্রে দেখতে পায়। কৃষ্ণ মায়ের কাছে অভিযোগ করে যে, তার **‘নটু’** জোড়াখানি রাধিকা বক্ষবন্ধনীর মাঝে লুকিয়ে রেখেছে। কিছুতে দিচ্ছে না। তাই তার বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। কৃষ্ণের এহেন অভিযোগে যশোদা রাধাকে বক্ষবন্ধনী শিথিল করতে বলে। রাধিকা এই দোষারোপ থেকে অব্যাহতির জন্য বক্ষবন্ধনী শিথিল করতে বাধ্য হয় এবং তৎক্ষণাৎ করতাল জোড়া ভূলুণ্ঠিত হয়। কৃষ্ণের কামনা চরিতার্থ হয় এই সুযোগে। কলঙ্কভঞ্জন কৃষ্ণের মহিমায় যশোদা পথে যেতে যেতে পূর্ব ঘটনা সকল স্মৃতি বিস্মৃত হয় এবং গোপকূলে রাধিকার কলঙ্কের কথা অজানা রয়ে যায়। ভণিতায় সংগ্রাহক বলেছেন—

“শ্রীরাধা কৃষ্ণঙ্ক   চরণ পঙ্কজে,

মন মো রহু নিশ্চলে

তাঙ্ক পাদ পদ্মে   ভরসা যে করি,

শেষ কলি নটু চুরি গো–

ভুবনমোহন গুরুপদে স্মরি গো–” (পৃষ্ঠা - ১১)

এইভাবে কাব্যটি শেষ হয়েছে।

সারা ভারতে লৌকিক স্তরে ও লিখিতরূপে রাধাকৃষ্ণলীলার যে কাব্য বা নাটগীতিগুলি পাওয়া যায় সেগুলির উপাখ্যানগুলির মধ্যে একটি সাধারণীকরণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত প্রায়

অধিকাংশ আখ্যান সরলগঠনযুক্ত এবং দ্বিতীয়ত এই জাতীয় উপাখ্যানগুলির গঠনে একটি সামান্যধর্ম রয়েছে যাকে একটি প্যারাডাইম বা রূপকল্পে ধরা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লিখিত ও লৌকিক রাধাকৃষ্ণের লীলাকথায় যে কাহিনী লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে আমরা দেখি রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষনের সূত্রপাত থেকে অনিচ্ছুক রাধার ক্রমশঃ কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। রাধাকে নিতান্ত দৈহিকভাবে উপভোগ করতে চায় কৃষ্ণ। এই সুপ্ত কামনা চরিতার্থ করবার জন্য কৃষ্ণ ফন্দি আঁটে। সেই ফাঁদে সুকৌশলে রাধাকে ফেলতে বাধ্য করে এবং কামনা চরিতার্থ করে। ''**গঠনগত দিক থেকে এই উপাখ্যানগুলির অন্তর্গত রূপকল্পটি হয়ে দাঁড়ায় —**

কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে দেহমিলন চান > **এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সুযোগ সৃষ্টি করেন** > **অনিচ্ছুক রাধা প্রতিরোধ করলে কৌশলে তাঁকে বাধ্য করেন** > **পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় রাধা দেহমিলনে বাধ্য হন**''[৩]

উপরোক্ত প্যারাডাইম অবিকল ধরা আছে '**মাই ভণজা নটুচুরি**' কাব্যের কাহিনীবস্তুতে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কামনার উদ্রেক থেকে কাব্যকাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। এর পরের স্তরে দেখতে পাই কামনা চরিতার্থ করার জন্য উপায় নির্ধারণ। এই পর্বে কৃষ্ণ পদ্ধতির প্রয়োগ করছে, প্রয়োগজনিত বাধা ও বাধা নিরসনের উপায় অবলম্বন করে সাফল্য বা ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সহজে ব্যর্থ হচ্ছেনা। প্রয়োজনে অলৌকিক শক্তি আরোপ করে সাফল্য লাভ করেছে। আলোচ্য কাব্যে কৃষ্ণ কামনা করে রাধার দেহসৌষ্ঠব তথা 'কুচযুগ' দেখতে। উপায় রূপে '**নটু**' অর্থাৎ করতাল চুরির অভিযোগ আনে রাধার বিরুদ্ধে। বক্ষবন্ধনীতে রাধা করতাল লুকিয়ে রেখেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ আনে। বাস্তবে যশোদার সম্মুখে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উপায় হিসেবে অলৌকিকতার দ্বারা কুচযুগের মধ্য থেকে করতাল বের করে মা যশোদার কাছে প্রমাণ করে রাধা চুরি করেছে। এর ফলে সুকৌশলে কামনা চরিতার্থ করলো কৃষ্ণ।

কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় উভয় দিক থেকে প্রচলিত আছে। লোকপুরাণের শাস্ত্রায়ণ এবং শাস্ত্রের লোকায়ণ - উভয় ক্ষেত্রের পারস্পরিক আদান-প্রদান হয়েছে পূর্ববর্তী পর্যালোচনার দ্বারা তা প্রমাণিত। লোকসমাজে যে কৃষ্ণকথাগুলির প্রচলন আছে তা শাস্ত্রের অনুকরণ

এই ধারণা সবসময় সত্য নয়। শাস্ত্রের বাইরে কৃষ্ণকথাগুলিতে বহুমুখীন ও বহুমাত্রিক ভাবনাগুলির প্রকাশ ঘটে। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কার, ধ্যান-ধারণা লোকসমাজের ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলি উঠে আসে। "**আসলে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ শুধু শাস্ত্রীয় স্তরে সীমাবদ্ধ বিষয় নয়, তার প্রবহমানতা বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। শাস্ত্রগ্রন্থে, মহাকাব্যে, সাহিত্যে যেমন তার বিকাশ ঘটেছে, তেমনই লৌকিক স্তরেও তার প্রবহমানতা যে প্রাচীনকাল থেকে অব্যবাহত থেকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ভারত সংস্কৃতির বহু উৎসজাত চরিত্রের কথা মনে রাখলে কৃষ্ণকথাও যে সেই লক্ষণাক্রান্ত হবে, তা অনুমান করা কষ্টকল্পনা নয়।**"[৪]

আমরা এই সকল লোকায়ত কৃষ্ণলীলার উদ্ভবকাল নির্ণয় করতে গিয়ে একটি কালপর্বকে নির্দিষ্ট করতে পেরেছি। লোকসমাজে স্থূলরুচির যে কৃষ্ণকথাগুলি চলে আসছে লোকসাহিত্যের মাধ্যমে সেগুলি চৈতন্যপূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা বললে অত্যুক্তি হয়না। কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশই আদিপর্বে রচিত শাস্ত্রগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। **'মহাভারতম্'** থেকে **'শ্রীমদ্ভাগবতম্'** পর্যন্ত এমনকি পদ্মপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই সময়কার কৃষ্ণকথার মধ্যে প্রেমলীলা বা বৃন্দাবনলীলার কোন স্থান ছিলনা। শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি অধ্যায়ে কৃষ্ণের গোপীসঙ্গের কথা থাকলেও বৃন্দাবনলীলার কাছে গুরুত্বহীন ছিল। এই বীররস ক্রমশ শৃঙ্গার রসের দিকে অভিমুখী হয়ে ওঠে। জয়দেব তাঁর **'গীতগোবিন্দম'** -এ কৃষ্ণলীলার আধারে কৌতুহলী বিলাসকলাকে ফুটিয়ে তুললেন। দ্বাদশ শতকে এই আস্বাদন শুরু হয়েছে এবং ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মঞ্জরীভাবের সাধনা শুরু হওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। "**ষোড়শ শতক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তত্ত্বগতভাবে কৃষ্ণের অন্যান্য লীলার মধ্যে 'সর্বোত্তম নরলীলা'কে স্বীকার করে নিলেও প্রেমভক্তিবাদের আলোকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে একটি আদর্শায়িত, ইন্দ্রিয়াতীত কিংবা নান্দনিক স্তরে স্থাপন করেছিল।**"[৫] সুতরাং মেদিনীপুর তথা সমগ্র ভারতে লৌকিক স্তরের যে কৃষ্ণকাব্যগুলি প্রচলিত আছে তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পূর্বেকার সাংস্কৃতিক পরম্পরা। লৌকিক কিংবা লম্পট গ্রাম্য যুবকের কীর্তিকলাপ (বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন) চৈতন্যদেব নিজে আস্বাদন করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তা আস্বাদন করেননি। এমনকি সেই জাতীয় কথাবস্তু ও ভাববস্তু কখনোই প্রবেশাধিকার পায়নি। তবুও বেঁচে থাকে চৈতন্যোত্তর পর্বে—শাস্ত্রে সল্পমাত্রায় হলেও লোকসাহিত্যে অতিমাত্রায়। **'মাই ভণজা ও নটুচুরি'**, **'নাবকেলী'**, **'রসকেলী'** ইত্যাদি ওড়িয়া লোকসাহিত্যগুলির মধ্যে কৃষ্ণলীলার মাধ্যমে

সামাজিক অবক্ষয়, নরনারীর ভোগাকাঙ্খা, বিকৃতকামনা বাস্তব রূপে ফুটে উঠেছে। চৈতন্যযুগের পূর্বকালে এই সাহিত্যের উদ্ভব এবং লোকায়ত আঙ্গিকে তার প্রবাহ অদ্যবধি অব্যাহত। মামী-ভাগিনার মিলন বর্ণনায় মুখরিত কবিগণ ফুটিয়ে তুলেছেন অন্ধকার মনের বিশৃঙ্খলাকে।

সমাজবাস্তবতা ঃ

"রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যে এবং পদাবলী সাহিত্যে কবিরা যে মিলন বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে স্পষ্টতই দুটি ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে চৈতন্যপূর্ব যুগের কবিরা যাঁরা আছেন তাঁদের রচনায় রাধাকৃষ্ণ আর কেউ নন তৎকালীন সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ নর-নারী মাত্র। তাই রাধাকৃষ্ণের হৃদয়যন্ত্রণা, কামনা-বাসনা ব্যক্ত করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় কবিরা সমাজ বাস্তবতাকে তুলেছেন, নরনারীর আদিম বাসনাকে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন; আর চৈতন্যোত্তর কবিরা পরবর্তীকালে যারা বৈষ্ণবতত্ত্ব ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের রাধাকৃষ্ণ সেই অর্থে মানবমানবী নন, বরং তাঁরা বৈষ্ণব ভক্তদের আরাধ্যা পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রতীকরূপে কৃষ্ণপ্রেমে বৈষ্ণবতত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন।"[৬]

ভাষা ঃ

'মাই ভণজা ও নটুচুরি' কাব্যটি লৌকিক ওড়িয়া ভাষায় রচিত। লোকসাহিত্য যে কালের প্রবহমান ধারায় বয়ে আসা পরিবর্তনশীল সাহিত্য সুতরাং তার ব্যবহৃত ভাষার মূলরূপ নির্ণয় কঠিন কাজ। ভাষার শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করলে ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের লোকসমাজে উচ্চারিত মৌখিক ভাষাকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মাই = মামীমা, ভণজা = ভাগ্না, নটু = করতাল, মথা = মাথা (মূল ওড়িয়ায় মুণ্ড), মোতে = আমাকে, মিছ = মিথ্যা, সেঠারে = সেখানে, হঁসি হঁসি = হাসতে হাসতে, কাখ = কোল ইত্যাদি শব্দগুলি গ্রামীন মেদিনীপুরের বহুল প্রচলিত শব্দ যেগুলি হীরে-চুনি-পান্নার মতো এই লোকসাহিত্যের অঙ্গজুড়ে খচিত আছে।

ছন্দ ঃ

আগাগোড়া রচনাটি ত্রিপদী ছন্দে লেখা। লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ হওয়ায় ছন্দের মাত্রা

বিন্যাসে ত্রুটী বিচ্যুতি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। মূলত ৬+৬+৮ মাত্রা বিন্যাসে কবি ত্রিপদী ছন্দের চরণ বিন্যাস করেছেন, যেমন —

"রাধিকার স্তন যউবন দেখি ৬ + ৬
কুহন্তি দেব মুরারী। ৮
নটু যোড়ি মোর সাক্ষাতরে দেলু ৬ + ৬
এবে দিয় নটু দড়ি গো।" ৮

(পৃষ্ঠা - ১০)

অলংকার ঃ

বালক কৃষ্ণের কামনার তীব্রতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই কাব্যে মালোপমা অলংকারের ব্যবহার করেছেন কবি। উপমেয় কৃষ্ণের কামনা একাধিক উপমানের দ্বারা উপমিত করা হয়েছে, যেমন —

"শ্রীকৃষ্ণ বোইলে, বালুত বোইলে
মোঠারে নাহি কি রতি।
ছোট সর্পর কি, বিষ জ্বালা নাহি,
ইহা ভাবুছু কি মোতি।।
পুণি পর্বত ক্রোড়ে, ছোট ইন্দুর পথর কাটে
পুণি পর্ব্বত ক্রোড়ে।"

এক্ষেত্রে উপমেয় কৃষ্ণ এবং উপমান ছোট সর্প, ইঁদুর। অর্থাৎ সাপ যতই ছোট হোক তার দংশনে বিষজ্বালা আছে আর ইঁদুর যতই ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ পর্বতের পাথর কেটে ফেলতে সে সক্ষম। সুন্দরভাবে এখানে মালোপমা অলংকার ফুটে উঠেছে। এই কাব্যের ২৩ সংখ্যক স্তবকে আর একটি মালোপমা অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে। রাধার বক্ষবন্ধনীতে লুকানো আছে করতাল। বক্ষবন্ধনী খুলে দেখার জন্য কৃষ্ণ দাবী করে বসে। কৃষ্ণের এই দাবীর মধ্যে কামনা চরিতার্থ করার যে অভীপ্সা লুকিয়ে আছে তা মালোপমা অলংকারের মাধ্যমে এইভাবে ফুটে উঠেছে —

"ভৃঙ্গ জানে কিনা   কুসুমর বাস,

বৈদ্য জানে নাড়ী অন্ত।।

পদ্ম মূলরে,   মণ্ডুকী বসিণ,

সে জানই কি বৃত্তান্ত।।" (পৃষ্ঠা - ৯)

উপমেয় কৃষ্ণ তার উপমান যথাক্রমে ভৃঙ্গ, বৈদ্য, মণ্ডুক। কৃষ্ণের কামনার রসদ যেমন রাধার বস্ত্রাচ্ছাদিত স্তনযুগলে, তেমনই ভৃঙ্গের কামনা কুসুমের সুবাসে, বৈদ্যের পটুত্ব নাড়িজ্ঞানে, ব্যঙের কামনা পদ্মে উপবিষ্ট পোকামাকড় শিকারে নিবিষ্ট থাকে।

খ. জনপ্রিয় পূজা ও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সাহিত্য

গ্রন্থ ১. ত্রিনাথ মেলা, কবি - কবি পরিচিতি অনুপস্থিত ঃ

ওড়িয়া ভাষায় লেখা দেবমাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সাহিত্য **'ত্রিনাথ মেলা'** নামাঙ্কিত রচনাটি পুস্তিকা আকারে নীহার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের বিষয়বস্তুতে ত্রিনাথ অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মহিমা ও অলৌকিক শক্তির কথা বর্ণিত আছে। ভক্তিভাব ও মোক্ষ কামনা এই সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সাহিত্যটি রচিত। আমাদের কাছে পুস্তিকাটির দ্বাত্রিংশ সংস্করণ সংগৃহীত আছে। প্রচ্ছদপত্রে কিংবা মূল রচনায় কবির নাম ও পরিচিতির বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। লোকসাহিত্যে ব্যক্তি প্রতিভার চিহ্ন অনুপস্থিত থাকে। লোকসমাজে দেবমহিমাজ্ঞাপক এই সাহিত্যটি দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকায় স্রষ্টার নামটি কাব্য থেকে মুছে গেছে এবং পরবর্তীকালে এই ওড়িয়া সাহিত্যকে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর করে গেছেন কোন এক অজ্ঞাত লোককবি। **'ত্রিনাথ মেলা'** শীর্ষক পুস্তিকার দ্বাত্রিংশ সংস্করণটি ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"All rights reserved)/ত্রিনাথ মেলা/০০০০০/বীণাবাদনরত শিবের চিত্র/দ্বাত্রিংশ সংস্করণ/কাঁথি নীহার প্রেস হইতে ঁযতীন্দ্রনাথ জানার পুত্র শ্রীনীতিন্দ্রনাথ জানা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত/—ঃ০ঃ—/সন ১৩৯৫ সাল/ মূল্য - ০০৮ টাকা মাত্র।"

(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭গ দ্রষ্টব্য)

প্রচ্ছদপত্রের চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। মাঝখানে বীণাবাদনরত শিবের ছবি। পুস্তিকাটি ১৩ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। প্রচ্ছদপত্র (১), আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র (১), মূলগ্রন্থ (২১), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ মোট ২৪টি পৃষ্ঠা আছে। আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত আছে হংসারূঢ় ব্রহ্মার চিত্র এবং পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে মুদ্রিত আছে একটি পুষ্পস্তবক।

কাব্যের সূচনা অংশটি এইরূপ —

"ত্রিনাথ মেলা

— ০ —

গ্রন্থারম্ভ

শুন সুজন দেই মন।

ত্রিনাথ মেলার আখ্যান।।

শ্রীপুর বোলি এক গ্রামে।

সে গ্রামে থিলা বিপ্রজনে।।"

এইভাবে ২১ সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাব্যকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির শেষাংশ এইরূপ —

"ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেইন।

ভক্তিরে কহই বচন।।

মালপা বাতি শেষ হেলা।

প্রভুঙ্ক মেলাহি সরিলা।।

সম্পূর্ণ হেলা এ আখ্যান।

অন্তরে ভাব নারায়ণ।।"

কবি পরিচিতি ঃ

'ত্রিনাথ মেলা' গ্রন্থটিতে কবি-পরিচিতি অনুপস্থিত কাব্যটির শেষাংশে কোন ভণিতা নেই। কাব্যটি এককালে একক ব্যক্তিপ্রতিভার সৃষ্টি হলেও জনপ্রিয়তার কারণে লোকসাহিত্যের বৃত্তে ঢুকে

পড়ে এবং কালানুক্রমে কবি-পরিচিতি মুছে যায়। ওড়িশার মূল ভূ-খণ্ডে একই কাহিনী নির্ভর **'ত্রিনাথ মেলা'** নামাঙ্কিত ওড়িয়া লিপিতে লিখিত ওড়িয়া ভাষার একটি পুথির ভণিতায় দীন বলরাম নামে এক ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে।

দীন বলরামের ভণিতাযুক্ত **'ত্রিনাথ মেলা'** শীর্ষক ওড়িয়া সাহিত্যে পুথিটি ওড়িশায় মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭ঝ দ্রষ্টব্য)**। এই কাব্যের সমাপ্তিতে **'ভজন'** অংশে ভণিতায় লেখা আছে এইরূপ — **"ভাষে দীন বলরাম, ভজ ত্রিনাথ চরণ, ধ্যানরে হটিব যম মিলিব সুপথ।"** বাংলায় তর্জমা করলে বোঝায় যে, **'দীন বলরাম বলে ত্রিনাথের চরণ ভজনা কর। এই ধ্যানের দ্বারা যম দূরে যাবে এবং জীবনের সুপথ মিলবে।'** কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত আলোচ্য পুস্তিকাটিতে কবি পরিচয়তো দূরের কথা কবির নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। অনুমান এইরূপ করা যায় যে, দীন বলরামের কাব্যটির জনপ্রিয়তা এতখানি ছিল যে, অতীতে মেদিনীপুর জেলার যে অঞ্চলগুলি ওড়িশার ভূখণ্ডে অন্তর্গত ছিল সেই অঞ্চলের লোকসাহিত্যের মধ্যে মৌখিকরূপে **'ত্রিনাথ মেলা'**র কাব্যকাহিনীটি ঢুকে পড়ে যা পরবর্তীকালে স্বল্প শিক্ষিত লোককবির দ্বারা বাংলায় লিপ্যন্তরিত হয়ে পুথির পাতায় এসে যায়। অবশেষে পুথিগুলি নীহার প্রেসের সংগ্রহে এলে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। সুতরাং শিষ্টসাহিত্য ও লোকসাহিত্যের মধ্যে একে অপরের ঘরে (আঙ্গিকে) ঢুকে পড়ার প্রবণতাটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া — যা আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। ওড়িয়া লিপি থেকে বাংলা লিপিতে যাওয়ার জন্য লোকসাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে এই সাহিত্য। এই পথপরিক্রমাটি সময়সাপেক্ষ এবং যাত্রাপথের অভিমুখটি অভিনব —

জনপ্রিয় শিষ্ট ওড়িয়া সাহিত্য (কবিপরিচিতি সহ পুথি)	**>**	**লোকসাহিত্যের বৃত্তে অনুপ্রবেশ (কবিপরিচয়হীন মৌখিক সাহিত্য)**	**>**	**লোককবির দ্বারা বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তরীকরণ (কবি পরিচয়হীন পুথি)**	**>**	**অবশেষে নীহার প্রেসের দ্বারা বাংলা লিপিতে মুদ্রণ ও প্রকাশ (কবিপরিচয়হীন পুস্তিকা)**

সুতরাং ওড়িয়া লিপির সাহিত্যকে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তরীকরণের তাগিদ মেদিনীপুরের মানুষের মধ্যে কেন এল? এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তার একমাত্র কারণ যখন ওড়িশায় ঢুকে থাকা মেদিনীপুরের অংশভাগ বঙ্গপ্রদেশ ফিরে পেল তখন প্রশাসনিকভাবে এই জনজীবনের উপর

বাংলা ভাষাকে আরোপ করা হল। এই অবস্থা কিছুদিন চলার পর তাদের স্মৃতি থেকে ওড়িয়া লিপিবিদ্যা হারিয়ে যায় এবং জায়গা করে নেয় বাংলা লিপি। কিন্তু তাদের আজন্ম লালিত ওড়িয়া সাহিত্যরসের আস্বাদকে ভুলতে পারেনি। সেই সাহিত্য কিছুদিন লোকসাহিত্যরূপে (মৌখিক) অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে এবং পরে স্বল্প শিক্ষিত লোককবির দ্বারা বাংলা লিপিতে (কিছুটা পরিবর্তিতরূপে) লিপ্যন্তরীত হয়। ততক্ষণ ছাপাখানা এসে গেছে। নীহার প্রেস বাংলা লিপির এই ওড়িয়া পুথিগুলিকে সংগ্রহ করে পুস্তিকা রূপে প্রকাশ করে।

আমাদের উপরোক্ত অভিমতটি প্রমানিত হবে যখন ত্রিনাথ সাহিত্যের উদ্ভব, ইতিহাস এবং তার গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হবে। বর্তমান **'ত্রিনাথ মেলা'** কাব্যের কাহিনীবস্তুর বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

কাব্যকাহিনী ঃ

কাব্যটির কাহিনী শুরু হয়েছে এইরূপ— শ্রীপুর নামক একটি গ্রামে এক দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ছিল। এই ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণীর বুকে দুধ না থাকায় শিশুপুত্রকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মায়ের দুধের অভাবে দিনের পর দিন শিশুপুত্রের শরীর ক্ষীণ হতে শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করবার জন্য পরামর্শ দেয়। গরীব ব্রাহ্মণ স্ত্রীর এইরূপ কথা শুনে অবাক হয় এবং বলে যে দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করবার মতো তার সামর্থ্য নেই। এদিকে দুধের অভাবে শিশুর ক্রন্দন থামে না। ব্রাহ্মণী এইরূপ অবস্থা দেখে ঘরের সামান্যতম ধন এবং তামা-কাঁসা যাবতীয় তৈযসপত্রাদি বিক্রয়ের জন্য ব্রাহ্মণকে শ্রীপুরের বাজারে যেতে বলে। সমস্ত বিক্রি করে পাঁচ টাকা মূল্য পায়। ব্রাহ্মণীর পরামর্শক্রমে ব্রাহ্মণ সেই পাঁচ টাকা নিয়ে দুগ্ধবতী গাভী বা **'দোল গাই'** ক্রয়ের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খোঁজখবর নেয়। এক গ্রামে একজন মহাজন তার এক দুষ্টু গাভীর জন্য অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এইরূপ— যে কোন মূল্যে সেই গাভীকে বিক্রয় করে দেবে। মোক্ষম সময়ে ব্রাহ্মণ মহাজনের সামনে উপস্থিত হয় এবং সেই গাভীটিকে ক্রয় করার প্রার্থনা জানায়। রাগের বশে মহাজন গাভী বিক্রয়ের কথা মুখে আনলেও এখন সে বিক্রি করতে চায়না— এইরূপ কথা ব্রাহ্মণকে জানাতে গেলে ব্রাহ্মণ ইতিপূর্বে প্রতিজ্ঞার কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে পাঁচ টাকা মূল্যে মহাজন তার গাভীকে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেয়। কয়েকদিন যাওয়ার পর ব্রাহ্মণের গাভীটি হারিয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে

আসে কিন্তু ব্রাহ্মণ তার গাভীকে খুঁজে পায় না। গাভী খুঁজতে গিয়ে ব্রাহ্মণ কিছুটা দূরে এক বটগাছে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে একত্রে অবস্থান করতে দেখে। ত্রিনাথ দেবতা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে জানতে চায় যে, ব্রাহ্মণ কোথায় গমন করছে। গাভী হারানোর কথা ব্রাহ্মণ ত্রিনাথ দেবতাকে সবিস্তারে জানায়। ব্রাহ্মণ বলে সে শ্রীপুর হাটের দিকে যাচ্ছে, কারণ চোর যদি তার গাভীকে শ্রীপুর হাটে বিক্রয় করতে আসে তাহলে গাভীকে উদ্ধার করতে পারবে। এই কথা শুনে ত্রিনাথ দেব ব্রাহ্মণকে কয়েকটি সামগ্রী শ্রীপুর হাট থেকে সওদা অর্থাৎ ক্রয় করতে বলেন। ব্রাহ্মণ বলে সওদা করার জন্য তার কাছে কোন অর্থ নেই। ত্রিনাথ পরামর্শ দেন যে, দূরের যে মাটির ঢিবি দেখা যাচ্ছে সেটা ভাঙলে পয়সা পাওয়া যাবে। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ ঢিবি ভেঙে তিনটি পয়সা পায়। লোভে আরও কিছু পাওয়ার জন্য ঢিবি ভাঙতে যায় কিন্তু আর কোন পয়সা না পেয়ে ত্রিনাথের দিকে তাকায়। ত্রিনাথ বলেন— লোভ সম্বরণ করতে। যাইহোক সেই তিনটে পয়সা নিয়ে ব্রাহ্মণ শ্রীপুর হাটের দিকে রওনা দেয়।

মেলানির সামগ্রী ক্রয় করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেববলে বলীয়ান হয়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটায় যা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কবি। সওদার সামগ্রী হল এক পয়সার গাঁজা, এক পয়সার পান সুপারী এবং অবশিষ্ট এক পয়সার তেল। ব্রাহ্মণ তেল সংগ্রহের জন্য ভাঁড় নিতে ভুলে যায়। ফিরে এসে ত্রিনাথদেবকে তেলের ভাঁড় চাইতে গেলে ত্রিনাথ পরামর্শ দেন যে, গামছায় তেল ধরে আনতে। গামছায় তেল আনা এক অসম্ভব ব্যাপার। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তেল হাটে তেল ক্রয় করতে চাইলে তেলি তার তেল বিক্রি করতে অসম্মত হন। কারণ কারোর পক্ষে এইরূপ গামছায় করে তেল বিক্রি করা অসম্ভব। তেলিরা ব্রাহ্মণকে পাগল বলে হাসাহাসি করতে থাকে। এক বৃদ্ধ তেলি ব্রাহ্মণকে বোকা মনে করে ঠকিয়ে পয়সা নেওয়ার ধান্দা করে। তেলের নলটি গামছার কোণায় রেখে তেল ঢালতে থাকে এবং গামছা চুঁইয়ে তেল পুনরায় তেলির হাঁড়িতে পড়ে। বুড়ো তেলি তেল ঢালা শেষ করে ব্রাহ্মণকে বলে পয়সা দিতে। ব্রাহ্মণ পয়সা দিয়ে গামছা নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বুড়ো তেলি দেখে তার হাঁড়িতে বিন্দুমাত্র তেল নেই। অবাক হয়ে যায় এবং ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়ে। বুড়ো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে এবং পাশাপাশি দোকানদারের কাছে ব্রাহ্মণের তেল ক্রয়ের ঘটনার কথা বলে ফেলে। সকলে ছুটে গিয়ে ব্রাহ্মণকে ধরে আনে। ব্রাহ্মণ তেলে সিক্ত গামছার প্রান্তটি বুড়ো তেলির হাঁড়িতে নিংড়ে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ তেলির হাঁড়ি তেলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কবি বললেন—

"ভাণ্ডর তেল দেলা ঢালি।

তক্ষণে পড়িলা উছলি।।

দেখিন তেলি যে আনন্দ।

মুখ তা পূর্ণিমার চান্দ।।" (পৃষ্ঠা - ৮)

বঙ্গানুবাদ :

ভাণ্ডেতে তৈল দিলা ঢালি।

তক্ষণে পড়িলা উছলি।।

বুড়া পাই মনে আনন্দ।

মুখ হইল পূর্ণচান্দ।।

পুনরায় সঠিক ভাবে তেলি ব্রাহ্মণকে তেল মেপে দেওয়ার পর ব্রাহ্মণ গাছের গোড়ায় ত্রিনাথ দেবের কাছে উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মিলে ত্রিনাথ মেলা প্রদানের জন্য ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দেয় এবং মেলা বা মেলানির পদ্ধতি বলে দেয়। পদ্ধতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ ত্রিনাথ দেবতার মেলানি প্রদান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের মনস্কামনা পূর্ণ হয় অর্থাৎ হারানো গাভী ফিরে পায়। ত্রিনাথ মেলায় সামিল হয় রাজ্যের সাধারণ প্রজা। এই মেলা প্রদানের ফলে প্রত্যেকের নিজ নিজ মনস্কামনা পূরিত হয়। গরীব হয়ে ওঠে ধনবান, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, শ্রবণ ক্ষমতা ফিরে পায় বধির। খোঁড়া হাঁটতে শুরু করে, রুগ্ন হয়ে ওঠে সুস্থ। এই সকল অলৌকিক ঘটনা দেখে পরশ্রীকাতর দুইজন সদাগর রাজার কাছে নালিশ করে। **'ত্রিনাথ মেলা'** সম্পর্কে রাজা জ্ঞাত হন। রাজমর্যাদা লাঘব হবে, ধনী-দরিদ্র সমান হয়ে যাবে, রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে– এইরূপ নালিশ রাজার কাছে দুইজন সদাগর রাখলে রাজা ব্রাহ্মণকে ধরে আনবার জন্য আদেশ দেন। রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে রাজা তাকে ত্রিনাথ মেলানি দিতে বারণ করেন। এরপর যে ব্যক্তি ত্রিনাথ মেলানি প্রদান করবে তার কঠিন শাস্তি হবে– এইরূপ নির্দেশ দিলেন রাজা। এইরূপ দণ্ডাজ্ঞার কারণে রাজার বড় ছেলের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ত্রিনাথ দেবতা সবকিছু বিচার করে রাজার পুত্রকে বাঁচিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেন, কারণ ত্রিনাথ দেবতার মাহাত্ম্য শ্রীপুর রাজ্যে প্রচারিত হবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে ত্রিনাথ দেবতা রাজাকে মেলানি প্রদানের জন্য পরামর্শ দিলেন এবং রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পাবে একথাও বললেন। রাজা যথারীতি ত্রিনাথ মেলানি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র প্রাণ ফিরে

পায়। সেদিন থেকে শ্রীপুর রাজ্যে ত্রিনাথ মেলার প্রচার হয়। রাজা রাজ্যবাসীকে নির্দেশ দেন ত্রিনাথ মেলা প্রদানের জন্য।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

'ত্রিনাথ' শব্দটির মাধ্যমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্রে সমাহিত তিনজন দেবতাকে বোঝানো হয়েছে। **'মেলা'** শব্দটিকে প্রচলিত বাংলা অর্থে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি। যেহেতু এটি ওড়িয়া রচনা সুতরাং আভিধানিক ভাবে এই ওড়িয়া শব্দাটির অর্থ **'অর্ঘ্যদান'**। দেবতার নিমিত্তে নানান উপাচারে পূজা ও নৈবেদ্য প্রদান। মনস্কামনা পূরণের জন্য দেবতার চরণে পূজার্ঘ্য নিবেদন। ওড়িয়া **'মেলা'** শব্দটির সঙ্গে বাংলা **'মেলানি'** শব্দের অর্থগত সামঞ্জস্য রয়েছে। **'মেলানি'** একটি বিশেষ্য পদ (মেলন + ই) যার অর্থ **'মেলন সম্বন্ধী'** অর্থাৎ কুটুম্বাদির সহিত মিলনে (সাক্ষাৎকারে) প্রদেয় সামগ্রী সম্ভার রূপ সামাজিক উপহার বিশেষ।[৭] অপর অর্থ আলিঙ্গনপাদবন্দনসম্ভাষণাদি সামাজিক শিষ্টাচার।[৮] আমার এই আলোচ্য **'ত্রিনাথ মেলা'** এবং **'পঞ্চানন মেলা'** পুস্তিকা দুটিতে উল্লিখিত দেবতাগণের নিমিত্তে নানান উপাচারে পূজার্ঘ্য নিবেদনের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ওড়িয়া **'মেলা'** শব্দটি বাংলা শব্দ **'মেলানি'**-র প্রতিশব্দ একথা মেনে নেওয়া যায়। **'ত্রিনাথ মেলা'**র পয়ারের একটি অংশে **'মেলানি'** শব্দের উল্লেখ আছে যেমন — ***'এমন্ত সেহি প্রতিদিন। মেলানি সারি যাএ পুর্ণ।।'*** (ত্রিনাথ মেলা, পৃষ্ঠা - ১৯)।

প্রথমে **'ত্রিনাথ মেলা'** নামক দেবমহিমা বা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গ্রন্থটির সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে। আমাদের কাছে সংগৃহীত **'ত্রিনাথ মেলা'** নামক পুস্তিকাটি দ্বাত্রিংশ সংস্করণের রূপ। এর দ্বারা বোঝা যায় গ্রন্থটি বহুল প্রচলিত এবং অধিক সমাদৃত। জনপ্রিয়তার বিচারে এই আখ্যানধর্মী দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যটির গুরুত্ব ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

ত্রিনাথ লৌকিক দেবতা কিনা সে সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদদের ভাবনাচিন্তা নানাবিধ। **''কারো মতে ইনি মহাদেবের ভিন্নরূপ; কারো মতে তিনি অথিশ্বর, কারো মতে নাথ সম্প্রদায়ের তিনজন সিদ্ধা পুরুষ।''**[৯] অন্যদিকে ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য **'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'** পত্রিকায় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন — **''এই পূজা প্রায় ৩০/৪০ বর্ষ মাত্র বঙ্গের জেলা বিশেষে প্রচলিত**

হইয়াছে। ইহাকে সাধারণত ত্রিনাথ পূজা কহে। ত্রিনাথ বলিলে আমরা সাধারণত তিনের নাথ এই অর্থে বুঝি এবং ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেব প্রধানের সমবেত নামকে ত্রিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থান বিশেষে এই ত্রিনাথ পূজাকে ত্রিনাথ মেলাও কহে। বস্তুতঃ বর্তমানপ্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মূলে কিন্তু 'ত্রিত্ব' জ্ঞানের কৌশল-সূত্রে মণি গ্রন্থনের ন্যায় সমস্তই গাঁথা। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই তিন লইয়া কীর্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত।"[১০]

তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই পূজার পদ্ধতি বা বিধান শাস্ত্রীয় বিধান নয়। লৌকিক বিধানে এই দেবতার পূজা করা হয়। অন্যান্য প্রাচীন ধর্মমত ও পূজা পদ্ধতির ন্যায় তিন নাথের সেবা বা মেলা অর্থাৎ ভজনগান বংশপরম্পরায় লোকমুখে গীত বা প্রচারিত হয়ে আসছে। প্রাচীন কাল থেকেই তিন নাথের পূজা চলে আসছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তিন নাথের কৃপায় হলাহলের জ্বালা দূর হয়, অমঙ্গল দূর হয়, আগেও জনগণের বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরার সবকটি স্থানে এই ত্রিনাথ মেলা লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে সুজিত কুমার বিশ্বাস '**বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ**' গ্রন্থে বলেছেন —

> **''ত্রিনাথ ঠাকুরের পূজা পূর্ববাংলার গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা জেলায় কৃষকেরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতে ত্রিনাথের মেলায় অংশ নিত। বর্তমানে ২৪ পরগণা, নদীয়া বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুরে এই গানের প্রচলন আছে।"[১১]**

মেদিনীপুর জেলায় ত্রিনাথ মেলার প্রচলন এককালে ব্যাপকহারে ছিল একথা উপরোক্ত অভিমতে ব্যক্ত হয়নি। আমাদের আলোচ্য '**ত্রিনাথ মেলা**' পুস্তিকাটির মধ্যে উল্লিখিত ত্রিনাথের স্বরূপ এবং তার পূজা-পদ্ধতি ও বিধি-বিধানের সঙ্গে সমগ্র বাংলার ত্রিনাথ মেলার সামঞ্জস্য চোখে পড়ে। যেহেতু কাব্যটি ওড়িয়ায় লিখিত সেই হেতু ওড়িশায় '**ত্রিনাথ মেলা**'র প্রচলন ছিল এবং তৎসন্নিহিত বাংলায় অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার গ্রামগুলিতে এই পূজার প্রচলন ছিল।

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট যে এই দেবতা শাস্ত্রীয় দেবতা নয়, এই তিন নাথ বা তিনজন দেবতা হলেন নাথপন্থীদের পূজিত দেবতা। ''**আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ — এই তিন নাথই শ্রেষ্ঠ।**

দেশে এই নাথ ত্রয়ের পূজা প্রচলিত প্রাচীন কালেই ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে। এই পূজার নাম তিন নাথের মেলা।"[১২] ভারতীয় সংস্কৃতিতে নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ ও দর্শনের প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আক্রমণে শুধুমাত্র লৌকিক ধর্মাচারে ঠাঁই পেয়েছে। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিলেন আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ - এই তিন দেবতা। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে এই দেবতাদের উপর সাধারণ মানুষের ভরসা ছিল অগাধ। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, সন্ধ্যায় ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে বাড়ির সকলে মিলে আদিনাথ, মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের অর্থাৎ এই তিন মহাসিদ্ধা যোগীর মাহাত্ম্যগান পাঁচালীর সুরে পাঠ করলে সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা দূরে যায়, সুখ ও শান্তি ফিরে আসে, রোগমুক্তি হয়। **''পূর্ববঙ্গে কোনো বট বা অশ্বত্থ গাছের তলায় পান, সুপারি এবং গাঁজা দিয়ে ত্রিনাথের সেবা দেওয়া হয়। এর পূজার ফলে অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব, গলগন্ড ইত্যাদি রোগ দূর হয়। এর কৃপায় হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়।"**[১৩] অন্যান্য লৌকিক দেবতার মতো এই দেবতার পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান লোকমুখে গীত ও প্রচারিত হয়ে আসছে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারেনা। ত্রিনাথ মেলার কবিগণ স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। **''এই ত্রিনাথ পূজার মন্ত্র এবং অন্যবিধ উপাসনা পদ্ধতি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অমার্জিত হৃদয়ের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে সকল চরিত্রহীন কৃষক যুবক পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের শাসনভয়ে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারা এই ত্রিনাথ পূজায় বা মেলায় একটি প্রকাণ্ড গঞ্জিকাসেবনের দল গঠন করিয়া গৃহস্থদিগের আঙ্গিনায় সর্বসমক্ষে গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার করিয়া দেয়। ত্বরিতানন্দদায়ক গঞ্জিকা তখন অনবরত তাহাদের মুখ দিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বগীতি বাহির করিতে থাকে।"**[১৪]

ত্রিনাথ মেলার মাহাত্মজ্ঞাপক গানের বিরুদ্ধে প্রাবন্ধিক ভাব ও ভাষা নিয়ে যে রুচিবোধের অভিযোগ তুলেছেন তা সর্বাংশে সত্য নয়। পূর্ববঙ্গে **'ত্রিনাথ মেলা'** সাহিত্যে এই অশ্লীলতা থাকলেও ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরে প্রচলিত ওড়িয়া ভাষায় ত্রিনাথ সাহিত্যে ত্রিনাথ ভক্তের শুচিশুদ্ধ দেহমনের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ নাথপন্থী সাহিত্যের পবিত্র সাধনার ধারাটি লৌকিক উপাসনার স্তরে নেমে এসেও তার পবিত্রতার বৈশিষ্ট্যটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। **'ত্রিনাথ মেলা'** কাব্যে কবি শুদ্ধাচারের কথাটি বারম্বার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এইভাবে —

"ত্রিনাথ বোলন্তি উত্তর।
শুন ব্রাহ্মণ দ্বিজবর।।
দ্রব্য যে ন লাগে বহুত।
কেবল ভক্তিভাব চিত্ত।।" (পৃষ্ঠা - ৯)

ত্রিনাথ মেলার পূজাপদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে **'আনন্দবাজার পত্রিকা'**য় একটি প্রতিবেদনে ত্রিনাথ-ভক্তের শুদ্ধাচারী মনের কথাটা স্বীকার করলেও পুরোহিত ছাড়া ত্রিনাথ পূজার উল্লেখ আছে এইরূপ —

"তিন নাথের মেলায় তিন নাথের পাঁচালী পাঠ করিতে বা তিন নাথের অর্চনা করিতে পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। যে কেহ শুচিশুদ্ধ দেহ মনে ত্রিনাথের অর্চনা করিতে পারেন। দেবতার পূজার ক্ষেত্রে এইরূপ সার্ব্বজনীন অধিকার নাথধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত তিন নাথের মেলায় নাথত্রয় নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক গুরু আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর কেহ নহে। নাথগুরুগণ যে একদা দেশের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা উক্তধর্মের ধ্বংসাবশেষ বাংলার তিন নাথের পূজা হইতে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে।"[১৫]

ত্রিনাথের পূজা-পাঠে ব্রাহ্মণের আধিপত্যহীনতার কথা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আলোচ্য **'ত্রিনাথ মেলা'** পুস্তিকার কাহিনীতে ব্রাহ্মণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা আছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত এই পূজায় পৌরহিত্য করার অধিকার কারোর নেই। তাই পূজা শেষে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দানের কথা আছে **'ত্রিনাথ মেলা'** কাব্যটিতে —

"মেলারে যেতে দ্রব্যমান।
সমস্ত কলা আয়োজন।।
আনন্দে মেলা সমর্পিলে।
প্রভুঙ্ক নমস্কার কলে।

ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেইন।

ভক্তিরে কহই বচন।।" (পৃষ্ঠা - ২১)

আবার কাব্যের অন্যত্র দেখি ত্রিনাথ দেবতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে ভক্তের সম্মুখীন হয়ে বরদান করছেন বা মনোবাঞ্ছা পূরণ করছেন।

"এতে বোলিণ তিন জন

হোইলে উত্তম ব্রাহ্মণ।।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপ হোই।

মিলিলে ত্রিনাথ গোশাঁই।।" (পৃষ্ঠা - ১৩)

এছাড়া এই দেবতা সমাজের নিম্নবর্ণের আরাধ্য বলে কোন কোন গবেষক বলে থাকেন। '**সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা**'য় মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য লিখেছেন —

> **"অদ্যপিও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজে এই ত্রিনাথ মেলা প্রচলিত আছে। এখনও অনেকাংশে নমঃশূদ্র, মালো, জালিয়া, তাঁতি, কাপালি, রজক প্রভৃতি জাতিতে এই পূজার প্রবল প্রাধান্য আছে।"**[১৬]

আলোচ্য '**ত্রিনাথ মেলা**' কাব্যের বিষয়বস্তু সমাজের নিম্নবর্গ মানুষের আরাধ্যাদেবতা রূপে ত্রিনাথ পূজিত হতে দেখা যায়না। বিত্তবান, রাজা, জমিদার বা ধনবান বণিককে ত্রিনাথ পূজা করতে দেখি। অন্ধ, বধির, পঙ্গু ও অন্যান্য সাধারণ মানুষের ভক্তিতে ত্রিনাথ বিগলিত হলেও তাঁর আকাঙ্খা জমিদার, রাজা ও বিত্তবান বণিকের হাত থেকে '**মেলানি**' বা পূজা গ্রহণ করা। সুতরাং সারা বাংলাদেশের ত্রিনাথ ধর্মীয় সংস্কৃতিতে যেভাবে লোকায়ত জীবনকে লক্ষ্য করি এই কাব্যে তা নেই। উপরন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব এবং গুরুত্ব অবধারিত। লৌকিক স্তরে এই দেবতারা পূজিত হলেও একটি উচ্চবর্ণীয় ও ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে থেকেছে। আলোচ্য কাব্যে প্রতিফলিত লোকসমাজ ও লোকধর্মের প্রকৃত সময় ঠিক কোন সময় এর উত্তরে বলা যায় — যখন নাথধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ও তথাকথিত উচ্চবর্গের আধিপত্য চেপে বসছে, ওড়িশা ও তৎসংলগ্ন বৌদ্ধ সাধনার উপর কিংবা নাথপন্থী যোগীদের ধর্মসাধনার উপর ব্রাহ্মণ্যশাসন কায়েম হচ্ছে ঠিক সেই সময় তার প্রতিফলন ত্রিনাথ মেলার সাহিত্যচর্চার উপর পড়েছে।

নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই উপরোক্ত সত্যটাই উঠে আসে। নাথদের সমাজে অবজ্ঞা ও অপমান করা এবং তাদের মঠ-মন্দির দখল করার ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। মদ্যপ ও স্বেচ্ছাচারী বল্লালসেন যখন রাজা তার চক্রান্তে নাথপন্থীদের মঠ ও মন্দির থেকে উচ্ছেদ করে এবং মঠ ও মন্দির দখল করে। অধিকাংশ নির্ধন ও নিঃস্বার্থ মানুষেরা সেদিন নাথপন্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে কুচক্রী নব্যব্রাহ্মণদের কুপরামর্শে ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারান্ধ বল্লালসেন নাথ সম্প্রদায়কে পতিত বলে ঘোষণা করলেন। বল্লালসেন পরবর্তী নাথযোগীরা নগর থেকে বিতাড়িত হয়ে রাজরোষের ভয়ে গ্রামীণ ও প্রান্তিক লোকজীবনে ধর্মাচারণ করতে থাকলেন। লোকজীবন এই ধর্মমতকে পথ ও পাথেয় করে নাথধর্ম গ্রহণ করেন এবং আদিনাথ, মীননাথ ও গোরক্ষনাথের মহিমাজ্ঞাপক সাহিত্য রচনা করতে থাকেন। নাথযোগীদের এই জনপ্রিয়তার বিষয়টি স্বার্থপর, পরধর্ম বিদ্বেষী, সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী উচ্চবিত্ত মানুষেরা ভালো চোখে দেখেননি। তারা তিন নাথের পূজায় নাথদের নাম পরিবর্তন করে নিজেদের উপাস্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নামে চালিয়ে দেয়। তিন নাথের পরিবর্তে প্রচলিত হল **'ত্রিনাথ'**। নাথদের মঠ ও মন্দিরে স্থাপিত হল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি। এই সুযোগে ব্রাহ্মণেরা গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে ঠকিয়ে দক্ষিণা আদায় ও আনুগত্য আদায় করতে থাকলো। ব্রাহ্মণেরা বোঝাতে থাকলো ত্রিনাথ আসলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং যদি এই আনুগত্য না মানে তাহলে নরকের পথ দেখতে হবে। এইভাবে একটি লৌকিক ধর্মাচারের উপর আরোপিত হল ব্রাহ্মণ্যপুষ্ট আর্যীকরণ প্রক্রিয়া। লোসমাজের সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরাও এই ত্রিনাথ উপাসনায় আসতে বাধ্য হন ব্রাহ্মণের রক্তচক্ষুর ভয়ে। নাথসাহিত্য তথা **'ত্রিনাথ মেলা'**য় প্রতিফলিত হয় সেই চিত্র। রাজরোষের ও ব্রাহ্মণের ভয়ে তাই কবি লিখলেন —

"দ্বিজ ডাকিণ আণিব।
মেলা স্থানরে বসাইব।।
ব্রাহ্মণ কহিব যে কথা।
শুনি খণ্ডিব ভব ব্যথা।।" (পৃষ্ঠা - ৯)

নাথপন্থা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘাতময় এই ধর্মীয়জীবনের আস্বাদ্য সাহিত্য হল বাংলা লিপিতে ওড়িয়া ভাষায় রচিত **'ত্রিনাথ মেলা'** কাব্যটি।

সাহিত্যমূল্য ঃ

বাংলাদেশে প্রচলিত ত্রিনাথ মেলার রচনাগুলিতে অশ্লীল ও স্থূলরুচির কাব্যভাষা থাকলেও আলোচ্য কাব্যে তা একেবারে অনুপস্থিত। মোক্ষলাভ এবং আরাধ্যদেবতার স্পর্শলাভের জন্য ভক্তগণ কাতর। মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য তার '**নিরক্ষর কবি**' ও '**গ্রাম্য কবিতা**' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত ত্রিনাথ সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

> **"এইরূপ ভাবের গীতি, শ্লোক, ছড়া এবং কবিত্বময় উপকথা এই ত্রিনাথ পূজায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যে সব মায়ে তাড়ানে, বাপে খেদানে উচ্ছৃঙ্খল যুবক এই ত্রিনাথভক্ত, তাহারা ঠাকুরের ভক্তিতে যতটা ভক্তিযুক্ত না হউক, শ্রীগঞ্জিকার লোভে অতিরিক্ত ভক্ত। রামাই ফকিরের গলায় একদিন একটি গণ্ডগ্রামের কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে গিয়া ত্রিনাথ পূজোয় গান শুনিয়াছিলাম। রামাই ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম-লেখাপড়া জান। উত্তরে শুনিলাম— তাহা হইলে আমি মধুসূদন দত্ত হইতাম।"**[১৭]

পূর্ববঙ্গের ত্রিনাথ সাহিত্য সম্পর্কে এই দৃষ্টান্ত বাস্তব হলেও ওড়িশা কিংবা তৎসংলগ্ন মেদিনীপুরে প্রচলিত ওড়িয়া ভাষায় '**ত্রিনাথ মেলা**'র রসবস্তু অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়। '**নবাক্ষরী**' ছন্দে অর্থাৎ ওড়িয়া সাহিত্যে প্রচলিত নয়টি অক্ষর বিশিষ্ট চরণ সজ্জায় কবি আগাগোড়া দৈবী পরিমণ্ডল ও অলৌকিক পরিবেশকে ধরে রেখেছেন। ভক্তের আকূতি ও আর্তনাদ এবং ত্রিনাথের আশীর্বাদ সব নিয়ে একটি ভক্তিরসের ধারা কাব্যের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বহমান আছে। পশ্চিমবাংলার ত্রিনাথ সাহিত্য, গান, শ্লোক, ছড়া ইত্যাদি রূপে পাওয়া গেলেও এই কাব্যটি ব্রতকথাধর্মী পাঁচালী রূপে রচিত। পাঁচালী হলেও পাঠক সুরসংযোজন করে একটি ভক্তিবিহ্বল গীতিময় পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

ছন্দ ঃ

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলরাম দাস এবং জগন্নাথ দাসের '**নবাক্ষরী**' ছন্দের প্রয়োগ আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। মূলত পাঁচালী সাহিত্যে পয়ার ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নানাবিধ ছন্দের

বৈচিত্র্য থাকেনা। এই কাব্যেও পুরোপুরি **'নবাক্ষরী'** ছন্দে রচিত, যেমন —

> **"শুন সুজনে দেই মন।**
> **ত্রিনাথ মেলার আখ্যান।।**
> **শ্রীপুর বোলি এ গ্রামে।**
> **সে গ্রামে থিলা বিপ্রজনে।।" (পৃষ্ঠা - ১)**

অলংকার ঃ

অলংকারের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। স্বতস্ফূর্তভাবে সহজ-সরল রেখায় কাব্যকাহিনীকে কবি পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রযত্ননির্ভর অলংর আরোপ করে উঠতে পারেন নি।

ভাষা ঃ

'ত্রিনাথ মেলা' কাব্যটির ভাষা ওড়িয়া। এই ভাষার মধ্যে উত্তরা ওড়িয়ার উপভাষার লক্ষণ আছে। এছাড়া এই কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ ওড়িশা প্রান্তবর্তী মানুষের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, শব্দগুলি হল — দোলগাই = দুগ্ধবতী গাভী, তম্ভা = তামা, কঁসা = কাঁসা, টঙ্কা = টাকা, বাছুরী = বাছুর, মালপা = তেল, বেনা বুদা = মাটির ঢিবি, লুগা = কাপড়/শাড়ি, কানি = কাপড়ের প্রান্তভাগ, গোটিয়ে = একটি, বাট = পথ, পর্জা = প্রজা, মাঝিমানে = মাঝিরা, অণ্ডালি = আন্দাজে ধরে ফেলা, গোড়রে = পায়ে ইত্যাদি। আবার চরুছি = চরছে, লেবু = নেবে, ঘেনি = গ্রহণ করে, পচারিলা = জিজ্ঞাসিল, যাইছি = গিয়েছে ইত্যাদি ক্রিয়াপদগুলো এই অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গ্রন্থ ২. পঞ্চানন মেলা, কবি পরিচিতি অনুপস্থিত ঃ

ওড়িয়া ভাষায় রচিত পঞ্চানন দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক একটি রচনা **'পঞ্চানন মেলা'**। পুস্তিকা আকারে কাব্যটি প্রকাশ করে নীহার প্রেস। লৌকিক দেবতা পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দের অলৌকিক মহিমার কথা লেখা আছে এই কাব্যে। পঞ্চাননের মাহাত্ম্যপ্রচার এই কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দীনার্ত ও অসহায় মানুষের সহায়ক রূপে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পঞ্চানন। সন্তানের আরোগ্য কামনার জন্যও পূজিত হচ্ছেন এই লোকদেবতা।

আমাদের কাছে এই পুস্তিকাটির নবম সংস্করণ সংগৃহীত হয়েছে। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রে কিংবা রচনাংশে কবি পরিচিতি নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র কাব্যের শেষাংশে একটিবার উল্লেখ আছে 'অর্জ্জুন' নামে এক রচয়িতার নাম। এই অর্জুনের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

'পঞ্চানন মেলা' শীর্ষক পুস্তিকাটির নবম সংস্করণ ১৩৯৫ সালে অর্থাৎ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির প্রচ্ছদপত্রের বিবরণ এইরূপ—

> **"(All rights reserved)/পঞ্চানন মেলা/উপবিষ্ট শিবের চিত্র/নবম সংস্করণ/**
> **কাঁথি নীহার প্রেস হইতে শ্রী যতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত/—ঃ০ঃ—/**
> **সন ১৩৯৫ সাল।/মূল্য - ৩.০০ তিন টাকা মাত্র।"**
>
> **(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭ঘ দ্রষ্টব্য)**

প্রচ্ছদপত্রের চারিপাশে পুষ্প চিহ্নের অলংকরণ করা হয়েছে। মাঝখানে উপবিষ্ট শিবের চিত্র। পুস্তিকাটি ১৩ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। প্রচ্ছদপত্র (১), আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র (১), মূল কাব্যাংশ (১৭), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ সাকূল্যে ২০টি পৃষ্ঠা আছে। আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র এবং পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে পুষ্প অঙ্কিত আছে।

কাব্যটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"পঞ্চানন মেলা

— ০ —

বন্দই পার্ব্বতী নন্দন।

অশেষ দুরতি নাশন।।

দেবঙ্ক অগ্রে পূজা তোর।

নমই তুম্ভর পয়র।।

জয় হে আখণ্ডল মণি।

পার্ব্বতী পতি শূলপাণি।।"

এইভাবে ১৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত কাব্যকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির শেষাংশ এইরূপ —

"এ গীত হোইলা সম্পূর্ণ।
আনন্দে বোল পঞ্চানন।।
তিনিশ তেইল পদেণ।
এহু সম্পূর্ণ হেলা পূর্ণ।।
জনা এ মূঢ় যে গণেশ।
সহায় হুঅ উমাঈশ।।
মুছি অজ্ঞান মূঢ় জন।
তো পাদে পশিলি শরণ।।
সমাপ্ত"

কবি-পরিচিতিঃ

'পঞ্চানন মেলা' পুস্তিকাটি পঞ্চানন অর্থাৎ শিবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিষয় নিয়ে রচিত। রচনাটির কবি পরিচিতি অংশ কিছুই নেই। যার ফলে **'পঞ্চানন মেলা'** রচনাটির রচয়িতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। **'নবাক্ষরী'** ছন্দে রচিত এই পাঁচালীর শেষাংশে কবি নিজের নাম উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

"ভক্তঙ্ক দুঃখ খণ্ডিবাকু।
মেলা প্রচার করিবাকু।।
আজ্ঞা যে অর্জ্জুন দেই।
অন্তর হেলে উমাসাঁই।।" (পৃষ্ঠা - ১৭)

জানা গেল পঞ্চাননের মাহাত্ম্য প্রচারের আজ্ঞাদান করলেন উমাসাঁই অর্থাৎ উমেশ (শিব)। কবি অর্জুনকে প্রচারের আজ্ঞা অর্থাৎ আদেশ করলেন। এক ঝলকে এক্ষেত্রে অর্জুন নামে একজন ব্যক্তি যে এই কাব্যের রচয়িতা উপরোক্ত ছত্র থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কবি পরিচিতিতে কবির পরিচয়

সম্পর্কে অন্য কোন তথ্য সাহিত্যটিতে পাওয়া গেলে কবি অর্জুনের ব্যক্তি পরিচয় ও কবি পরিচয় নির্দিষ্ট করা যেত। প্রাপ্ত পুস্তিকায় এইরূপ স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে **'পঞ্চানন মেলা'** শীর্ষক একটি পুঁথি পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে ওড়িশায় প্রচলিত পঞ্চানন মেলার কাহিনীগত সামঞ্জস্য আছে। কবি গোবর্দ্ধনের রচিত পঞ্চানন মেলার পুথি ওড়িশার গ্রামাঞ্চলে পঠিত হয়। গোবর্দ্ধনের নামাঙ্কিত রচনার সঙ্গে অর্জ্জুন নামাঙ্কিত আলোচ্য **'ত্রিনাথ মেলা'**য় কাহিনীর হুবহু মিল আছে। এছাড়া পঞ্চানন মেলার বিভিন্ন আখ্যান নির্ভর নানান কবির রচনা ওড়িশার লৌকিক ধর্মাচারের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং কবি পরিচিতি নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। **'ত্রিনাথ মেলা'** কাব্যের কবি পরিচিতির ক্ষেত্রে যে ধারনা পোষণ করা হয়েছে এই কাব্যের ক্ষেত্রেও একই মত পোষণ করা যায়। বক্তব্য এই যে **'ত্রিনাথ মেলা'** ও **'পঞ্চানন মেলা'**র মতো কাব্যগুলি একটি সময় বিশেষ কোন কবির দ্বারা সৃষ্ট হলেও জনপ্রিয়তার কারণে লোকসাহিত্যের বৃত্তে ঢুকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে কবিপরিচিতি মুছে যায়। হয়ে ওঠে একটি সমাজের স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর মৌখিক ধারার সাহিত্য। এই পরম্পরায় নানান লোককবির স্পর্শে আখ্যান এবং শিল্পশৈলীর পরিবর্তনও ঘটতে থাকে। ফলে পঞ্চানন মেলার কবি গোবর্দ্ধন নাকি অর্জুন -এ নিয়ে ধন্দ সৃষ্টি হয়। সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের লোকধর্মে পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দের যে লৌকিক ধর্মাচার আগে থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে তার মহিমাজ্ঞাপক পাঁচালী রূপে এই মৌখিক ধারার সাহিত্য সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সংযুক্তিকরণ মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র পঞ্চানন পূজার সাথে ঘটেনি, ঘটেছে শুধুমাত্র ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরের পঞ্চানন পূজার সাথে। কারণ মেদিনীপুরের পূর্বাংশে লোকদেবতা পঞ্চানন্দ বা পঞ্চাননের পূজা ও মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালীর ব্যাপক প্রচলন আছে। গ্রামদেবী শীতলা ও মনসার সঙ্গে এই দেবতার পূজা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানা এলাকার কুলহণ্ডা, জশাড়, শালুকা, নগুড়িয়া, মাছিনান, পূর্বমানিকা, পশ্চিম মানিকা প্রভৃতি স্থানে পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ দেবতার পূজার প্রচলন আছে। এই এলাকায় কবি দয়ারাম দাস রচিত **'পঞ্চানন্দের গান'** কাব্যটি পাঁচালী রূপে গীত হয়ে আসছে। সুতরাং মেদিনীপুরে পঞ্চানন্দের পূজা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার মতো অনেক আগে থেকে প্রচলিত ছিল। মহিমাজ্ঞাপক সাহিত্যগুলি এই জেলার অন্যত্র বাংলা ভাষায় রচিত হলেও ওড়িশা সংলগ্ন মেদিনীপুরের লোকধর্মে অর্জ্জুন নামাঙ্কিত ওড়িয়া ভাষায় লেখা **'পঞ্চানন মেলা'**র পাঁচালী পাঠ হয়ে আসছে।

রচনাকাল ঃ

'পঞ্চানন মেলা' কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সঠিক অভিমত দেওয়া কঠিন। তবে অনুমান করা যায় যে, পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ নামক লৌকিক দেবতা নাথ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা এবং পরবর্তীকালে সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের পর এই লৌকিক দেবতাকে শিব বা শিবের অংশ রূপে পূজিত হয়ে আসছে। এই দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক সাহিত্যের উদ্ভব তারও অনেক পরে বলে আমাদের অনুমান।

ভদ্রক থেকে ৩৭ কিমি দূরে আরঢ়ি গ্রামে **'আখণ্ডলমণি'** শিবের মন্দির স্থাপিত। বৈতরণী নদীর তীরে 'আখণ্ডলমণি' মহাদেবের মন্দির এখনও আছে। প্রায় ১৫০ বছরের এই শিব মন্দিরটি রাজা নীলাদ্রী সমরসিংহ মহাপাত্রের আমলে (১৮৩০-১৮৪০) নির্মিত হয়।প্রথমে মন্দিরটি দারুনির্মিত ছিল। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে একটি কিংবদন্তী আছে। কাহিনীটি এইরূপ — একদিন সকাল বেলায় রাজা বৈতরণী নদীর তীরে চাষের জন্য একজন কৃষককে জমিতে পাঠালেন। হঠাৎ কৃষকের লাঙ্গলের ফলা শক্ত একটি পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভেঙে যায়। কৃষক হতভম্ব হয় এবং একটি উজ্জ্বল কালো বর্ণের শিবলঙ্গ দেখতে পায়। সেখান থেকে একটি রক্ত প্রস্রবনের ধারা লক্ষ্য করেন এবং সেই ধারা বৈতরণীতে মিলিত হওয়ার জন্য প্রবাহিত হয়। এই সংবাদ রাজাকে (নীলাদ্রী সমরসিংহ মহাপাত্র) দেওয়ার জন্য কৃষক ছুটে যায় এবং খবরটি দেয়। তৎক্ষণাৎ রাজা এসে দেখেন শিবলিঙ্গের উপর আকাশ থেকে দুগ্ধধারা বইছে এবং কৃষ্ণবর্ণের সর্প শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছে। রাজা ভক্তিভরে বাবা আখণ্ডলমণির পূজা করলেন এবং একটি কাঠের মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। পরবর্তীকালে রাজা হরিহর ভঞ্জ ও তাঁর স্ত্রী সত্যভামা দেবী ১৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পাকা মন্দির নির্মাণ করলেন। প্রতিবছর শ্রাবণ পুর্ণিমায় এখানে পুণ্যার্থীরা ভিড় করে আসে বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য। এছাড়া শিবরাত্রির দিন এই মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। এই **'আখণ্ডলমণি'** শিবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক রচনা হল **'পঞ্চানন মেলা'** কাব্যটি।

সুতরাং এই কাব্যের কাহিনী প্রেক্ষাপট উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হওয়া স্বাভাবিক। আমরা নিশ্চিত হতে পারি কোন এক গ্রামীণ কবি ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে **'পঞ্চানন মেলা'** নামক

আখণ্ডলমণি শিবের মাহাত্মজ্ঞাপক কাব্যটি রচনা করে গেছেন। এছাড়া সপ্তদশ শতকে রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর গঠনগত ও আখ্যানগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে **'পঞ্চানন মেলা'** কাব্যের গঠন ও আখ্যানের মিল আছে — যা কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অংশে আলোচিত হবে।

কাব্য কাহিনী ঃ

কবি **'পঞ্চানন মেলা'** কাব্যটির সূচনায় গণেশ এবং শূলপাণির বন্দনা করে কাব্যের কাহিনী শুরু করেছেন। সর্বাগ্রে পার্বতীনন্দন বিঘ্নেশের চরণে প্রার্থনা জানিয়েছেন কবি এইরূপ—

"বন্দই পার্বতীনন্দন। অশেষ দুরিত নাশন।।
দেবঙ্ক অগ্রে পূজা তোর। নমই তুম্ভর পয়র।।"

বঙ্গানুবাদ :

বন্দিলাম পার্বতী সুত। বিনাশ তুমি বিঘ্ন যত।।
সর্বদেবের অগ্রে তুমি। হে দেব চরণে প্রণমি।।

পরক্ষণে কথক কবি কাব্যকাহিনীর বর্ণনা শুরু করেছেন এইভাবে– হরিপুর গ্রামে মাধব মিশ্র নামে এক নিঃসন্তান দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার পত্নীর নাম লীলাবতী। লীলাবতীর পাতিব্রত প্রশংসনীয়। বিপ্র মাধব মিশ্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে সংসার নির্বাহ করেন। সুখ-দুঃখে ব্রাহ্মণ দম্পতির দিন অতিবাহিত হতে থাকে। পূর্বজীবনের কর্মফলে হঠাৎ ব্যাধি উপস্থিত হয়। শরীর অবশ ও অক্ষম হয়ে পড়ে। ভিক্ষা করতে যাওয়ার মতো তার শরীর সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। স্বামীর শরীরের এ হেন অবস্থা দেখে পত্নী লীলাবতী অসুস্থ স্বামীকে পরামর্শ দেয় যে, শালন্দী নদী তীরে আরড়ি নামে এক গ্রামে 'আখণ্ডলমণি শূলপাণি শিব' বিরাজ করেন। বহু ভক্তের সমাগম হয় সে স্থানে। বহু রোগী পঞ্চাননের সেবা করে রোগমুক্ত ও সুস্থ হয়ে উঠেছেন। লীলাবতী স্বামীকে সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। একখণ্ড যষ্টি হাতে ধরে অক্ষম ব্রাহ্মণ আখণ্ডল মণির নিকট অগ্রসর হলেন। উপবাসী ব্রাহ্মণ গ্রীষ্মের দাবদাহে পথিমধ্যে রোগ-যন্ত্রণায় কাতর ও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। জটা-বিভূতি ভূষিত ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, আশাবাড়ি (আশীর্বাদক/শাস্তি প্রদায়ক লৌহ দণ্ড) হস্তে এক সন্ন্যাসী এসে বিপ্রকে জাগিয়ে তুললেন। বিপ্র

অবাক নেত্রে সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতে চাইলেন। সন্ন্যাসী নিজের পরিচয় আড়াল করে বিপ্র কোন উদ্দেশ্যে কোথায় গমন করছেন জানতে চাইলেন। বিপ্র মাধব মিশ্র সবিস্তারে রোগগ্রস্ততার বিবরণ সন্ন্যাসীর নিকট দিলে সন্ন্যাসী তাকে বলেন যে, সে মহাদেব দাস, আরড়ি গ্রামে তার নিবাস। তিনি আরো বলেন যে, **'পঞ্চানন মেলা'** অর্থাৎ শিবের মেলানি দিলে তার অচিরেই আরোগ্য লাভ হবে এবং ধনলাভ হবে। পূজার বিধি বিধান দিলেন এইরূপ—

"ঘরকু বাহুড়িন যাঅ। পঞ্চাননকু মেলা দিও।।
পদার্থ ন লাগে বহুত। পাঞ্চটি পইসা যে মাত্র।।
গঞ্জাই এক পইসার। অটে পইসাকর ক্ষীর।।
শর্করা এক পাহি মাত্র। পইসা কর অটে ঘৃত।।
কদলী পাইকর জান। গুবাক গোটিয়ে মাগিন।।
ত্রিশাখা বেলপত্রী জান। পাঞ্চটি আনিব তোলিন।।
রজনী পাঞ্চ ঘড়ি পরে। মেলাহি স্থাপিব গৃহরে।।" (পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ :

গৃহ পানে ফিরি যাইও। মেলানি পঞ্চাননে দিও।।
নাহি লাগে বিবিধ বস্তু। পাঁচ পয়সার পূজা হেতু।।
গঞ্জিকা লবে পয়সা দরে। দুগ্ধ কিনিবে মনে করে।।
শর্করা এক পাহি মাত্র। এক পয়সায় লহ ঘৃত।।
নিবে রম্ভা একটি পাই। নিখুঁত গুয়া মাগি লই।।
ত্রিপত্র বেলপাতা পেলে। আনিবে পাঁচটি তুলে।।
পঞ্চ ঘটিকা নিশি হবে। গৃহেতে মেলানি দিবে।।

সন্ন্যাসী আরো নির্দেশ দিলেন যে—

"নিমন্ত্রি আনি বন্ধু গণে। পূজিব শিবঙ্ক চরণে।।
মার্জ্জনা করাইন স্থান। স্থাপিব সুদিব্য আস্থান।।

ঘৃত বর্ত্তি কি লগাইব। নমঃ শিবায় যে বলিব।।

শর্করা দুগ্ধ যে গঞ্জাই। কদলী মিলাইব তঁহি।।

যতনে পনা যে করিব। প্রভূক্ষ নৈবেদ্য দেব।।" (পৃষ্ঠা - ৫)

বঙ্গানুবাদ :

নিমন্ত্রিয়া বন্ধু আনি। পূজিবে শিব শূলপাণি।।

মার্জ্জনা করিবে সে স্থান। স্থাপিবে সুদিব্য আস্থান।।

ঘৃত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিয়া। ওঁ নম শিবায় বলিয়া।।

রম্ভা দুগ্ধ শর্করা দিয়া। গঞ্জিকা তাহাতে ঢালিয়া।।

যতনে পানীয় করি। নিবেদিবে ভক্তি ভরি।।

এইরূপ বিধান দিয়ে সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হলেন। পূজার উপাচার ও নৈবেদ্য সংগ্রহে মাধব মিশ্রকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। গোয়ালা তাকে দুগ্ধ ও ঘৃত দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করল বটে, কিন্তু দুধে জল মিশিয়ে দেয়। দুধে জল দেওয়ার কারণে গোয়ালা বন্ধু দাসের সমগ্র দোহিত দুগ্ধ রক্তবর্ণে পরিণত হয়। গোয়ালা কেঁদে বিপ্রের কাছে সব কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর এবং বিপ্র দুগ্ধ ভাণ্ডারে ব্রাহ্মণের ক্রীত দুগ্ধ ঢেলে দেওয়ার পরমূহর্তেই দুগ্ধ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। গোয়ালা খাঁটি দুধ বিপ্রকে পুনরায় দেয়। এইভাবে ব্রাহ্মণ মাধব মিশ্রকে যারা বিড়ম্বনায় ফেলেছে তাদের প্রত্যেকেই শূলপানির রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছে। অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে তাদের উচিৎ শিক্ষা দিয়েছেন পঞ্চানন তথা শূলপানি। এইভাবে ক্রমান্বয়ে আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন কবি।

দ্বিজ মাধব তার প্রতিবেশি রাধু সাহু নামক জনৈক ব্যক্তির কাছে নিখুঁত সুপারি চাইলে বিপ্রকে না দিয়ে উপরন্তু তার এই পঞ্চানন ভক্তিকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বাতুলের বাতুলতা বলে ধিক্কার করে। ফলস্বরূপ রাধু সাহুর একমাত্র সন্তান সর্পদংশনে মারা যায়। কাহিনীতে দেখা গেছে শিব অর্থাৎ পঞ্চাননকে মেলা বা মেলানি দিয়ে সন্তুষ্ট করার পর পঞ্চানন তার পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঐ গ্রামের জমিদার পঞ্চানন মেলায় মানত করেন তার পুত্র সন্তান লাভের জন্য। কালক্রমে জমিদার পত্নী গর্ভবতী হয় এবং যথাকালে পুত্র সন্তান প্রসব করেন। জমিদার জগন্নাথ চৌধুরী পঞ্চানন মেলা প্রদানের কথা মন থেকে বিস্মৃত হয়ে যান। ফলে তার পুত্র প্লীহা নামক প্রেতজ্বরে আক্রান্ত

হয়ে পড়ে। কিছুতেই রোগ নিরাময় করে পুত্রকে সুস্থ করতে পারছেন না। প্রাণবায়ু ক্ষীণ হয়ে আসে। পুত্রের মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন জমিদার দম্পতি। এমতাবস্থায় সন্ন্যাসী বেশ ধরে আখণ্ডলমণি শূলপাণি তথা পঞ্চানন পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তারপর জমিদার চৌধুরী পঞ্চানন মেলানি প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্র সুস্থ হয়ে ওঠে। এইরূপ কয়েকটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপন করে পঞ্চানন মেলার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন কবি। অন্ধ, বধির, পঙ্গু এবং নানান রোগগ্রস্ত মানুষের নিরাময়ের সাক্ষাৎ রক্ষাকর্তা স্বয়ং শূলপাণি পঞ্চানন ছদ্মবেশ ধারণ করে আর্ত-পীড়িত মানুষের কাছে এসে সহায়ক হয়েছেন। শিব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক এই কাব্যটিতে একাধিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে কবি সহজ সরল ভাষায় ভক্তি বিহ্বল গ্রামীণ মানুষের ধর্মীয় আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রান্তবঙ্গ ও প্রান্ত ওড়িশা জনজীবনে এই শিব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুস্তিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

পঞ্চানন মেলানির উপকারিতা ও চতুঃবর্গ ফললাভের কথা উল্লেখ করেছেন কবি কাব্যের শেষাংশে। পঞ্চানন মেলানির মাহাত্ম্যকথা শ্রবণে এবং এই মেলানি প্রদানের কীরূপ ফললাভ হয় তার বর্ণনা করেছেন কবি এইভাবে —

"শ্রদ্ধারে পড়ি যে শুনায়ে। চতুরবর্গ ফল পাএ।।
বন্ধ্যা অপুত্রী যেতে নারী। ইহা শুনিন যিবে তরী।।
গ্রহ যন্ত্রণা হেব ক্ষয়। মৃত্যুর মুখে হেব জয়।।
নৃপতি দ্বারে হেব যশ। সংসারে লভিবে সুযশ।।
অপমৃত্যুরু হেব পার। আয়ুষ বর্ত্তিব অপার।।
অন্ন বস্ত্ররে সুখী হেব। যম দণ্ডুরু নিস্তারিব।।
দয়া করি পঞ্চানন। অন্তে বৈকুন্ঠে দেবে স্থান।।" (পৃষ্ঠা - ১৭)

বঙ্গানুবাদ :

শ্রদ্ধায় পঠনে শ্রবণে। চতুঃবর্গ ফল আনে।।
গ্রহ যন্ত্রণা হবে ক্ষয়। মৃত্যুর মুখে হবে জয়।।
নৃপতির হবে সুসমৃদ্ধি। সংসারে হবে যশবৃদ্ধি।।
অপমৃত্যু যে দূরে যাবে। পরমায়ু বর্দ্ধিতে রবে।।

অন্নবস্ত্রে সে সুখী হবে। যমদণ্ড হতে নিস্তারিবে।।

পঞ্চানন করুণা ভরে। বৈকুণ্ঠে স্থান দিবে তারে।।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

আলোচ্য **'পঞ্চানন মেলা'** কাব্যে আরাধ্য দেবতা পঞ্চানন কি শাস্ত্রীয় দেবতা নাকি লৌকিক দেবতা এই নিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তবে ইনি যে ভদ্রক থেকে ৩৭ কিমি দূরে আরড়ি গ্রামে পূজিত **'আখণ্ডলমণি'** পঞ্চানন (শিব) এই বিষয়টি কাব্যকাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই **'আখণ্ডলমণি'** তথা পঞ্চাননের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ওড়িয়া পাঁচালী ওড়িশা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে প্রচলিত। সুতরাং এই পঞ্চানন কি বঙ্গদেশে পূজিত লোকদেবতা পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ পরবর্তীকালে যার উপর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ বল্লাল সেনের আমল থেকে লৌকিক বা অন্যান্য নাথযোগী পূজিত দেব-দেবীর উপর ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। **'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি'** পত্রিকায় সুধীররঞ্জন দাস লিখেছেন — **"প্রসঙ্গত লোকধর্ম ভিত্তিক কতিপয় বৈষ্ণব, শাক্ত এবং শৈব্য সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখনীয়—রামানন্দী বা রামাৎ, কবীরপন্থী, রয়দাসী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাসী, দাদপন্থী, রামসনেহী, আচারী, বাউল, ন্যাড়া, ভৈরবী ইত্যাদি। উল্লিখিত সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণিত হইবে যে, লোকধর্মকে ভিত্তি করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। এই কারণবশতঃই উক্ত সম্প্রদায় অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।"**[১৯]

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন এইসব লোকধর্মের উপর আরোপিত হওয়ার পর এর স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দেবতার (পঞ্চাননের) সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য অঞ্চলে পূজিত পঞ্চানন্দ বা পঞ্চাননের আকৃতিগত ও বেশভূষার মিল আছে। এমনকি **'পঞ্চানন মেলা'** পুস্তিকায় উল্লিখিত পূজার নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপাচারের সাথে এর যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। এছাড়া ঋগ্বেদে পঞ্চানন শিবের উল্লেখ নেই। **'ঋগ্বেদে পঞ্চজন বা পাঁচটি জাতি প্রধান ছিল। এই পঞ্চজাতির উপাসিত বলেও রুদ্র শিব পঞ্চানন হতে পারে। শিবের পঞ্চাননত্ব প্রতীক মাত্র।'**[২০] সুতরাং পঞ্চানন শিবের যে রূপ বর্ণনা তার সাথে ঋগ্বেদের রুদ্রের মিল নেই। শুধুমাত্র তার উগ্ররূপের সাথে রুদ্ররূপের মিল আছে। অনুরূপভাবে বাংলার লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ সম্পর্কে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন —

"মহাদেবের সঙ্গে পঞ্চানন্দের আকৃতিগত ও বেশভূষায় কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এই দেবতার গাত্রবর্ণ লাল এবং মুখের ভাব উগ্র। পঞ্চানন্দের বাহন বহুপ্রকার, যথা - বামন, গোভূত, মামদো, মৃগ, বৃষ, ভল্লুক প্রভৃতি। পঞ্চানন্দের অনুচররূপে দুটি অর্ধদেবতার মূর্তি দেখা যায়, তারা কোথাও 'পেঁচো-খেঁচো' কোথাও 'ধনুষ্টঙ্কার' বলে পরিচিত। ইঁহাদের আকৃতি অতি ভয়াবহ।"[২১]

আবার কেউ কেউ পঞ্চানন্দের নানারকম ধ্যানমন্ত্রের মধ্যে ক্ষেত্রপাল, ধর্মরাজ প্রভৃতি রূপের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ধ্যানমন্ত্রগুলি বিচিত্র, অর্থহীন আদিমভাষার ধ্বনি সমষ্টি নিয়ে রচিত।[২২] অনেক ধ্যানমন্ত্রে পঞ্চানন্দকে দৈত্যরূপে কল্পনা করা হয় এবং শিশুদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কর্তা রূপে মেনে চলা হয়। ধ্যানমন্ত্র ও তন্ত্রের সমন্বয়ে এই দেবতা আসলে নাথযোগীদের আরাধ্য দেবতা যা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজিত ও ব্রাহ্মণ্য বিধানে নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয়।[২৩] **"অনেক নাথযোগীর ধারনা ইনি ধর্মঠাকুরের ভিন্নতর রূপ। কারোর সিদ্ধান্ত হল পঞ্চানন্দ মিশ্রদেবতা, শিব ও আর্যেতর কোন রক্তমূর্তি বিশিষ্ট দেবতার সমাহার অথবা আর্য-স্বীকৃতির পূর্বকালের শিব বা রুদ্রদেবতার একটি অভিনব সংস্করণ। বর্ধমান জেলা বা অন্যত্র ইনি বৃক্ষাধিষ্ঠিত ভৈরব অথবা ক্ষেত্রপাল বিশ্বাসে পূজিত হন। কোথাও ইনি শ্মশান দেবতা। অনুমান করা যায়, লৌকিক দেবতা হলেও পঞ্চানন্দ বহুকাল পূর্বে উচ্চকোটি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার প্রমান বৃহরুদ্রযামল গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখা যায়।"**[২৪]

সুতরাং পঞ্চানন আসলে লোকদেবতা। শুধু বঙ্গপ্রদেশ নয়, পঞ্চানন নামক লোকদেবতার প্রচলন প্রতিবেশী ওড়িশায় ছিল ও আছে—তার প্রমান আমাদের আলোচ্য **'পঞ্চানন মেলা'** কাব্যটি। এই কাব্যে ভদ্রকের শালন্দী নদী তীরে **'আখণ্ডলমণি'** পঞ্চাননের মন্দির, ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজিত এবং পাঁচটি পয়সা, ঘৃতবর্তিকা সহ পঞ্চপ্রদীপ, ত্রিশাখা বেলপত্র, গঞ্জিকা নানাবিধ উপাদান ও উপাচারের সাথে সামঞ্জস্য আছে বঙ্গপ্রদেশে পূজিত নদী তীরবর্তী দেবতা পঞ্চানন্দ বা পঞ্চাননের। বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার সাথে কিংবা মেদিনপুরের পূর্বাঞ্চলে (নন্দকুমার, কোলাঘাট, ময়না প্রভৃতি) পূজিত পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দের সাথে ওড়িশা সন্নিহিত দক্ষিণ মেদিনীপুরের পূজিত পঞ্চাননের সাদৃশ্য প্রকট। অন্ধ, বধির, পঙ্গু, বন্ধ্যা ইত্যাদি অসহায় মানুষের সহায়ক দেবতা।

অপরদিকে শিশু রক্ষাকর্তা রূপেও এই দেবতাকে পূজা করা হয়। বাংলা ও ওড়িশা উভয় প্রদেশে একই উদ্দেশ্যে এবং একই উপাচারে পঞ্চানন পূজিত হয়ে আসছেন। '**ইনি লৌকিকদেবতা হলেও আঞ্চলিক নন, এর পূজা-পার্বণ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং বর্ণ হিন্দু সমাজেও প্রায় শাস্ত্রীয় দেবতার মর্যাদা সহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানে এঁর পূজায় ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করেন।**"[২৫] ফলে আলোচ্যকাব্যে পঞ্চানন পূজায় ব্রাহ্মণের গুরুত্ব এবং অপরিহার্য্যতা বারম্বার উল্লিখিত আছে। কিন্তু বাংলার লৌকিক দেবতার মধ্যে পাঁচু ঠাকুর নামে এক দেবতা আছেন। এই পাঁচ ঠাকুর ও পঞ্চানন একই দেবতা নন। এসম্পর্কে বরুণ চক্রবর্তী বলেছেন —

> **"পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন নামে অপর লৌকিক দেবতার পূজা গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান। তাঁর সঙ্গে পাঁচু ঠাকুরের সম্পর্ক নেই। উভয়ের আকৃতি ভিন্ন। পূজা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। পঞ্চানন্দের ধ্যানমন্ত্র আছে। পঞ্চানন্দ শিশুরক্ষক। পাঁচু ঠাকুর শিক্ষরক্ষক হয়েও কখনও কখনও শিশু হন্তারক। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চানন্দ দেবতারূপে গণ্য কিন্তু পাঁচু ঠাকুর লোকমানসে কখনও বা অপদেবতা মাত্র।"**[২৬]

ওড়িশায় পূজিত পঞ্চানন কে '**আখণ্ডলমণি**' বলা হয়। আলোচ্য পুস্তিকায় উল্লেখ আছে এইভাবে —

> **"ধন্য হে আখণ্ডলমণি। মহামহিম শূলপাণি।। (পৃষ্ঠা - ১৫)**
>
> **অথবা**
>
> **"ধন্য সে আখণ্ডলেশ্বর। মহিমা অটই অপার।।" (পৃষ্ঠা - ১৩)**

'**আখণ্ডল**' কথার বূৎপত্তিগত অর্থ ইন্দ্রদেবতা। অর্থাৎ আখণ্ডল = বি. ইন্দ্র (আ + √খণ্ডি + অল)[২৭]। আমাদের আলোচ্য রচনাটিতে আখণ্ডলমণি অর্থে শিবের কথা বা শিবের মাহাত্ম্যবর্ণিত হয়েছে। '**মণি**' শব্দটি মহামূল্যবান রত্ন অর্থে এক্ষেত্রে প্রযুক্ত। সুতরাং '**আখণ্ডলমণি**' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী এই কাব্যে ইন্দ্রদেবতার কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়নি।

'**পঞ্চানন মেলা**' গ্রন্থটির কাহিনী বুনন অনেকটা সপ্তদশ শতকে সৃষ্ট বাংলার পীর মহিমাজ্ঞাপক পাঁচালী সাহিত্যের অনুরূপ। সত্যপীরের পাঁচালী ও সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে বিষ্ণুর স্বরূপ ও তার অলৌকিক মহিমার কথা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে ঠিক অনুরূপ '**পঞ্চানন মেলা**'য় পঞ্চানন

অর্থাৎ শিবের অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সত্যপীরের পাঁচালীগুলিতে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর ফকির দরবেশের রূপ ধারণ করে বিপদ সংকুল অবস্থা থেকে সাধু বা ভক্তকে উদ্ধার করেছেন। অনুরূপভাবে **'পঞ্চানন মেলা'**র কাহিনীতে পঞ্চানন অর্থাৎ শিব সন্ন্যাসী বেশে আর্ত ও রোগগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ও মূহুর্তের মধ্যে অব্যাহতির বিধান দিয়ে অন্তঃর্ধান হয়েছেন। পূজার নৈবেদ্য ও উপাচারের ক্ষেত্রে সত্যপীর তথা সত্যনারায়ণের সঙ্গে পঞ্চানন মেলানির উপাচারের তালিকা প্রায় একই রকম। দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা, গোটা সুপারি, ভাঙ, গঞ্জিকা ইত্যাদি উপাদান উভয় ক্ষেত্রে নির্দেশিত। সত্যপীরের **'সিরনি'** আর পঞ্চাননের **'পানা'** (পানীয়) প্রস্তুত প্রণালী এবং পারণ পদ্ধতির মধ্যেও মিল আছে।

শৈবক্ষেত্র উৎকল ভূমিতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে প্রথমে জগন্নাথ প্রভূ এবং দ্বিতীয় স্থানে শিবের স্থান রয়েছে। বিষ্ণু সাধনা বঙ্গদেশ তুলনায় ওড়িশায় অনেক বিরল। তার অন্যতম কারণ ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে জগন্নাথ Cult অর্থাৎ ওড়িশার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের একচেটিয়া আধিপত্য সমগ্র উৎকলবাসীর হৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার স্বরূপ কৃষ্ণ জগন্নাথের উপস্থিতির কারণে নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণুর মহিমা স্বতন্ত্রভাবে প্রচারের কোন তাগিদ মধ্যযুগের ওড়িয়া কবিদের মধ্যে ছিলনা। যেই কৃষ্ণ সেই বিষ্ণু – এই সরল সমীকরণের পথ ধরে কবিরা বিষ্ণুপুরাণের চর্চা বা অনুবাদ বা রূপায়নের বিশেষ প্রচেষ্টা করেন নি। ষোড়শ শতকের পর মহাপ্রভূ চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সম্প্রচার লক্ষে ভগবৎ চিন্তার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। ঠিক সেই সময় থেকে চৈতন্যদেবের **'পঞ্চসখা'**র অন্যতম কবি **'অতিবড়ি'** জগন্নাথ দাসের কবিত্বশক্তিতে ভাগবতের অনুবাদ যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা যে পরিমাণে সাহিত্য কর্মে চর্চিত হয়েছে সেই পরিমাণ শ্রীবিষ্ণুর মহিমাজ্ঞাপক সাহিত্য ততখানি রচিত হয়নি। এইরূপ বক্তব্য উপস্থাপনার একটাই কারণ **'ত্রিনাথ মেলা'**, **'পঞ্চানন মেলা'** ইত্যাদি দেবমহিমা জ্ঞাপক সাহিত্যগুলি মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে কোন প্রকার যেতেই পারেনা। অনেক পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকে বঙ্গের পীরমহিমা জ্ঞাপক সাহিত্যের গঠন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সীমান্তবর্তী ওড়িয়া এবং বাঙালির আস্বাদ্য এক মিশ্র সাহিত্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে সাহিত্যের রূপরীতির বা গঠন প্রণালীরও যে আদান-প্রদান হয় এই সাহিত্য তারই প্রমাণ।

কবি কর্ণের মোট একুশখানি সত্যপীরের পালা ও তাঁর পুথিপত্র উদ্ধার হয়েছে সুবর্ণরেখার দুই তীরের উৎকলভূমি এবং বঙ্গভূমি থেকে। পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর **'পুঁথি-পরিচয়'** (১ম খণ্ড) গ্রন্থের ভূমিকায় শান্তিনিকেতন বিদ্যাভবনের ওড়িয়া স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কুঞ্জবিহারী দাসের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কবি কর্ণের ষোলটি পালার তালিকা নির্দেশ করেছেন। সেই গ্রন্থে অধ্যাপক মণ্ডল বলেছেন যে ওড়িশায় প্রচলিত কবি কর্ণের নামে যে ১৭টি পালা প্রচলিত আছে সেই কবি কর্ণ আসলে অজ্ঞাতপূর্ব একজন বাঙালি কবি।[২৮] স্বাভাবিক ভাবে কবিকর্ণের রচিত সত্যপীরের পাঁচালী প্রথমে বাঙালীর হাত ধরে ওড়িশা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে এবং তার প্রভাবে সমগঠনশৈলী এইরূপ শিবমহিমাজ্ঞাপক সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে।

ছন্দ ঃ

'পঞ্চানন মেলা' কাব্যে ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাসের প্রযুক্ত নবাক্ষরী ছন্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। বৈচিত্র্যহীন ভাবে কাব্যের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত নয় অক্ষর বিশিষ্ট চরণে কাব্যের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। কবি নয় অক্ষর চরণ বিন্যাস করেছেন ৫+৪ মাত্রা গণনায় —

''বানর গলে। মুক্তামাল। ৫+৪
সেকি জানই। তার মূল্য।। ৫+৪
মিষ্টান্ন করি। লে আহার। ৫+৪
তা স্বাদ জানে। কি শূকর।। ৫+৪
দীপ জ্বলিলে। অন্ধ পাশ। ৫+৪
দিশই তাকু। অবা কিশ।। ৫+৪
কালাকু সেহি। পরি গীত। ৫+৪
এহার আসি। বা বিঅর্থ।। ৫+৪ (পৃষ্ঠা - ১০)

অলংকার ঃ

সচেতন ভাবে অলংকার প্রয়োগের কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। সোজাসুজি ধারায় কাব্য কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করা হয়েছে।

তবে কাব্যের মধ্যে মধ্যে কিছু প্রবাদবাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এক বধির ভক্তের পঞ্চাননভক্তিকে লক্ষ্য করে অনন্ত নামে একজন ধনবান ব্যক্তি ব্যঙ্গ করেছেন এইভাবে —

"বানর গলে মুক্তামাল। সে কি জানই তার মূল্য।।
মিষ্টান্ন করিলে আহার। তা স্বাদ জানেকি শূকর।।
দীপ জ্বলিলে অন্ধ পাশ। দিশই তাকু অবা কিশ।।
কালাকু সেহি পরি গীত। এহার আসিবা বিঅর্থ।।" (পৃষ্ঠা - ১০)

অর্থাৎ বানরের গলায় মুক্তামালা, শূকরের মিষ্টান্ন আহার, অন্ধের পাশে প্রদীপের আলো ইত্যাদি যেমন মূল্যহীন বা গুরুত্বহীন অনুরূপভাবে বধিরের গীতশ্রবণও নিষ্ফলকর্ম মাত্র।

ভাষা ঃ

'পঞ্চানন মেলা' কাব্যটির ভাষা ওড়িয়া হলেও মেদিনীপুরের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত বেশকিছু শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দ ও ক্রিয়াপদগুলি এই অঞ্চলের মানুষের মুখে উচ্চারিত হতে দেখা যায়, যেমন — পইসা = পয়সা, সাহিপড়িশা = পাড়া-প্রতিবেশী, গুড়িয়া = ময়রা, নর্ক = নরক, ছোটা = খোঁড়া, ইত্যাদি শব্দ এবং গলা = গেল, শোইলা = ঘুমাল, দিঅ = দাও, মাগি = চেয়ে, হঁস = হাসি, রখ = রাখ, ঝুন্টি পড়িলা = হোঁচট খেল, বুড়াই = ডুবিয়ে, যাউথিলা = যাচ্ছিল ইত্যাদি ক্রিয়াপদ।

গ. নারীর সমস্যাকেন্দ্রিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত সাহিত্য

গ্রন্থ ১. গেহ্লা ঝিঅ, কবি - চন্দ্রমোহন ধল ঃ

গবেষণাপত্রের আলোচ্য অংশে নারীর সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি বিষয়কে নির্বাচন করা হয়েছে। **প্রথমত ঃ** চন্দ্রমোহন ধল রচিত **'গেহ্লা ঝিঅ'** এক অজ্ঞাত লোককবির লেখা **'সুনা ঝিঅ'** ও বনমালী রচিত **'জেমা রোদন'** পুস্তিকা তিনটি আলোচিত হবে জনপ্রিয় লোকগীতি **'কাঁদনা গীতি'**র উদাহরণ রূপে। কন্যা বিদায়ের সময় ওড়িশা এবং ওড়িশা

প্রান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নারীদের (ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষদের) দ্বারা করুণ সুরের মাধ্যমে গীত হয়ে আসছে **কাঁদনাগীতি**। এই গান শুধুমাত্র ওড়িশা কিংবা তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর নয়, ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী বাংলায়ও এই কাঁদনাগীতির প্রচলন আছে। তবে সেই গানে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার মিশ্রণ আছে। আমাদের আলোচ্য কাঁদনাগীতিগুলি ওড়িশা ও বাংলা সীমান্তবর্তী তথা সুবর্ণরেখার উভয় তটবর্তী সুদীর্ঘ জনপদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষায় রচিত। ওড়িয়া শব্দ এই ভাষায় অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও উক্ত এলাকার লোকভাষার বিমিশ্রণ যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত ঃ বৌমার প্রতি শাশুড়ির নিন্দা কিংবা খোঁটা তথা শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা এক অভাগিনীর মর্মব্যথা প্রকাশিত হয়েছে অজ্ঞাত লোককবি রচিত **'অলসী বহু গীত'** পুস্তিকাটিতে। এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু ও সাহিত্যগুণ পর্যালোচিত হবে এই বিশেষ অংশে।

তৃতীয়ত ঃ ওড়িয়া কন্যার বাঙালি বাড়িতে বউ হয়ে আসার যে নানাবিধ সমস্যা ও সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনভ্যস্ত রীতিনীতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা তা বর্ণিত হয়েছে ভাবুকচরণ দাস রচিত **'পরশমণি'** শীর্ষক পুস্তিকাটিতে। আলোচ্য অংশে বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্রিত এই সাহিত্যের পর্যালোচনা থাকছে।

ওড়িয়া ভাষায় লেখা লোককবি চন্দ্রমোহন ধলের **'গেহ্লা ঝিঅ'** পুস্তিকাটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কাঁথির নীহার প্রেস এই সাহিত্যকে বাংলা হরফে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছে। এই রচনার বিষয়বস্তু রূপে নেওয়া হয়েছে ওড়িশা ও বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে প্রচলিত **'কাঁদনাগীতি'** নামক লোকগীতিকে। পুস্তিকাটির অষ্টম সংস্করণ আমাদের সংগ্রহে আছে। নীহার প্রেসের বর্তমান কর্ণধার নীতিন্দ্রনাথ জানা এই রচনার অষ্টম সংস্করণটি যা ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তা পুণর্মুদ্রণ করে আসছেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> **"(All rights reserved)/ গেহ্লা ঝিঅ/****/লক্ষ্মীদেবীর চিত্র অঙ্কিত/অষ্টম সংস্করণ/কাঁথি নীহার প্রেস হইতে নীতিন্দ্রনাথ জানা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত/ সন ১৩১৪ সাল।/মূল্য - ৪.০০ চারি টাকা মাত্র।"**
>
> **(প্রচ্ছদটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭৬ দ্রষ্টব্য)**

প্রচ্ছদটির চারিপাশে অলংকরণ করা আছে। মাঝখানে পদ্মাসনে লক্ষ্মীদেবীর চিত্র অঙ্কিত। পুস্তিকাটি ১৩ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। প্রচ্ছদপত্র (১), মূল কাব্যাংশ (১২), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ সাকুল্যে ১৪টি পৃষ্ঠা আছে। পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্রে পুষ্প চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

কাব্যটির সূচনা অংশটি এইরূপ —

"গেহ্লা ঝিঅ

* * * * * * * * * *

মাতাঙ্ক পাশে রোদন

উঠিলা সবারি বসিব নাহি। মা গো

ঘুরি চাহিলেতে দিশিব নাহি।। ঐ
গাঁ পাহারিলে নাম লুচিব। ঐ
চেকা ছাঁটিলেত ঘাই বুজিব।। ঐ
গড়িয়া আড়িরে শ্বেত মন্দার। ঐ
সাত ফের ঘর হেব অন্ধার।। ঐ"

এইভাবে ১৪ সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ কাঁদনা গীতির Text বা পাঠ মুদ্রিত আছে। রচনাটির শেষাংশে কবি নিজের পরিচয় দিলেন এইভাবে —

"গাঁউলি ভাষারে কাঁদনা এহি। ঐ
দোষাদোষ মোর ধরিব নাহি।। ঐ
কান্দনা গীত ত গলা সরিণ। ঐ
বিদায় হোইলে চন্দ্রমোহন।। ঐ
ঠিকনা মোহর রখ মনর গো। ঐ
জলধা গ্রামরে মোহর ঘর গো।। ঐ
দহমুণ্ডা অটই ডাকঘর গো। ঐ
জিলা নাম অটে যে বালেশ্বর গো।। ঐ

মো নাম শ্রীচন্দ্রমোহন ধল গো। ঐ
শরণ বীণাপাণি পাদতলে গো।। ঐ
সমাপ্ত”

কবি পরিচিতি ঃ

‘গেল্লা-ঝিঅ’ পুস্তিকাটির রচয়িতা চন্দ্রমোহন ধল। কবি বালেশ্বর জেলায় অবস্থিত জলধা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পুস্তিকাটির প্রকাশক কাঁথি নীহার প্রেসের বর্তমান কর্ণধার নীতিন্দ্রনাথ জানা। পুস্তিকাটি নীহার প্রেস থেকে অনেক আগে থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। জনরুচির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় এর একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। প্রাপ্ত পুস্তিকাটি হল অষ্টম সংস্করণের রূপ। কবি চন্দ্রমোহন কাব্যের শেষে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

“কান্দনা গীতি ত গলা সরিণ। ভউনী মানে
বিদায় হইলে চন্দ্রমোহন।। ঐ
ঠিকনা মোহর রখ মনর গো। ঐ
জলধা গ্রামরে মোহর ঘর গো।। ঐ
দহমুণ্ডা অটই ডাকঘর গো। ঐ
জিলা নাম অটে যে বালেশ্বর গো। ঐ
মো নাম শ্রীচন্দ্রমোহন ধল গো। ঐ
শরণ বীণাপাণি পাদতলে গো।। ঐ” (পৃষ্ঠা - ১৫)

কবি চন্দ্রমোহন ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় জলধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বালেশ্বর জেলায় এই গ্রামটি মেদিনীপুর সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম। সীমান্তবর্তী এলাকায় কন্যা বিদায়ের সময় যে কাঁদনাগীতি লোকসমাজে প্রচলিত কবি তা সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন এবং নিজস্ব কিছু ভাবনা এই কাব্যের সাথে যুক্ত করেছেন।

কাব্যকাহিনী ঃ

'গেল্লা ঝিঅ' পুস্তিকাটির কাহিনী অংশের মূল চরিত্র **'গেলী'** নামক এক আদরিণী কন্যা। বিবাহের পর প্রথম সে শ্বশুরালয়ে যাবে। তাকে বিদায়ের জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। এমতাবস্থায় কন্যা ক্রমান্বয়ে মাতা, পিতা, দাদা, বৌদি, কাকা, কাকিমা, ঠাকুরমা, সেজ বোন– এদের কাছে গিয়ে নিজের ফেলে আসা স্মৃতিগুলি রোমন্থন করে কাঁদতে থাকে উচ্চকিত কণ্ঠে। এই ক্রন্দনের এক নির্দিষ্ট সুর আছে। এই সুরে আকাশ-বাতাস, পশু-পক্ষী এবং সমগ্র প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে যায়। এক করুণ আবহ সেই স্থানকে বিষাদগ্রস্ত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রথমে কন্যাটি তার জন্মদাত্রী জননীর নিকট গিয়ে বলে–

"নিজে ন খাইত খুআউ থিল। মা'গো
ষোল বর্ষ যাএ পাখে রখিল।। ঐ
কিবা দোষ কলি তুম্ভ পয়র। ঐ
পঠাই দেউছ দূর দেশর।। ঐ
এহা যেবে মনে থিলা তুম্ভর। মা'গো-
বেক মাড়ি থান্ত জন্ম কালর।। ঐ "(পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদ :

নিজে না খেয়ে খাইয়েছিলে। মা'গো
ষোলটি বছর পাশে রাখলে।। ঐ
কিবা দোষ মোর বলগো জননী। ঐ
কেন যাবে দূরে তোমার বাছানি।। ঐ
মনে যদি তব ছিল এ বাসনা। মা'গো-
গলায় পা তুলে কেন মারিলে না।। ঐ

পরক্ষণে কন্যাটি মায়ের কাছে ভাবী শ্বশুরবাড়ির সকলের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে মাকে অবহিত করে। কন্যাটির ধারনা এই যে শ্বশুরবাড়িতে যতই সুখ থাকুক না কেন বাপের বাড়ির আপনজনের মতো

তারা এতখানি আন্তরিক কখনো হতে পারবে না–

"শাশু ঘর যম ঘর সমান। মা'গো
দণ্ড দেবে মোতে বিনা দোষেণ।। ঐ
সবু বেলে মুণ্ড তলকু পোতি। ঐ
পরাধীনা হোই চালিবি নিতি।। ঐ
সবু বেলে ওড়না টানি দেই। ঐ
ঘর কোণে থিবি জাগিন মুহি।। ঐ
শারি যেসনে পিঞ্জরা ভিতরে। ঐ
বন্দী হোই থাএ কর্ম্ম দোষরে।। ঐ
সেহি পরি মোতে বন্দি করিণ। ঐ
ননদ যাউলি থিবে জগিন।। ঐ" (পৃষ্ঠা - ৬)

এই সব কথা কন্যার মুখ থেকে শুনে মাও গেহ্লিকে কাছে টেনে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে এই বলে–

"সুনা পরি ঝিঅ পর ঘরকু। গেহ্লিরে–
খটিব সে দিনে পর পুঅকু।। ঐ
বিহি ঘটনা যে হোইছি এহা। ঐ
ঘর ঝিঅ পর পুঅর বিহা।। ঐ
হেলা তো বয়স যোল সতর। ঐ
যিবু তু শাশু ঘরকু এথর।। ঐ
শাশু শ্বশুরকু করিবু ভক্তি। ঐ
দেবতারু বলি পূজিবু পতি।। ঐ
কুয়া কাআ কলা মাত্রে উঠিবু। ঐ
এই কথা মোর মনে রাখিবু।। ঐ
গোবর কিছি জলে গোলি দেই। ঐ
ছিটিবু বাড়ী অগণা নেই।। ঐ

** * * * * * * * * * * **

ঘর বাহার সবু দেবু মণ্ডি। ঐ

স্নান সারি আসি ধোইবু হান্ডি।। ঐ

কহিবে শাশু যাহা রান্ধিবাকু। ঐ

যতনে পাক করিবু তাহাকু।। ঐ” (পৃষ্ঠা - ৭)

বঙ্গানুবাদ :

সোনার মেয়ে তবু পরের ধন। গেহ্লি রে

স্বামী ধ্যানজ্ঞান স্বামীই জীবন।। ঐ

বিধির বিধান এমনই রয়েছে। ঐ

নিজ কন্যা যাবে পর পুত্রের কাছে।। ঐ

বয়স তো হল ষোল কি সতের। ঐ

যাবে যে তুমি শাশুড়ির ঘর।। ঐ

শ্বশুর শাশুড়িকে করবে ভক্তি। ঐ

দেবজ্ঞানে তুমি পূজিবে পতি।। ঐ

কাক ভোরে তুমি শয্যা ত্যাগিবে। ঐ

আমার কথা খানি মনেতে ধরিবে।। ঐ

গোবরের ছড়া গুলিয়ে নেবে। ঐ

বাস্তু ভিটায় ছড়িয়ে দেবে।। ঐ

** * * * * * * * * * * * * **

ঘর ও বাহির শুদ্ধ করি। ঐ

বাসন ধুয়ে নিও স্নান সারি।। ঐ

শাশুড়ি যা কিছু রাঁধতে বলবে। ঐ

সেভাবে রান্না যতনে করবে।। ঐ

তারপর কন্যাটি তার বাবার কাছে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে এইরূপ–

"পাকিলা কদলী ফেণিকি ফেণি। বাপা'গো
বাপ ঘর ঝিঅ মউড়মণি।। ঐ
আলু পতর কি পান হোইব। ঐ
পর দেশরে কি মন রহিব।। ঐ
** * * * * * * * * * * * * * **
টিকিয়ে দয়া মনে ন রহিল। ঐ
গরিব ঘররে মোতে ছন্দিল।। ঐ
ধনী ঘর ঝিঅ মুহি অটই। ঐ
মো কর্মরে লেখা থিলা কি এহি।। ঐ" (পৃষ্ঠা - ৯)

বঙ্গানুবাদঃ

পাকিল কদলী ছড়া কে ছড়া। বাবা গো
বাপের ঘরেতে মেয়ে মাথার চূড়া।। ঐ
আলুর পাতা কিবা হয়গো পান। ঐ
পরদেশে কভূ রহে কি মন।। ঐ
** * * * * * * * * * * * * * **
দয়াটুকু নাই তোমার মনে। ঐ
আমারে সঁপিলে দরিদ্র জনে।। ঐ
আমি যে ছিলাম ধনীর দুলালী। ঐ
হেন দুর্দশা বিধি কপালে লিখিলি।। ঐ

এইভাবে বাবাকে ধরে কাঁদবার পর বাবা মেয়েকে প্রবোধ ও শান্ত্বনা দিয়েছেন নানাভাবে। শ্বশুরবাড়ির সকলেই উচ্চ প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চ শিক্ষিত। সুতরাং গেহ্লীর ভবিষ্যত জীবন অনেক সুখের হবে। বাবা সব কিছু জেনে-শুনে, ভেবে-চিন্তে মেয়েকে এইরূপ বর্ধিষ্ণু পরিবারে পাত্রস্থ করে নিজে আস্বস্ত হয়েছেন বটে কিন্তু গেহ্লীর চোখের জল কিছুতেই বাধ মানে না। কন্যার শ্বশুরবাড়ির আর্থিক অবস্থা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে—

"দেখি চাহি তোতে দেউছি সিনা।। গেল্লীরে
জেষ্ঠ শ্বশুর এল-এ যাএ পাঠ। ঐ
পড়ি পুরী জিলার ম্যাজিস্ট্রেট।। ঐ
শ্বশুর তোহর এম.এ পড়িণ। ঐ
ছোটনাগপুরে সে কমিশন।। ঐ
ডবল এম.এ খুড়তা শ্বশুর। ঐ
মাদ্রাজ হেলে সে ব্যারীস্টার।। ঐ
বি.এ বি-টি পড়ি তো দেড়সুর। ঐ
মেডিকেল কলেজরে ডাক্তার।। ঐ
আই-এসি পড়িণ স্বামী তোহর। ঐ
মুনসফ হেলে বালেশ্বর।। ঐ
চারি খণ্ড মটর অছি তার। ঐ
কণিকা রাজ্যর সে মেনেজর।। ঐ
* * * * * * * * * * * * * * *
দুয়ারে কেতে দাসদাসীমানে। ঐ
খাটি যিবে পাশে অতি যতনে।। ঐ
সে ঘররে তুত হোইবু বহু। ঐ
ভাবনা কি পাঁই করছু আউ।। ঐ" (পৃষ্ঠা - ১০)

বঙ্গানুবাদঃ

দেখে শুনে তোরে দিলাম বিয়ে। গেল্লিরে
জ্যাঠা শ্বশুর তোর এল. এ পাশ করি। ঐ
ম্যাজিস্ট্রেট সে যে জেলা তার পুরী। ঐ
এম. এ পাশ করা শ্বশুর তোর। ঐ
ছোটনাগপুরে সে কমিশনার।। ঐ
কাকা শ্বশুর তোর ডবল এম. এ। ঐ

মাদ্রাজে আছেন ব্যরিস্টার হয়ে।। ঐ
বি.এ বিটি পাশ তোর যে ভাসুর। ঐ
মেডিকেলে সে মস্ত ডাক্তার।। ঐ
আই-এস.সি পাশ স্বামী যে তোর। ঐ
মুনসেফ সে যে জেলা বালেশ্বর।। ঐ
মোটরগাড়ি তার আছে চারটে। ঐ
কণিকা রাজ্যের ম্যানেজার বটে।। ঐ
শ্বশুর বাড়িতে কত দাসদাসী। ঐ
কাজে সহযোগী হবে পাশে বসি।। ঐ
সেই ঘরে তুই হবি যে রাণী। ঐ
না কর দুঃখ ওরে সোনামণি।। ঐ

এইভাবে মেয়েটি পরিবারের আপনজনদের জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিচ্ছে এবং তার গুরুজনেরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছে কীভাবে নতুন সংসারে মানিয়ে চলতে হয়। কবি চন্দ্রমোহন নিজের বক্তব্য বিষয় '**মন্তব্য**' অংশে বোনেদের প্রবোধ দিয়ে কাব্যটি শেষ করেছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

ওড়িয়া ভাষায় '**গেহ্লা**' শব্দটির অর্থ আদরণীয়া। এক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক অর্থে '**আদরিণী**'। '**ঝিঅ**' শব্দটির অর্থ কন্যা। অর্থাৎ '**আদরিণী কন্যা**'। বিবাহের পর এক আদরিণী কন্যার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার কালে পিতা-মাতা এবং পরিবারের আপনজনের নিকট হতে বিদায় গ্রহণের এক অশ্রুপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আদলে ওড়িশা প্রান্তবঙ্গের অঞ্চলগুলোতে লোকসঙ্গীতের একটি অঙ্গ '**কাঁদনাগীত**' যা পূর্বে উল্লিখিত করা হয়েছে। লোক সাহিত্যের এই বিশেষ আঙ্গিক কালক্রমে অনেক লোককবির স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে তাঁদেরই লেখনীর মাধ্যমে লেখ্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য '**গেহ্লা ঝিঅ**' পুস্তিকাটির গঠন-আঙ্গিকের মৌলিক ভিত্তি হলো ওড়িয়া '**কাঁদনাগীত**'। এই ওড়িয়া কাঁদনাগীত মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, দাঁতন, মোহনপুর, এগরা, রামনগর প্রভৃতি

এলাকার গ্রামীণ জীবনে এখনও গীত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র প্রান্তবর্তী বঙ্গে নয়, মূল ওড়িশার ভূখণ্ডেও এই কাঁদনা গীতের বহুল প্রচলন আছে।

প্রকৃত পক্ষে **'কাঁদনা গীত'** লোকগীতির শাখা মৌখিক ধারার সাহিত্য। পুরুষ কবি লোকরঞ্জনের জন্য স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে তাকে লিপিরূপ দিলেন বটে কিন্তু কাঁদনাগীত পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা রচিত ও পরিবেশিত। মা-বাবা, ভাই-বোন, মাসি-পিসি এমনটি সখী-সাঙ্গাতদের উদ্দেশ্যে কাঁদনা গীত আছে। শুধু মেদিনীপুরে নয়, ''**ওড়িশার লোকায়ত সমাজে এখনও কাঁদনা গীতের প্রচলন আছে। শ্রী চক্রধর মহাপাত্র তাঁর 'উৎকল গাঁউলি গীত' গ্রন্থে ওড়িশার কাঁদনগীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।**''[২৯]

কাঁদনা গীত মূলতঃ ওড়িশার গ্রামীণ গীত। সুতরাং এই গানের সুরকে একমাত্র ওড়িয়া ভাষাই ফুটিয়ে তুলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে যে কাঁদনাগীত পাওয়া যায় তার মধ্যে ওড়িশা ভাষার সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক ভাষার লক্ষণ বা ঔপভাষিক লক্ষণ মিশ্রিত আছে। ''**তার ভাষা পুরোপুরি ওড়িয়া নয়— তা বাংলার আঞ্চলিক লক্ষণ মিশ্রিত ওড়িয়া। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, যারা প্রাত্যহিক জীবনে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলে, তাঁরাই কাঁদনা গীত গায় মিশ্র ভাষায় এবং মিশ্র ভাষাতেই গান রচনা করে।**''[৩০]

ছন্দ ঃ

'গেহ্লা ঝিঅ' গানটির চরণান্তিক মিল এবং ৬+৫ মাত্রার চরণ লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু এটির রূপ গান ফলে প্রতিটি চরণের শেষে ধ্রুবপদ সংযোজিত আছে। এই ধ্রুবপদগুলি প্রতিটি চরণে ঘুরে ফিরে আসে ও করুণ আবহকে গভীর থেকে গভীরতর করে ফেলে। যেমন কাব্যের একটি অংশে পিতার কাছে গেহ্লি কাঁদতে থাকে এইভাবে —

''সজনা গছরে ছাড়িলা চুঁই। বাপাগো ৬+৫। ধ্রুবপদ
তুম্ভর কোল ত ছাড়িলি মুহি। ঐ ৬+৫। ধ্রুবপদ (পৃষ্ঠা - ৯)

গেহ্লি তার বাবাকে জড়িয়ে কাঁদবার সময় বলেছে, 'সজনে গাছের ফুল চুঁইয়ে ঝরে পড়লো। আমি ও তোমার কোল থেকে চলে যাচ্ছি।'

অলংকার ঃ

কবি চন্দ্রমোহনের এই কাঁদনাগীতিতে অলংকারের প্রয়োগবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই রচনায় গেহ্লি নিজেকে পিঞ্জরাবদ্ধ শারি পাখির সঙ্গে তুলনা করে মায়ের পাশে অভিমান প্রকাশ করেছে। এই অংশটি উপমা অলংকারে কবি এইরূপ ফুটিয়ে তুললেন —

"শারি যেসনে পিঞ্জরা ভিতরে। মাগো
বন্দী হোই থাএ কর্ম্মদোষরে।। ঐ
সেহি পরি মোতে বন্দী করিণ। ঐ
ননদ যাউলি থিবে জগিন।। ঐ"

অর্থাৎ শারি যেমন পিঞ্জরে বন্দী হয়ে থাকে তার নিজের কর্মদোষে ঠিক সেই ভাবে জা-ননদের পাহারায় গেহ্লিকেও বন্দী থাকতে হবে। গেহ্লিকে শান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার মা মেয়েকে স্বামীর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে মনে করিয়ে দেয় এইভাবে —

" বেণা বনে মণি বুনিবু নাহি। গেহ্লিরে
হীরামণি কাঁচ কিনিবু নাহি। ঐ (পৃষ্ঠা - ৮)"

অর্থাৎ উলুবনে মানিককে অবজ্ঞায় হারাতে না। স্বামী হারিয়ে গেলে গেহ্লির জীবনে দুর্দশা নেমে আসবে বলে মা সাবধান করে দিয়েছেন। এছাড়া হীরা মনে করে ভুলে কাঁচকে যেন না কিনে ফেলে অর্থাৎ স্বামীর সোহাগ ছাড়া অপরের ভালোবাসায় মুগ্ধ হতে না বলেছেন। গেহ্লি শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় জন্মভূমির প্রতি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে —

"আলু পতর কি পান হোইব। বাপা গো
পর দেশরে কি মন রহিব।। ঐ" (পৃষ্ঠা - ৯)

অর্থাৎ আলুর পাতা কখনোই পান হতে পারেনা। অনুরূপ ভাবে শ্বশুরবাড়ির ভিটে-মাটিতে জন্মভূমির শান্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়না। কবি এখানে আলুর পাতা (উপমান) কে নিকৃষ্ট করে পান (উপমেয়) কে উৎকৃষ্ট রূপে দেখাতে চেয়েছেন। ফলে বাপের বাড়ি > শ্বশুরবাড়ি এইরূপে দেখাতে গিয়ে

ব্যতিরেক অলংকারের সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, কবি নববিবাহিত মেয়েকে বাপের বাড়ির পুকুরে ফোটা লাল শালুক (রক্ত কঁই) ফুলের সঙ্গে উপমিত করেছেন। উপমান (শালুক ফুল) কে দেখে উপমেয় (গেহ্লি) কে যেন মনে পড়বে আর তৎক্ষণাৎ বাবা যেন গেহ্লিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে যায়। এক্ষেত্রে '**কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে**' চরণটির মতো টুকটুকে লাল শালুককে দেখে টুকটুকে ফরসা গেহ্লির কথা মনে করা আসলে এটি স্মরণোপমা অলংকারের দৃষ্টান্ত কবি অলংকারটি আরোপ করলেন এইভাবে —

> **"গড়িয়া মঝিরে রকত কঁই।   মাগো**
> **আনিবার হেলা করিব নাই।।   ঐ"**   (পৃষ্ঠা - ৬)

ভাষাঃ

কাঁদনাগীতি পরিবেশনকারীরা ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত নারী ও পুরুষ। তাদের দৈনন্দিন জীবনের মৌখিক ভাষার শব্দ ও ক্রিয়াপদ সরাসরি উঠে এসেছে কাঁদনাগীতিগুলিতে। মান্য ওড়িয়া কিংবা মান্য বাংলা কোন ভাষাতেই তাদের দক্ষতা না থাকায় মাঝামাঝি ওড়িয়া ও বাংলা মিশ্রিত লৌকিক ভাষায় এই কাঁদনাগীতিগুলি গাইতেন। স্বাভাবিক কারণে '**গেহ্লা ঝিঅ**' নামক এই কাঁদনাগীতিতে অনেক শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলি বাংলা ও ওড়িশা সীমান্তবর্তী উভয় অঞ্চলের তথা সুবর্ণরেখা নদীর উভয় তীরবর্তী এলাকার মানুষের মুখে উচ্চারিত হতে শোনা যায়, যেমন — ডেঙ্গা = লম্বা, টঙ্কা = টাকা, পিণ্ডা = দাওয়া, কুঞ্চ কানি = কাপড়ের কোচড়, ধূব = ধবল বা সাদা, খরাবেলে = দুপুর বেলা, কতিরে = কাছে বা নিকটে, বাঁউশ = বাঁশ, তড়া = হুড়কো, বইঠা = প্রদীপ, খুঁন্টা = খোঁটা, খট = খাট, পতর = গাছের পাতা, রকত কঁই = রক্ত (লাল) শালুক, অলি = কলহ, শাশু = শাশুড়ি, কুয়া = কাক, ভাতুয়ানী = ভাতের জল, বিণ্ডা = ন্যাতা, বায়ানী (বায়া-র স্ত্রীবাচক শব্দ) = যুবতী, গড়িয়া = পুকুর, আড়ি = পাড়, পোথি = পুথি, গাধোই = স্নান করে, লুগা = শাড়ি, মুষা = ইঁদুর, বাঘর = বিয়ে ঘর, সপ = বসবার আসন, মসিনা = মাদুর, বাটেই = পথে এগিয়ে দেওয়া, তেন্তুলি = তেঁতুল, দোলি = দোলনা, বউল = বকুল, ঘড়ি কি ঘড়ি = ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সুনা = সোনা, পিন্ধাইলে = পরাইলে, গাঁউলি = গ্রামীণ, পাখে = পাশে ইত্যাদি শব্দ ও ক্রিয়াপদ।

গ্রন্থ ২. সুনা ঝিঅ, কবি - কবি পরিচিতি অনুপস্থিত ঃ

ওড়িয়া ভাষায় রচিত **'সুনা ঝিঅ'** কাব্যটি কাঁদনাগীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কাব্যাংশে কবির কোন নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। কন্যা বিদায় কালে তার আপনজন তাকে প্রবোধ বা শান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং মা উপদেশ দিচ্ছেন কীভাবে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, জা-ননদ নিয়ে পরের ঘর করতে হয়। প্রচ্ছদপত্র বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মূল কাব্যাংশটি আমাদের সংগ্রহে আছে। সুতরাং প্রাপ্ত পুস্তিকার সংস্করণ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, মূল্য কিছুই জানা সম্ভবপর হচ্ছেনা। তবে মুদ্রণ ও অন্যান্য চিহ্ন ধরে কাব্যটি নীহার প্রেসের থেকে প্রকাশ হয়েছিল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। অপর কারণটি হল নীহারের সংরক্ষিত পুস্তক থেকে বর্তমান কর্ণধার নীতিন্দ্রনাথ জানার হাত থেকে ফটোকপি সংগ্রহ করেছি। ফলে এ নিয়ে সংশয় থাকতে পারেনা। পুস্তিকাটিতে উৎসর্গপত্র আছে। সেই উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ —

"উৎসর্গ/প্রিয় ছাত্রী/শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কোমল কররে
স্নেহর নিদর্শন স্বরূপ এহা অর্পণ কলি। — প্রাণকৃষ্ণ।"

(উৎসর্গপত্রটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭চ দ্রষ্টব্য)

উৎসর্গ লিপিটির চারিপাশে অলংকরণ করা আছে। পুস্তিকাটি ১৩ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া। উৎসর্গপত্র (১), পুষ্প অঙ্কিত পশ্চাদপত্র (১), মূল কাব্যাংশ (১০) সহ মোট ১২টি পৃষ্ঠা আছে।

রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"বিভা মঙ্গল শঙ্খ শবদ ধ্বনি,
চন্দ্রবদনী শোভাকুল নন্দিনী গো।"

এইভাবে কাব্যের শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। **'বিদায়'** অংশে কবি কাঁদনাগীতির মূল ফর্মটি তুলেছেন। রচনাটি শেষ হয়েছে এইভাবে —

"এহি সংসার মাত্র   দুঃখ আগার,

সুখ পছরে পালি   পড়ে দুঃখর গো,

জগত জন,

দুঃখ সুখ ভুঞ্জন্তি লভি জনম।

সমাপ্ত।"

কবি পরিচিতি ঃ

রচনাটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। উৎসর্গ পত্রটিতে লেখা আছে '**প্রিয় ছাত্রী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কোমল কররে স্নেহর নিদর্শন স্বরূপ এহা অর্পণ কলি।— প্রাণকৃষ্ণ।**' অনুবাদ : 'প্রিয় ছাত্রী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার কোমল করে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ ইহা অর্পণ করলাম।' — প্রাণকৃষ্ণ। এই প্রাণকৃষ্ণ নামক ব্যক্তি একজন শিক্ষক – উৎসর্গপত্র থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝে নিতে পারলাম। প্রাণকৃষ্ণ নামক ব্যক্তি আসলে এই গ্রন্থের প্রণেতা কীনা সেটা ধোঁয়াশা থেকে গেল। ওড়িশা সীমান্তবর্তী বাংলায় এবং বাংলা সীমান্তবর্তী ওড়িশায় বিবাহ উপলক্ষে স্বল্প কবিত্বশক্তিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজে নানান নীতিকথামূলক পদ রচনা করে কনেকে উপহার দিতেন। আসলে স্মৃতি থেকে হাতড়ে অল্পশিক্ষিত লোককবিগণ '**কাঁদনাগীত**'কে লিখিত রূপে প্রকাশ করে সর্বজনীন লোকসাহিত্যকে ব্যক্তি স্বাক্ষরে ফুটিয়ে তুলতেন। এইভাবে উক্ত লোকসাহিত্য এককালে ব্যক্তি থেকে সমষ্টি আবার সমষ্টি থেকে ব্যক্তি এইভাবে স্রষ্টা পরিবর্তন করে এক নমনীয় পরিবর্তনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে কাল পরম্পরায় বহমান হয়ে আসছে। আসলে এই সকল সাহিত্য সমাজের সম্পদ সমাজই এর উপভোক্তা। ব্যক্তি এই সাহিত্যকে লেখ্যরূপে সংরক্ষিত করার প্রয়াস করে আসছে। বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লোকসাহিত্যের গবেষণার কাজে পণ্ডিতগণ লোকসাহিত্যকে মুদ্রিত আকারে সংরক্ষণ করছেন। অনুরূপ অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে একজন ব্যক্তিও তার স্মৃতিপট হাতড়ে বা সমাজ থেকে উদ্ধার করে মুদ্রিত আকারে লোকসাহিত্যকে সংরক্ষণ করে চলেছেন। এই 'কাঁদনাগীত'গুলি যাতে কালের অতল তলে তলিয়ে না যায় তার জন্য এই লোককবিগণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এগিয়ে এসে নিজের প্রতিভার পরিচয় এবং উক্ত সাহিত্যের স্থায়িত্বদানে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যক্তি প্রতিভার

স্পর্শে উক্ত সাহিত্যের Text বা মূল পাঠের পরিবর্তন বা আংশিক পরিবর্তন হতে পারে হয়তো, কিন্তু কঁদনাগীতির বিশেষ ছাঁচে এই সাহিত্যগুলি নির্মিত হয়েছে।

কাব্য-কাহিনী ঃ

কাঁদনাগীতিতে কাহিনীবস্তু বা আখ্যান অংশের কোন আলাদা অস্তিত্ব থাকেনা। গায়কদের স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে কিছু অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ বা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন কিছু কল্পকাহিনীর বর্ণনা থাকতে পারে এই গানগুলির মধ্যে আদি-মধ্য ও অন্ত্য সমন্বিত কিংবা পরিনামমুখী কোন কাহিনীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। স্বাভাবিক কারণে **'সুনা ঝিঅ'** নামক এই কাঁদনাগীতিতে সেই রকম কোন মূল কাহিনী নেই, যা আছে অতীতের স্মরণীয় কিছু ঘটনার, আবেগঘন স্নেহবন্ধনের বিবরণ। এই রচনায় শোভারাণী নামক নববিবাহিতা মেয়েটি তার বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, ঠাকুরমা, বোন এবং সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এবং মনে রাখার মতো ঘটনার বিবরণ দিয়েছে। এই স্মৃতিগুলি নারীজীবনের অতীত শৈশবকে নাড়া দিয়ে যায়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

'সুনা ঝিঅ' পুস্তিকাটিতে আমরা দেখি পিতা-মাতা তার কন্যাকে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে চলার মতো নীতিশিক্ষা প্রদান করছেন। বধূরূপে কন্যা যখন পরের ঘরে যাবে তখন নতুন পরিবেশে সবকিছুকে মানিয়ে চলতে হবে। শ্বশুর ঘরের রীতিনীতি তাকে আত্মস্থ করতে হবে, সংসারে মঙ্গলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কাব্যটির একস্থানে কন্যাকে খাদ্যের বাদ-বিচার করতে না বলছেন তার জননী–

"মো 'সুনাঝিঅ' বোলি বোলিবে জন,
মুঠী পখাল অবাবাসী তোরানী,
বাছিবু নাহি কেবে মো মা রাণী,
যাহা পাইবু
পাদোদক পাইলে তাহা খাইবু। " (পৃষ্ঠা - ৭)

বঙ্গানুবাদ :

আমার 'সোনার মেয়ে' বলে ডাকিবে সবে,
মুড়ি, পান্তা, বাসি আমানি,
বাদ বিচার কভু না কর মামনি,
যখনি পাইবে–
চরণ ধোয়া জল তখনি খাইবে।

স্বামীর প্রতি করণীয় কর্তব্যের কথা মা তার মেয়েকে মনে করিয়ে দিয়েছে সুন্দরভাবে —

"পতিহি স্বর্গ তোর পতিহি গতি,
মতি রখিলে হেবু মুকতি,
পতি দেবতা
চরণ পুজি হুঅ তু পতিব্রতা।
** * * * * * * * * * * * * **
প্রাণ ঈশ্বর,
মণি করিবু পদে কোটী জুহার
পতি তো গতি পুণি হৃদি সম্পত্তি,
সে পতি রত্ন হৃদে রখ সাঁইতি।" (পৃষ্ঠা - ৯)

বঙ্গানুবাদ :

পতিই স্বর্গ তব পতিই গতি,
মতি রাখিলে হইবে মুকুতি,
পতি দেবতা
চরণ পুজিয়া তুমি হও পতিব্রতা।
** * * * * * * * * * * * * **
প্রাণের ঈশ্বর
মণি করে রাখো পদে পড়িয়া,
পুণ্যবতীর গতি পতি হৃদয় সম্পত্তি,

রত্ন করি সামলে রাখো যত্ন করি অতি।

নবযুগের ধর্ম বা আধুনিক কালের রীতি-নীতি শেখাতে মা কিন্তু ভুলে যাননি। স্বামী সহবাসের নিরাপদ সময়কাল গণনা করে মিলিত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন মা। কারণ তার মেয়ে যাতে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করে সমস্যায় না পড়ে। প্রতিটি কাজে স্বামীর সাথে যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন মা—

> *"কান্ত আগমকাল রখিবু গণিরে।*
> *করি পালন নব যুগ ধরম,*
> *যুক্তি সিদ্ধান্তে কর প্রত্যেক কর্ম্ম।"* (পৃষ্ঠা - ৯)

বঙ্গানুবাদ :

> *কান্ত আগমনের দিন মনেতে গণিও।*
> *পালন করিও নব যুগের ধরম;*
> *যুক্তি সিদ্ধান্তে কর প্রত্যেক করম।*

অন্যান্য **'কাঁদনাগীত'** বিষয়ক গানে কথোপকথন ভঙ্গিতে নানা চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু এই 'সুনা ঝিঅ' নামক রচনায় ব্যতিক্রম এই যে, শুধুমাত্র মায়ের দেওয়া প্রবোধবাক্য বা নীতিবাক্যই লক্ষ্যনীয়। কবির ভাষা ব্যবহারে সচেতনতা ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করা যায়। লোককবির সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষা এখানে শিক্ষিত প্রতিভার স্পর্শে পরিবর্তন হয়েছে। পুস্তিকাটির উৎসর্গপত্রে প্রাণকৃষ্ণ নামক জনৈক শিক্ষকের পরিচয় আছে। কাব্যটিতে কবি পরিচিতি নেই। যদি প্রাণকৃষ্ণ স্বয়ং পুস্তিকাটির প্রণেতা হন, তাহলে শিক্ষিত প্রতিভার ছাপ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এই রচনায় শোভারাণীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর সময় তাঁর মা যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা সম্পর্কিত উপদেশগুলি অন্যতম। মা বলছেন —

> **"সেজু শেষ বসন টেকি যতনে,**
> **শুখাই দেবু নীতি খরা পবনে,**
> **দুষিত কীট,**
> **মরিবে ন সহিন কিরণ আন্টরে।"** (পৃষ্ঠা - ৬)

অর্থাৎ বাসন মাজার পর তাকে ভালোভাবে রোদ-হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। কারণ সূর্যের কিরণে দুষিত কীটানু (জীবানু) মারা যাবে। বাসন-কোষণ জীবানুমুক্ত হবে। অন্য এক অংশে মা বলছেন —

"অফুটা ভাত কিম্বা অসনা বস্ত্র,
অটন্তি পরস্পরে রোগর মিত্র রে,
সেথিকু চাঁহি,
অপরিচ্ছন্ন কেবে তু হবু নাহি রে।" (পৃষ্ঠা - ৭)

উপরোক্ত অংশটিতে মা তার মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, না ফোটা ভাত এবং বাসি কাপড় দুটোই শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ভাত সুসিদ্ধ না হলে কিংবা বাসি কাপড় না ধূলে রোগ অনায়াসে দেহে বাসা বাঁধে। এই কথা ভেবে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। রান্না করা ব্যঞ্জনে খাওয়ারে যাতে পোকা ও মাছি না বসে এবং খাওয়ারে যাতে ঢাকনা দেওয়া থাকে তার জন্য মায়ের উপদেশ এইরূপ —

"ভাত তিয়ন ভজা রান্ধিন বেগে,
ঢাঙ্কুনী হোইবু তু অতি সরাগে রে,
নোহিলে পোক
মাছি বসিলে ঘরে টেকিবে নাক রে।" (পৃষ্ঠা - ৭)

ঢাঙ্কুনী = ঢাকনা, পোক = পোকা

ছন্দ ঃ

'সুনা ঝিঅ' গীতিটির চরণান্তিক মিল এবং ৭+৫ মাত্রার চরণ বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। রচনাটি যেহেতু গানের জন্য রচিত ফলে প্রত্যেক চরণের শেষে ধ্রুবপদ সংযোজিত আছে। করুণ আবহকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ধ্রুবপদগুলিকে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ রূপে রচনার একটি অংশ উল্লেখ করা যায় —

"দুধ কদলী খোই বড়াই মাতা, ৭+৫
কাটিল শেষ মোর স্নেহ মমতা, গো ৭+৫
কেমন্তে কাল—
কাটিবি ভুলি, মাতা তো স্নেহ কোল, গো।" ৭+৫

রচনাটিতে ছন্দ প্রয়োগে কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই মাত্রা বিন্যাসে গীতিটি রচিত।

অলংকার ঃ

'সুন ঝিঅ' গানটিতে উপমা অলংকারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গানটির শেষাংশ অর্থাৎ **'বিদায়'** অংশে প্রযুক্ত একটি পূর্ণোপমা অলংকারের উদাহরণ —

"বাড়ী কদলী পরা কাঁন্দিরে পচে,
বাপ খবর ঝিঅ সভারে নাচে, গো—" (পৃষ্ঠা - ১২)

অর্থাৎ কবি বলছেন মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাগানের কলা যেমন পাড়তে দেরি করলে কাঁদিতেই পেকে পচে যায় ঠিক যুবতী মেয়েকে বাপের বাড়িতে ঠাঁই দিলে **'সভায় নাচে'** অর্থাৎ চরিত্রভ্রষ্টা হয়। এক্ষেত্রে উপমেয় = ঝিঅ (মেয়ে), উপমান = কদলী (কলা), সাধারণধর্ম = পচনশীলতা বা চরিত্রভ্রষ্টতা, সাদৃশ্যবাচক শব্দ = পরা (পারা)। সুতরাং এটি পূর্ণোপমা অলংকারের উদাহরণ। এছাড়া একটি রূপক অলংকার প্রয়োগ হয়েছে এইভাবে —

"জীবন-ভেলা মোর দুঃখ স্রোতরে,
ভাসে অথয়ে দেখি মো প্রাণ থরে, গো—

অর্থাৎ দুঃখ রূপ স্রোতে মেয়েটির জীবন রূপ ভেলা ভেসে চলেছে অথৈ জলে। **'জীবন-ভেলা'** এবং **'দুঃখস্রোত'** এই দুটি রূপক অলংকার একে অপরের কারণ হওয়ায় উদাহরণটি পরম্পরিত রূপক হয়ে উঠেছে।

ভাষা ঃ

'সুনা ঝিঅ' গানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল তথা বাংলা ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী মানুষের মুখের ভাষা। এই গানে যেসব শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশ শব্দ ওড়িশা সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের প্রচলিত কথ্য ভাষার শব্দরূপ ও ক্রিয়াপদ। চুলী = চুলা বা উনুন, পাঁউশ = ছাই, ছঞ্চ = ন্যাতা দেওয়া, পোখরী = পুকুর, ভাতুনী = ভাতের জল, লুগা = শাড়ি, তোরাণী = আমানি, চাউল = চাল, কতি = কাছে, দরফুটা = সুসিদ্ধ না হওয়া, পেজ = ভাতের ফ্যান, পোক = পোকা, ওলাই = উপর থেকে নীচে নামানো, উছাড় = আড়াল, হলদী = হলুদ, কশন = অত্যাচার, চুগুলি = পরচর্চা, সাহিপড়োশী = পাড়াপড়শি ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ এই গানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই শব্দগুলি ওড়িশা প্রান্তবর্তী বাঙালির কথ্যভাষায় উচ্চারিত হয়।

গ্রন্থ ৩. জেমা রোদন, কবি-বনমালী ঃ

বনমালী ভণিতায় **'জেমা রোদন'** নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা নীহার প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু কাঁদনাগীতি। এই পুস্তিকাটিতে কবি বনমালী রচিত **'অলসী বহু গীত'** শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র রচনাও সংযুক্ত আছে। আলোচনার সুবিধার্থে এই অংশে কাঁদনাগীতির বিষয়বস্তু নির্ভর **'জেমা রোদন'** গানটিকে আমরা বিশ্লেষণ করবো। এর পরবর্তী অংশে **'অলসী বহু গীত'** রচনাটি আলোচিত হবে।

'জেমা' কথার অর্থ রাজকন্যা। এক্ষেত্রে বাপ-মায়ের আদরের ধন। বাপ-মা যতই দরিদ্র হোকনা কেন মেয়ে তাদের কাছে রাজকন্যা। **'জেমা'** একটি ওড়িশা শব্দ। জেমা শ্বশুরবাড়ি যাবে। মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় পিতামাতা তাকে শান্ত্বনা দিচ্ছেন। ৩৫টি পদবন্ধে কবি বনমালী **'কাঁদনাগীতি'**র মাধ্যমে এই রচনাটিকে উপস্থাপন করেছেন। পুস্তিকাটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৫২ ক্রিস্টাব্দে কাঁথির নীহার প্রেস হতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদপত্রে সংস্করণ সংখ্যার উল্লেখ নেই। **'জেমা রোদন'** পুস্তিকার প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

"জেমা রোদন/= * =/**কৃাথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত/**

=*=/সন ১৩৫৯ সাল/মূল্য - ছয় পয়সা মাত্র।"

(প্রচ্ছদপত্রটির ফটোকপি পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭ছ দ্রষ্টব্য)

প্রচ্ছদপত্রটির চারিপাশে অলংকরণ করা হয়েছে। পুস্তিকাটি ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৯ সেন্টিমিটার চওড়া। প্রচ্ছদপত্র (১), আভ্যন্তরীণ প্রচ্ছদপত্র (১), মূল কাব্যাংশ (জেমা রোদন ৫+ অলসি বহুগীত ৪), পশ্চাদ প্রচ্ছদপত্র (১) সহ সাকুল্যে ১২টি পৃষ্ঠা আছে। উল্লেখ্য এই যে, বনমালী রচিত **'জেমা রোদন'** এর সঙ্গে **'অলসী বহুগীত'** রচনাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। **'অলসী বহুগীত'** যেহেতু কাঁদনাগীতি নয় সেইহেতু এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু এই ক্ষেত্রে পর্যালোচিত হবে না।

'জেমা রোদন' রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"জেমা রোদন

— ০ —

শুণ রমণীবৃন্দ জেমা মেলাণি ছান্দ

দোষ ন ধরিব মুহি লেখুছি পদ। ১"

কবি কাব্যাংশটি শেষ করলেন এইরূপ —

"হান্দোলারে বসিলে জেমা বিদায় নেলে

চাকর নফর কেতে সঙ্গরে গলে। ৩৪

শ্বশুর নিবাস জেমা হেলে প্রবেশ

পদ লেখে বনমালী হোই বিরস। ৩৫"

কবি পরিচিতি ঃ

'পদ লেখে বনমালী হোই বিরস' এই চরণটিতে কবির নামোল্লেখ ছাড়া কাব্যের কোথাও কবির পরিচয় নেই। সুতরাং এই বনমালী একজন লোককবি। এর জন্মস্থান বা অন্যান্য পরিচিতি কাব্যাংশে পাওয়া যায় না।

কাব্য-কাহিনী ঃ

'জেমা রোদন' পুস্তিকাটি অতি ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা। কবি বনমালী এই রচনায় জেমার পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে রওনা হওয়ার দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। জেমা প্রথমে মায়ের কাছে জানতে চেয়েছে —

"মোতে জনম দেই দেউঅছ পঠাই
পর ঘরে দিন কাল কাটিবা পাঁই।
মাতা কি কর্ম্ম কল মোতে বড়াই থিল
এতে দিনে তুম্ভ কোল ছড়াই দেল।" (পৃষ্ঠা - ১)

বঙ্গানুবাদ ঃ

মোরে জনম দিয়ে দাও কেন পাঠায়ে
কেমনে কাটাব দিন পরের আলয়ে।
মাতা কি কর্ম্ম ফলে লালন করলে কোলে
এতদিনে কোল থেকে কেন ছাড়ালে ?

এইভাবে একে একে বাবা, দাদা, ভাই, বোন, কাকা, কাকিমা ও ঠাকুমা প্রত্যেকের কাছে অশ্রুবিগলিত ক্রন্দনে জেমা তার ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতিগুলি বলতে থাকে। অপরদিকে তার আপনজনেরা তাকে প্রবোধ দিতে থাকে। তার চোখের জল মুছে দিয়ে তাকে শান্ত্বনা দিয়ে বিদায় জানাতে থাকে। জেমার খুড়িমা তাকে অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রবোধ দেন এইভাবে —

"সত কহুছি জেমা ভাদ্র মাসর গম্ভা
তহিঁ কি আসিব আউ নুহ বিমনা।" (পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ ঃ

সত্যি বলছি জেমা ভাদ্রে পূজিব গমা
ফিরাবো সেদিন ওরে কাঁদিস নে মা।

বৌদি শান্ত্বনা দিচ্ছেন এইরূপ —

"চন্দ্র কুমুদ ভাব দিনে তোর হইব
যাহাকু যাহা ঘটাই অছি দইব।" (পৃষ্ঠা - ৫)

বঙ্গানুবাদঃ

চন্দ্রকুমুদ প্রীতি পাবে তুমি যথারীতি
কপাল গুনেতে পতি লেখে প্রজাপতি।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

'জেমা রোদন' রচনাটি প্রথাগত কাঁদনাগীতির রীতিবৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে লোককবি বনমালী জেমার জায়গায় নিজেকে নিয়ে এসেছেন। রমনীবৃন্দের উদ্দেশ্যে কবি বললেন —

"শুন রমনীবৃন্দ জেমা মেলাণি ছান্দ
দোষ ন ধরিব মুহি লেখুছি পদ।"

অর্থাৎ রমনীবৃন্দের জন্য তিনি জেমার বিদায় দৃশ্যটি ছন্দোবদ্ধ পদে রচনা করছেন। ১ থেকে ৩৫ সংখ্যক পদ রচনা করে কবি বনমালী কাব্যের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

ছন্দঃ

ত্রিপদী ছন্দে কবি এই গানটি রচনা করেছেন। প্রত্যেক ত্রিপদীকে সংখ্যার দ্বারা সূচিত করে মোট ৩৫টি ত্রিপদীর মাধ্যমে কাব্যটি রচনা করেছেন। ৭+৭ + (৮+৫) মাত্রা গণনায় ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ করেছেন কবি —

"জেমা কাতর বাণী পিতা কর্ণরে শুনি ৭+৭
বুঝাই কহন্তি জেমা/ন ভাব পুণি। ৮+৫ (পৃষ্ঠা - ৩)

অথবা -

নিতিপ্রভাতু উঠি সারি দেবু পাইটি ৭+৭

সন্ধ্যাবেলে দেউথিবু/সন্ধ্যা আরতি। (৮+৫)

অলংকারঃ

রচনাটিতে অলংকার ব্যবহারের সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। দুয়েকটি ক্ষেত্রে উপমা অলংকারের প্রয়োগ করেছেন কবি, যেমন —

চন্দ্র কুমুদ ভাব দিনে তোর হইব

যাহাকু যাহা ঘটাই অছি দইব। (পৃষ্ঠা - ৫)

অর্থাৎ জেমাকে তার বৌদি শান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে, চন্দ্র এবং কুমুদিনীর যে প্রেম সেই প্রেম জেমা তার বরের কাছ থেকে পাবে। **‘জেমা রোদন’** রচনাটিতে অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি বনমালীর বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ভাষাঃ

ওড়িয়া ভাষায় এই কাঁদনাগীতিটি রচিত হলেও বাংলা ভাষার শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। ওড়িশা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্রিত যে কথ্যভাষা প্রচলিত আছে তার শব্দরূপ ও ক্রিয়াপদগুলির একটি বৃহৎ অংশ এই রচনাটির মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন শাশু = শাশুড়ি, দেউছ = দিচ্ছ, জগি = চোখের আড়াল না করা, ঝিঅ = কন্যা, সবু = সকল, গন্ধা = ভাদ্র মাসের পূর্ণিমায় গোসম্পদ রক্ষার্থে পূজিত লোকদেবতা, ভাউজ = ভ্রাতৃজায়া ইত্যাদি শব্দগুলি উক্ত অঞ্চলের কথ্যভাষায় প্রচলিত আছে।

প্রকারভেদঃ

আমাদের এই অধ্যায়ে **‘কাঁদনাগীত’** বিষয়ক তিনটি পুস্তিকার বিষয়বস্তু ও সেগুলির বিশেষত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। **‘গেহ্লা ঝিঅ’**, **‘সুনা ঝিঅ’** ও **‘জেমা রোদন’** এই তিনটি কাঁদনা গীতির পাঠগুলি ভিন্নরকমের হলেও এগুলির মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আছে। কাঁদনাগীতি আসলে লোকজীবনের শোক ও দুঃখ প্রকাশের সাংগীতিক অভিব্যক্তি। মানব জীবনে শোক ও দুঃখের নানাবিধ কারণ থাকে। কিন্তু বিষয়বস্তুগত বিচারে **'কাঁদনাগীতি'** প্রধানত দুই ধরনের হয়, যথা — **১. কন্যা বিদায়ের গান** ও **২. মরণযাত্রার গান**। আমাদের গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ের আলোচ্য অংশের শর্ত যেহেতু নারী জীবনের সমস্যাকেন্দ্রিক সাহিত্যের পর্যালাচনা ও বিশ্লেষণ সেই হেতু আমরা কন্যা বিদায়ের বিষয়কে নিয়ে তিনটি কাঁদনাগীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

গানগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এগুলি **(ক)** অশ্রুসজল **(খ)** সমষ্টির দ্বারা গীত **(গ)** রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ **(ঘ)** নীতি উপদেশ মূলক ও **(ঙ)** যন্ত্রানুসঙ্গ বর্জিত লোকগান। এই গানগুলির **(চ)** নির্দিষ্ট পাঠ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন নতুন পাঠের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। প্রথম দিকে কাঁদনাগীতিগুলি নারী ও পুরুষ (বাবা, কাকা, দাদা) উভয়ে গাইলেও পরে এই গানগুলি শুধুমাত্র নারীরা পরিবেশন করেছেন। এই গানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও **(ছ)** প্রথাকেন্দ্রিক — কারণ কন্যাবিদায়ের সময় কাঁদনাগীতি না উচ্চারিত হলে পিতৃগৃহে অমঙ্গল হয়। ফলে কন্যাবিদায়ের কালে সমবেত মহিলারা কাঁদনাগীতিতে অংশগ্রহণ করাটাকে মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেন। সচরাচর মধ্যবয়স্কা তথা প্রৌঢ়ারা এই গানে গলা মেলান। গানগুলির বর্ণিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলেও সেগুলির **(জ)** আদল একই ছাঁচে ফেলা এবং উপস্থাপন ভঙ্গি অভিন্ন। **(ঝ)** খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্র গানগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গীতিকা বা বড় গানের মতো দীর্ঘ আখ্যায়িকার ব্যবহার এখানে নেই।

এই সাহিত্যে নারী জীবনের অনিবার্য নিয়তির কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। গুরুজনেরা কন্যার প্রতি নীতি-উপদেশ ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান করেছেন। সমাজচিত্র, পরিবার জীবন, রাজনীতি, কন্যাপণের প্রথা, বিবাহের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতির চিত্র ফুটে ওঠে এই সব সঙ্গীতে।

গঠনগত দিক থেকে এই **'কাঁদনাগীত'** বা কন্যা বিদায়ের গানে ধুয়ো বা ধ্রুবপদ বিশিষ্ট পংক্তি লক্ষ্য করা গেছে। আসলে এই গান একক গীতি নয়, একাধিক নারীর সমবেত গীতি। মূলত নারীরা এই গানের অংশগ্রহণকারিণী। মূল চরিত্র এই গানে কন্যা। কন্যাকে কেন্দ্র করে মা, পিসি,

মাসি, বোন, বৌদি এবং বান্ধবী ও অন্যান্য প্রতিবেশিনী সকলে এই গানে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং ধ্রুবপদের ব্যবহার বা ধুয়ো ধরার রীতিটি এই বিশেষ লোকগীতিতে প্রযোজ্য। এই গানের লয় প্রলম্বিত। করুণ সুরকে প্রবাহিত করে তোলবার ক্ষেত্রে ধ্রুবপদ বা গানের ধুয়ো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেক সময় একই শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশ সমান্তরালভাবে চরণ থেকে অন্য চরণে উচ্চারিত হয়ে Parallalism বা সমান্তরলতা সৃষ্টি করে।

গানের শেষাংশে থাকে কবির প্রবোধ বাক্য বা **'মন্তব্য'** যা স্বতন্ত্র অংশ বিশেষ। যদিবা কবি-পরিচিতি অস্পষ্ট। যেহেতু এটি লোকসঙ্গীতের ধারা, সেইহেতু কবি পরিচিতি ক্রমশ মুছে গিয়ে একটি সমাজের সম্পদ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র নামটি উল্লেখ করেছেন মাত্র।

এই সকল গীতির Text বা মূল পাঠটি অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মাধ্যমে নতুন Text এর জন্ম হয়। **''মা, বাবা, মামা ইত্যাদি স্বজন আত্মীয়ের কাছে কি বলে কাঁদা হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ (Text) আছে এবং তার কথান্তরও পাওয়া যায়। এইসব গানগুলিতে নারীর জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা করুণ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। শত অভাব অনটনের মধ্যেও মেয়ে মা-বাবার কাছে হাসত-খেলত, স্নেহ-আদরের মধ্যে বড় হয়। সেই মেয়ে হঠাৎ একদিন শাশুড়ি-ননদ-জা কন্টকিত শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়। সেখানে শুরু হয় স্নেহ মমতাহীন নিষ্করুণ এক জীবন। কাঁদনাগীত নারীর সেই নিষ্করুণ জীবনালেখ্য।''**[৩১]

এই গানগুলি উদ্ভব হয়েছে মূলত ওড়িশার গ্রামীণ জীবন থেকে। পরবর্তীকালে প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের লোকজীবনে প্রবেশ করে এবং আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাঁদনাগীতির মাধ্যমে পিতা-মাতা ও অন্যান্য আপনজনেরা কন্যার সাথে তার শৈশবকালের স্নেহসম্পর্কের মুহূর্তগুলি বর্ণনা করেন এবং শ্বশুর বাড়িতে সকলের সাথে মানিয়ে চলে বা সকলের মন জয় করে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে তার জন্য নীতি উপদেশ দান করেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের চরণতলে নারীর শুধু আত্মসমর্পণ নয়, কাঁদনাগীতিগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। **'সুনা ঝিঅ'** নামক কাঁদনাগীতিতে মেয়েটি বলেছে —

''পুঅ জনম খ্যাতি দেশ দেশকু,

ঝিঅ জনম সিনা ঘর কণকু

এহা উচিৎ;" (পৃষ্ঠা - ১২)

অর্থাৎ পুত্রের খ্যাতি ও গুরুত্ব দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু কন্যা সারাটি জীবন ঘরের কোণে বদ্ধ থাকে — এটাকি উচিৎ? এই গানটিতে মেয়েটি তার বৈবাহিক জীবনের বন্দীদশা কিছুতেই মেনে নিতে পারবেনা বলে তার মাকে জানিয়ে দেয়। মেয়েটি তার মাথার উপর চায় মুক্ত আকাশ। তৎকালীন সমাজে কন্যার বাবাকে পণ দিয়ে পাত্রকে পাণিগ্রহণ করতে হতো। এই পণের লোভে অনেক দুধের সন্তানকে বেচে দিত পিতা। এইরকম নিষ্ঠুর পণপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছে **'গেহ্লি ঝিঅ'** গানটিতে গেহ্লি নামের মেয়েটি —

"ডেঙ্গা তালগছ বাটকু ছাই। মাগো—
এতে কুট কলে মঝিয়া ভাই।। ঐ
বাপা শোই থিলে উত্তর ঘর। ঐ
টঙ্কা পঁহুছিলা দাণ্ড দুয়ার।। ঐ
যঁহু যঁহু টঙ্কা ধূব দিশিলা। ঐ
তঁহু তঁহু বাবার লোভ বসিলা।। ঐ" (পৃষ্ঠা - ১)

লম্বা তালগাছ যেমন পথের পথিককে ছায়া দেয়না, ঠিক তেমন মাথার উপর বাবা-দাদাও জীবনে শান্তি দিতে পারে না। মেজদা কুট-চক্রান্ত করে বরের কাছ থেকে পণ আদায় করে আনেন। উত্তর দিকের ঘরে বাবা শুয়েছিলেন। মেজদা তার কাছে টাকা পৌঁছে দিলে বাড়ির উঁচু দাওয়ায় বসে টাকা গুণে নেন এবং ধূতির কোঁচড়ে বেঁচে নেন। বাবার চোখে টাকাগুলি যতই চকচক করে ততই তার টাকার প্রতি লোভ বাড়ে। নারীর প্রতি পরিবারের পুরুষ তথা বাপ-দাদার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছে হতভাগিনী মেয়েটি। সুতরাং নারীর স্বাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নিষ্ঠুর পণপ্রথার তীব্র প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় এই সকল কাঁদনাগীতিগুলিতে।

এই কাঁদনাগীত ঠিক কোন সময়ে এবং কীভাবে রচিত হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারার মতোই কোন এক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত থেকেই এই গানের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনা থেকে বিষয়গুলি উঠে এসেছে গানের

মাধ্যমে। তবে গৌরীদান ও বাল্যবিবাহের সময় থেকে এই কাঁদনাগীতির প্রচলন হয়ে আসছে বলে আমাদের ধারণা। পরবর্তীকালে বেশি বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কিংবা ভালোবেসে বিয়ে করার কারণে লোকসমাজ থেকে কাঁদনাগীতির প্রচলন ধীরে ধীরে উঠে যায়। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা মানুষের সাথে দুধের সন্তান ঘর করবে আর তার উপর শাশুড়ির শাসন ও গঞ্জনা সহ্য করে পরের ঘরে কীভাবে মানিয়ে চলবে — এই নিয়ে কন্যা ও আপনজনের মনে সংশয়ের মেঘ জন্মে। তখনই আবেগ ঘণীভূত হয়ে অশ্রু ও সুরের মাধ্যমে কাঁদনাগীতি হয়ে ফুটে ওঠে। ফলে অন্যান্য লোকগীতির মতো এই লোকগীতিতে Situation বা পরিস্থিতি নির্ভর আবেগমথিত কাব্যভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আজকের দিনে সিনেমার গান দিয়ে কন্যা বিদায়ের মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। এখন নীরবে অশ্রুমোচন করে পূর্বপরিচিত মানুষটির সাথে সাবালিকা কন্যা অতিশীঘ্র মোটরগাড়ি করে শ্বশুরবাড়িতে রওনা হয়। কাঁদনাগীতি পরিবেশনের মতো পরিস্থিতি ও সময় দুটোরই অভাব এবং কেঁদে ভাসাবার মানসীকতাও প্রতিবেশিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। এ সম্পর্কে **'আনন্দবাজার পত্রিকা'**র একটি প্রতিবেদন ঃ

> ***"একসময় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার ঘরে ঘরে কাঁদনাগান গাওয়া হতো। কিন্তু সময় বদলেছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বদল হয়েছে। ধীরে ধীরে কমেছে কাঁদনাগান গাওয়ার প্রবণতা। এখন তো লোকসাহিত্যের এই ধারাটি শুকিয়ে যেতে বসেছে।"***[৩২]

ওড়িশা সীমান্ত বাংলার ভূমিপুত্ররূপে এই গানগুলি শৈশবকাল থেকে আমাদের মনের সুকোমল অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে এসেছে। আমরা আমাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হলে এই ক্ষীয়মান সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবো। **'কাঁদনাগীতি'**র সংগ্রহ, সম্পাদনার দ্বারা আগামী প্রজন্মকে বোঝানো যাবে যে, এইরকম এক গানের ঐতিহ্য ওড়িশা ও বাংলা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে এককালে প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থ ৪. অলসী বহু গীত, কবি - কবি পরিচিতি অনুপস্থিত ঃ

আলোচ্য অধ্যায়ে **'অলসী বহু গীত'** ও **'পরশমণি'** শিরোনামের দুটি রচনার প্রসঙ্গ নিয়ে

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। **‘অলসী বহু গীত’** রচনাটি পূর্বে আলোচিত **‘জেমা রোদন’** পুস্তিকাটির শেষাংশে সংযুক্ত আছে। **‘জেমা রোদন’** এর মতে **‘অলসী বহু গীত’** রচনাটি নারী জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা হলেও দুটি রচনার প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন। **‘জেমা রোদন’** রচনাটি কাঁদনাগীতির রূপরীতিতে লেখা অপরক্ষেত্রে **‘অলসী বহু গীত’** -এ বধূর প্রতি শাশুড়ির বিদ্রুপাত্মক আক্রমণ ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। দুটি রচনা যেহেতু লোককবি বনমালীর লেখা সেইহেতু একই পুস্তিকায় ধরা আছে। উল্লেখ্য যে রচনা দুটি নারীকেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে লেখা হলেও ভিন্নতর প্রসঙ্গে নারী সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে **‘অলসী বহু গীত’** পুস্তিকাটির স্বতন্ত্র প্রচ্ছদপত্র না থাকায় **‘জেমা রোদন’** পুস্তিকার প্রচ্ছদপত্রটি **(পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭ছ)** দ্রষ্টব্য এছাড়া এই রচনার কবি বনমালী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি সে সম্পর্কে যা **‘জেমা রোদন’** -এর আলোচনায় বলা হয়েছে। **‘অলসী বহু গীত’** রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

“মোর অলসী বহু
তাকু মাড় মার নাহি আউ গো। (পদ)”

এই অংশটি মূল পদ। এরপর চার চরণের স্তবক বিশিষ্ট ১ থেকে ১২ সংখ্যক স্তবক পর্যন্ত অলস বধূটির প্রতি নির্মম সমালোচনা করছেন শাশুড়ি। প্রতিটি স্তবকে মূল পদটি ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হবে এবং একটি Parallalism বা সমান্তরতলা সৃষ্টি হবে। এই বৈশিষ্ট্য বাংলার লোকগীতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এই Parallalism এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[৩৩] Parallalism এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘সহচারবাদ’। **‘অলসী বহুগীত’** বা কাঁদনাগীতিগুলিতে রচনার সারবক্তব্য নির্ভর মূল চরণটি প্রতিটি পদের শেষে ঘুরে ফিরে আসে এবং সমবেত সঙ্গীতের **‘সহচারবাদ’** শৈলীটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

কাব্য-কাহিনী ঃ

‘অলসী বহুগীত’ রচনাটির স্বতন্ত্র কাহিনীবস্তু বলে কিছুই নেই। বৌমার ত্রুটীগুলিকে ধরে ধরে খোঁটা দিচ্ছেন শাশুড়ি। বউটির সম্পর্কে শাশুড়ি যে খোঁটাগুলি দিয়েছেন তা হল বৌমার শরীরটা পুঁই ডাঁটার মতো সরু। ঢেঁকিতে ধান ভানলে চালে তুঁষ থেকে যায়। ভাত মুখে দেওয়া যায়না তুঁষের কারণে। মাথায় আলুথালু চুল অথচ সে প্রতিদিন চুল ধূয়ে পরিষ্কার করে। ‘ন’মাসে

ছ'মাসে' অর্থাৎ কালে-ভদ্রে দাঁত মাজে আর বছরে একবার খোঁপা বাঁধে। অলস বউটি যখন তখন গায়ে জ্বর উঠেছে বলে গৃহকর্মে ফাঁকি দেয় কিন্তু খাওয়ার সময় গা থেকে ঝেড়ে জ্বর নেমে যায় এবং বিছানা ছেড়ে উঠে বাগানের বেগুন ঝোল দিয়ে দুপুরের গরম ভাত খেয়ে নেয়। কবি বর্ণনা করলেন এইভাবে—

''অলসী বোহুকু জ্বর করিথাএ

খাইবা বেলকু ভল

দ্বিপহরিয়া গরম ভাতকু

বাড়ি বাইগণ ঝোল গো। ৪" (পৃষ্ঠা - ৬)

বউটি চলন ভালো নয়, ঠিকঠাক চলতে পারেনা, পা বাঁকিয়ে হাঁটে। অথচ মেয়েটির বাপ ষোল টাকা পণ নিয়েছে। ভোর ভোর বিছানা না ছেড়ে কয়েক প্রহর বেলায় বিছানা থেকে ওঠে। তারপর পুকুরঘাটে গিয়ে সুগন্ধী সাবানে দেহ মাজে। স্নান সেরে আলতা পায়ে পাট করা নীলশাড়ি পরে নেয়। এক তো চ্যাপ্টা নাক, তার উপর বড় একখানি নোলক পরে নেয়। আহা কী সুন্দর দেখায় তাকে। শামুকের মতো মুখ, জগন্নাথের চোখের মতো চোখ। মুলো-বেগুনের মরশুমে তার মুখে জাড়ি বের হয়। ফলে বাগানের মুলো-বেগুন খেতে পারেন, ভীষণ কষ্ট হয় —

''অলসী বোহুর কল খাউথাএ

মুলা বাইগণ কালে

চুন সঙ্গে লালী খইর মিশাই

পান যাঁকিথাএ কলে গো। ৯" (পৃষ্ঠা - ৭)

মুলো-বেগুন খেতে পারেনা, অথচ চুনের সঙ্গে লাল খয়ের মিশিয়ে সারাক্ষণ গালে পান গুঁজে রাখে — এতে তার কোন অসুবিধা হয়না। সুন্দরী বউটির হাতে সরু সরু শাঁখা, এমন ভাব-ভঙ্গিতে কথা বলে যে তখন তার মূল্য হয় লাখ টাকা। বউটি তার স্বর্গের তারা। তার হাতে বাজুবন্ধ শোভা পায়। মার খেতে খেতে হাড় গুড়িয়ে গেল, সে আর কত সহ্য করবে। কলিকালের রীতি-নীতি দেখে কবি বনমালী ভেবে-চিন্তে কবিতাটি লিখলেন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আজকাল অলস বউদের 'বাসুয়া' অর্থাৎ স্ত্রৈণ স্বামী বিধাতা জুটিয়ে দেন —

"কলিকাল রীতি দেখি বনমালী

ভাবি কলা এ কবিতা

অলসী বহুকু বাসুয়া মরদ

ঘটাই দেউছি ধাতা গো। ১২" (পৃষ্ঠা - ৮)

'অলসী বহু গীত' রচনাটিতে বউটির বর্ণনা কবি এইখানে শেষ করেছেন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

কলিকালে গৃহবধূর প্রতি শাশুড়ির দোষারোপ বা ত্রুটী-বিচ্যুতি ধরে খোঁটা এই সকল পুস্তিকার বিষয়বস্তু। বধূর রূপ-গুণ, কর্ম, খাদ্যাভ্যাস, বাক্যাভ্যাস, চলন-বলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, পতিপ্রেম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দোষারোপ করা হয়েছে এই বিশেষ ধরণের রচনাগুলিতে। উল্লেখ্য এই যে, গৃহবধূর কোন গুণাবলী বা প্রশংসা এই সকল রচনায় পাওয়া যায় না। অনেক সময় বধূটির আধুনিক শিক্ষার প্রতি ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। শিক্ষিত নারীদের নীতিশিক্ষার ঘাটতিকে শাশুড়িরা মোটেই মেনে নিতে চায়নি। অশিক্ষিত মেয়েকে গৃহবধূ করে আনলে তার নীতিশিক্ষাগত ঘাটতি অনেক ক্ষেত্রে শাশুড়ি মেনে নিলেও প্রেম করে শ্বশুরবাড়িতে আসা আধুনিকা শিক্ষিতা গৃহবধূর নৈতিক ত্রুটী-বিচ্যুতিকে শাশুড়ি ভালো চোখে নেন নি। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েটির মা অথবা বাপের বাড়ির চল বা রীতি-নীতিকে দোষারোপ করা হয়েছে। ব্যাঙ্গাত্মক শ্লেষ প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে। লোকজীবনের কৌতুকপূর্ণ কাব্যরুচির চাহিদা মেটাতে এই সকল সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। কাব্যের একটি অংশে শাশুড়ি বলেছেন—

"অলসী বহু মো দিনরু উঠই

বেল পহরক বেলে

বাস সাবুনেরে দেহ মাজুথাএ

গড়িয়াঘাটর তলে গো।"

কবি লিখলেন — 'আলসে বউমা আমার বেলা এক প্রহর হলে বিছানা ছাড়ে। তারপর পুকুরঘাটে সুগন্ধী সাবানে স্নান সারে'। কবি অন্যত্র বলেন যে, মুলো, বেগুনের সময় বৌমা এসব কিছু খায় না, কারণ চুনের সঙ্গে লাল খয়ের মিশিয়ে পান খাওয়ার কারণে গাল খয়ে যায় বলে। এইভাবে

'অলসী বহুগীত' গ্রন্থে বধূর প্রতি শাশুড়ির নির্মম খোঁটা প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয়েছে।

ছন্দ ঃ

কবি বনমালীর এই রচনাটিতে ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব ও ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব বিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চার চরণের সম্বন্বয়ে একটি স্তবক বিন্যাস করে মোট ১২টি স্তবকে রচনাটি সমাপ্ত করেছেন। রচনাটিতে মাত্রা বিন্যাসের রীতি এইরূপ —

কলিকাল রীতি/ দেখি বনমালী	৬+৬
ভাবি কলা এ ক/বিতা	৬+২
অলসী বহুকু/বাসুয়া মরদ	৬+৬
ঘটাই দেউছি/ধাতা	৬+২

অলংকার ঃ

কবি এই রচনায় দুয়েকটি ক্ষেত্রে উপমা অলংকার ব্যবহার করেছেন। শাশুড়ি তার বৌমার রোগা শরীরের সাথে পুই-ডাঁটার তুলনা করতে গিয়ে উপমার ব্যবহার করেছেন। বৌমার চোখের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখলেন —

"আঁখি দুইটি তা পসন্দ হেউছি
জগন্নাথ আঁখি পরা।"

অর্থাৎ আকারে প্রকারে জগন্নাথের চোখের মতো বৌমার চোখ। উপমেয়-বৌমার চোখ, উপমান-জগন্নাথের চোখ, সাধারণ ধর্ম অনুপস্থিত, সাদৃশ্যবাচক শব্দ — পরা (পারা)। অর্থাৎ উপমা অলংকারের একটি অঙ্গ অনুপস্থিত থাকায় লুপ্তোপমা অলংকার হয়েছে। শাশুড়িপ্রশংসাচ্ছলে বৌমার নিন্দা করেছেন পুরো রচনাটিতে। ফলে ব্যজস্তুতি অলংকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে, যেমন —

" চেপটা নাকরে ওলুমা লোলক
কেমন্ত সুন্দর দিশে।"

—অর্থাৎ বৌমার চ্যাপটা নাকে বড় একটি নোলক খুব সুন্দর দেখায়। বাস্তবে চ্যাপটা নাকে বড় নোলক সুন্দর না দেখালেও প্রশংসার মাধ্যমে শাশুড়ি বৌমার রূপের নিন্দা করতে ছাড়লেন না। ফলে এক্ষেত্রে ব্যজস্তুতি অলংকার হয়েছে।

ভাষা ঃ

'অলসী বহু গীত' রচনাটির মধ্যে বেশ কিছু ওড়িয়া শব্দ ও ক্রিয়াপদ ওড়িশা সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের মানুষের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেমন — বাড়ি = বাগান, ধান কুটা = ধান ভাঙা, কুন্ডা = কুঁড়ো, পড়িশা = পড়শি, গুণ্ডা = মুষ্টি অন্ন, ঝাঁপড়ী = এলোকেশী, গড়িয়া = পুকুর, খইর = খয়ের, শঙ্খা = শাঁখা লক্ষে = একলক্ষ, বাসুয়া = স্ত্রৈণ ইত্যাদি শব্দ।

গ্রন্থ ৫. পরশমণি, কবি - ভাবুকচরণ দাস ঃ

লোককবি শ্রী ভাবুকচরণ দাসের লেখা **'পরশমণি'** পুস্তিকাটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এগরা থানা অন্তর্গত ভবানীচকের **'পূর্ণিমা প্রিন্টার্স'** নামক একটি অখ্যাত ছাপাখানা থেকে বইটি মুদ্রিত হয়। ১৪১৪ সালে অর্থাৎ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে এই পুস্তিকাটির শেষ মুদ্রণ লক্ষ্য করা যায়। সর্বশেষ মুদ্রণের কপিটি আমাদের সংগ্রহে আছে। পরশমণি নামক ওড়িশার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামে তথা বাঙালি ঘরে বউ হয়ে আসার কাহিনী এই রচনায় বর্ণিত হয়েছে। এই পুস্তিকার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল নারীকে নীতিশিক্ষা দান। অপর এক লোককবি ভুবনমোহন জানা এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। পুস্তিকার প্রচ্ছদপত্রটি নিম্নরূপ —

> **"পরশমণি।।/বিবাহিতা নারীর চিত্র/ঃ রচয়িতা ঃ শ্রী ভাবুকচরণ দাস/**
> **প্রকাশক - শ্রী ভুবনমোহন জানা/সাং - নস্করপুর * পোঃ- আটবাটী/**
> **জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর।/সন - ১৪১৪ সাল/মূল্য - ২.৫০ টাকা মাত্র/**
> **পূর্ণিমা প্রিন্টার্স ঃ আটবাটী, পূর্ব মেদিনীপুর।"**

(পরিশিষ্ট চিত্র নং ৭জ দ্রষ্টব্য)

প্রচ্ছদটির চারিপাশে অলংকরণ করা আছে। মাঝখানে এক গৃহবধূর চিত্র অঙ্কিত। পুস্তিকাটি ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ৯ সেন্টিমিটার চওড়া। প্রচ্ছদপত্র (১), মূল কাব্যাংশ (১১) সহ সাকুল্যে ১২টি

পৃষ্ঠা আছে। রচনাটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"শুন ভাবুক জন মুহি কহুছে শুন
উৎকল দেশরে গোটিয়ে থিলে ব্রাহ্মণ।
ধন সম্পদ তার মোটে ন থিলা আর
কন্যা গুটিয়ে থিলা তাঙ্কর অতি সুন্দর।"

এইভাবে কাব্যকাহিনী বর্ণিত হয়েছে ১২ সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত। রচনাটির শেষাংশে কবি নিজের পরিচয় দিয়ে কাব্যটি সমাপ্ত করেছেন এইভাবে —

"কহে ভাবুক দাস পিতা ঁবিহারী দাস
কায়স্থ কুলরে জন্ম ধানঘরা বাস।
সমাপ্ত।"

কবি-পরিচিতি ঃ

লোককবি ভাবুক দাসের সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। ওড়িশা সীমান্তবর্তী দাঁতন থানার অন্তর্গত ধানঘরা নামে একটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া গেলেও ভাবুকচরণে জন্ম বা বসবাস সেই গ্রামে ছিল কিনা সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। কাব্যাংশ থেকে শুধুমাত্র জানা যায় কবির জন্ম কায়স্থ কুলে। পিতার নাম স্বর্গীয় বিহারী দাস এবং ধানঘরা গ্রামে তাঁর বাসস্থান। সত্তরোর্ধ বয়সী প্রকাশক ভুবনমোহন জানার কাছ থেকে কবি ভাবুকচরণের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। প্রকাশক তাঁর স্মৃতি থেকে এই লোকসাহিত্যকে উদ্ধার করে মুদ্রণরূপ দিয়েছেন মাত্র। এছাড়া কাহিনীবস্তু স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর হয়ে মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। শুধুমাত্র এই কাহিনীবস্তুকে প্রকাশক পুস্তিকার আকারে মুদ্রণ ও প্রকাশ করেছেন — এর বাইরে কবির সম্বন্ধে তাঁর কোন ধ্যান-ধারণা নেই। এছাড়া দীর্ঘদিন লোকস্মৃতিতে প্রবহমান থাকায় এইসব রচনার কবিপরিচিতি ম্লান হয়ে গেছে এবং একটি সংহত সমাজ হয়ে উঠেছে এর পৃষ্ঠপোষক। দুয়েকটি ক্ষেত্রে কবির নাম বা ঠিকানার উল্লেখ থাকলেও সেগুলি যে সঠিক একথা জোর দিয়ে বলা যায়না।

কাব্যকাহিনী ঃ

ওড়িশার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর মাইনর পাস মেয়েকে বিয়ে দিলেন এক বাঙালি পরিবারের শিক্ষিত ও চাকুরে ছেলের সঙ্গে। সীতার যখন বার বছর বয়স তখন তার বিয়ে হয়। কন্যা বিদায়ের কালে পিতা-মাতা মেয়ে সীতাকে শ্বশুরবাড়ির আদব-কায়দা কী হওয়া উচিৎ তা বোঝাতে থাকে। শ্বশুর-শাশুড়িকে বাবা-মায়ের আসনে বসাতে হয় এইরূপ নীতিশিক্ষা দেন মা-বাবা। বিবাহনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর স্বামী তার কর্মক্ষেত্রে বাসাভাড়া করে স্ত্রীকে রাখবার পরিকল্পনা করেন। স্বামীর এই সিদ্ধান্তে সীতা বাধা দেয়। সীতা এই সিদ্ধান্তে রাজী না হয়ে স্বামীকে সুপরামর্শ দেয় এইরূপ —

"শুনি পতির বাণী জোড়ী যুগল পাণি
কান্দিন কহুচি সীতা শুন গো স্বামী।
ঘরে অছি মোর বৃদ্ধ শাশু শ্বশুর
কে সেবা করিব তাঙ্কর কুহ সত্ত্বর।
ছাড়ি এ পিতা মাতা যিবি মু কলিকাতা
শুনিলে কহিব লোকে কেতে কথা।" (পৃষ্ঠা - ৪)

বঙ্গানুবাদ ঃ

শুনি পতির বাণী জোড়ে যুগল পাণি
কাঁদিয়া বলিল সীতা শুন গো স্বামী।
ঘরে আছে মোর বৃদ্ধ শাশুড়ি-শ্বশুর
কে সেবা করিবে তাঁদের কহগো সত্বর।
ছাড়ি এ পিতা-মাতা যদি যাই কলিকাতা
শুনিলে কহিবে লোকে নানাদি কথা।

স্বামী সীতাকে বোঝাতে চাইল যে, তার বড় ভাই চাকুরি করে ঢাকায়। সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে সুখে আছে। সুতরাং সীতার যেতে অসুবিধা কোথায়। দাদা যেখানে মা-বাবার দেখভাল করেনা, তাহলে তাদের কেন এত দায় — এই কথা স্ত্রীকে বোঝাতে থাকে। এই বুড়ো-বুড়িকে ধরে বসে থাকলে তাদের ক্ষতি হবে। দাদা সারাজীবন কোন কর্তব্য না করে পৌত্রিক সম্পত্তির প্রাপ্য অধিকার কেড়ে

নিয়ে যাবে—তাই জমি-জিরেত আগলে তাদের ক্ষতি বইকি লাভ কিছু হবেনা। স্বামীর এই পরামর্শ শুনে সীতা বলে—

"তুম্ভে কহিল যেতে সবু জানি মু চিতে
জন্মিবা কালরে টঙ্কা আনিছ কেতে।
ধন সম্পদ কড়ি সবু যিব যে উড়ি
যশ যে রহিব নাথ ভুবন জুড়ি।" (পৃষ্ঠা - ৫)

বঙ্গানুবাদঃ তুমি কহিলে যত মনে রয়েছে তত
জন্মের কালে টাকা এনেছ কত।
ধন সম্পদ কড়ি সব যাবে যে উড়ি
যশ যে রহিবে নাথ ভুবন জুড়ি।

এই কথা বলে সীতা তার স্বামীকে রামায়ণে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি তথা পিতৃসত্য পালনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বোঝাতে থাকে। বলতে থাকে শান্তনু পুত্র ভীষ্মের পিতৃভক্তির কথা। জন্মকালে কেউই ধনসম্পদ নিয়ে আসে না, পিতা-মাতার সাহচর্যে ও লালন-পালনের দ্বারা সন্তান শারীরিক সক্ষম হয়ে অর্থোপার্জন করতে শেখে। সুতরাং অর্থের চেয়ে পিতা-মাতা হল পরমার্থ — এই কথাটি স্বামীকে বুঝিয়েছে সে বারে বারে। স্বামী এই কথার গুরুত্ব না দিয়ে একাকি কর্মক্ষেত্রে রওনা হন। বৃদ্ধ-শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে সীতা পড়ে থাকে গ্রামে। একদিন তার ভাসুর ও জা এসে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে ঘর থেকে বুড়ো মা-বাবাকে এবং সীতাকে বের করে দিলে গোয়ালঘরে ঠাঁই নেয় তারা। বৃদ্ধ মা-বাবাকে প্রহার করে তার ভাসুর। সীতার দারিদ্রিকতার সুযোগ নিয়ে তার বড় জা তাকে অপমান করে। স্বামী কলকাতা থেকে ফিরে এলে বৃদ্ধ বাবার এইরূপ আচরণে ক্রুদ্ধ হলে সীতা তাকে শান্ত করায় এইভাবে —

"কহে সীতা তাহার কি হব ঘর দুয়ার
মা বাপ চরণ হেলা সরগ পুর
যেতে সম্পদ কড়ি সবু রহিব পড়ি
উলঙ্গ করিণ লব বসন কাড়ি।" (পৃষ্ঠা - ১১)

বঙ্গানুবাদঃ **কহে সীতা তাহার** **কি হবে ঘর দুয়ার**

মা-বাবার চরণ হল স্বর্গদুয়ার

যত সম্পদ-কড়ি **সব-ই রহিবে পড়ি**

উলঙ্গ করিবে লইয়্যা বসন কাড়ি

স্বামীর নিয়ে আসা চশমা, ঘড়ি, জুতো, দুল কিছুই নিতে চায়নি মেয়েটি, বরং বলেছে —

"সীতা সাবিত্রী উমা **নাহি গুণর সীমা**

তা মানে পিন্ধিলা কিগো জুতা চশমা।" (পৃষ্ঠা - ১২)

বঙ্গানুবাদঃ **সীতা সাবিত্রী উমা** **নাই গুণের সীমা**

কভূ কি পরেছে তারা জুতা চশমা।

আশ্চর্যজনক ভাবে সীতার এইরূপ জীবনাদর্শে তার জায়ের সুমতি ফিরে আসে। পরশ পাথরের স্পর্শে অঙ্গার যেমন মূল্যবাণ সোনায় পরিবর্তিত হয়, ঠিক তেমনি সীতার সতীত্ব, পাতিব্রত ও মহানুভবতায় একে একে পরিবারের সকলের সুমতি ফিরে আসে। একটি একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন নিমেষে জোড়া লাগে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ঘুঁচিয়ে ঐক্যবদ্ধ একটি পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সীতা তথা '**পরশমণি**'। শ্বশুর-শাশুড়ির জীবনেও ফিরে আসে শান্তি ও স্বস্তি।

'**পরশমণি**' এক নীতি উপদেশমূলক এবং ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা নির্ভর সাহিত্য। এই কাব্যের কাহিনীবস্তুতে মুখ্য চরিত্র হলেন '**সীতা**' নাম্নি এই ওড়িয়া কন্যা। বৈবাহিক সূত্রে মেদিনীপুর তথা বাংলার গৃহবধূ হয়ে আসতে হয়েছে। এই সীতা আসলে মহামূল্যবাণ '**পরশমণি**'। কবি ভাবুকচরণ দাস এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।

কাব্যটির নাম '**পরশমণি**' রেখে কবি সীতা চরিত্রের মানবিক মূল্যবোধের দিকটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ওড়িয়া ঘরের মেয়ে বাঙালি ঘরে বধূ হয়ে আসার পর অসৎ স্বামীকে সৎ পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তার অগাধ। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যবিমুখ স্বামীকে সদুপদেশ দিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় নিয়োজিত করাতে সক্ষম হয়েছে। সীতা চরিত্রের অম্লান দ্যুতিতে পরিবারের অসৎ চরিত্র সকল সৎপথে পরিচালিত হয়েছে। সীতা

তার পরশমণিসম চরিত্রের স্পর্শে কালিমালিপ্ত চরিত্রসমূহের মূল্যবোধ ও মানবিকতার জাগৃতি ঘটিয়েছে। **'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'**– এই নীতিবাক্য একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত নারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে পরিবারের ভাঙ্গনকে রুখবার প্রয়াস করেছে এই সকল সাহিত্য। ভিন্ন প্রদেশের কন্যা বঙ্গপ্রদেশে বধূরূপে এসে ছিন্নমতি পতিদেবতাকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, পিতা-মাতা আসলে অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি মানুষের জীবনে পিতা-মাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই Morality বা নীতিবোধ আসলে সীতা চরিত্রকে করে তুলেছে **'পরশমণি'**। এই পরশমণির স্পর্শে অন্ধকার হতে আলোর জগতে উত্তরণ ঘটেছে অসৎ চরিত্রের। কলকাতা শহরে চাকুরি সূত্রে স্ত্রীকে নিয়ে নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে চাইলে সতীসাধ্বী স্ত্রী সীতা স্বামীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে; কারণ শ্বশুর-শাশুড়িকে গ্রামের ঘরে ফেলে চলে গেলে লোকে স্বার্থপর বলে নিন্দা করবে। পিতা-মাতার অপরিসীম গুরুত্বের কথা সে তার স্বামীকে বোঝানের চেষ্টা করে এইভাবে–

"পাই কাহার স্নেহ　　এতে বাড়িল দেহ
খোরাকি দেবনি আজি কাহাকু কুহ ?
তুম্ভে ক্রোধ ন কর　　ক্ষম দোষ মোহর
ভল মন্দ বুঝি নাথ কর বিচার।" (পৃষ্ঠা - ৬)

বঙ্গানুবাদ :

কাহার স্নেহেতে　　বাড়িলে দেহেতে
পিতা-মাতারে আজ না চাও পালিতে।
না করিও রোষ　　ক্ষমিও সকলি দোষ
ভাবিয়া বুঝিয়া কর্ম কর প্রাণতোষ।।

এইভাবে সীতা অর্থাৎ **'পরশমণি'** স্বরূপ চরিত্রটি বাঙালি নারী জীবনের এক আদর্শ চরিত্র রূপে অঙ্কন করেছিলেন কবি।। এই গ্রন্থের প্রকাশক ভুবনমোহন জানা (একজন লোককবি)। গ্রামীণ মেলা ও হাটে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, নৃত্য-গীতের মাধ্যমে এই সকল গ্রন্থ বিক্রয় করেন। গৃহস্থ একখানি **'পরশমণি'** কিনে বৌমার হাতে অর্পণ করে একান্নবর্তী পরিবারের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। লোকশিক্ষার পাঠ্যরূপে পুস্তকাটির গুরুত্ব আজও অমলিন।

ছন্দ ও অলংকার ঃ

ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবি দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘত্রিপদী সাধারণত ৮+৮/৮+৬ মাত্রার চরণে হয়। এই রচনায় কবি ৭+৭/৮+৫ মাত্রার চরণ সাজিয়ে দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যেমন —

	"কহি এতেক বাণী	**কাঁদে দ্বিজ রমণী**	৭+৭
	আঁখিরে বহুচি তার/বরিষা পাণি।		৮+৫
অথবা	**সীতা সাবিত্রী উমা**	**নাহি গুণের সীমা।**	৭+৭
	তা মানে পিন্ধিলা কিগো/জুতা চশমা।		৮+৫

কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবি একই ছন্দের ব্যবহার করেছেন। কোন ছন্দবৈচিত্র্য রচনাটিতে লক্ষ্য করা যায়না। **'অনুপ্রাস'** ছাড়া অলংকার ব্যবহারের কোন দৃষ্টান্ত কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। নিরাভরণ ভাবে সহজ-সরল ভাষায় নারী চরিত্রের নৈতিকগুণ তুলে ধরেছেন কবি।

ভাষা ঃ

মান্য ওড়িয়া ভাষায় কাব্যটি রচিত হয়নি। বালেশ্বর জেলার গ্রামগুলিতে যে কথ্য ওড়িয়া বা উত্তরা ওড়িয়া[৩৪] উপভাষার প্রচলন আছে তার রূপ ধরা পড়েছে এই সাহিত্যে। এই উপভাষার শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপগুলি **'পরশমণি'** রচনাটিতে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ওড়িশা সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের কথ্যভাষায় বেশ কিছু ব্যবহৃত শব্দ রচনাটিতে লক্ষ্য করা যায়, যেমন — জুঁয়াই = জামাই, কুহে = কহে, কলি = কোন্দল, সুয়ারী = পালকি, বেই = বেয়ান, বাপ কালিয়া = পৈত্রিক, দউড়ি = দড়ি, গুহাল = গোয়াল, টেরি = পুরুষের চুলের ছাট ইত্যাদি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ সুবিকাশ জানা, লোকনাট্য পরিক্রমায় মেদিনীপুর, প্রথম সংস্করণ, শিলালিপি, ২০১০, পৃষ্ঠা - ২৫৬।

২. দ্রষ্টব্য ঃ সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কড়চা, পূর্ব মেদিনীপুর, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা - ক ৪।

৩. দ্রষ্টব্য ঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কানুকথা লোকমুখে (প্রবন্ধ), '**বহুবচন**' পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ১৩০।

৪. দ্রষ্টব্য ঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৫. দ্রষ্টব্য ঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৬. দ্রষ্টব্য ঃ মোহিনীমোহন সরদার, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য ও পদাবলী সাহিত্যে যৌনতা এবং যৌবনবিজ্ঞান চেতনা (প্রবন্ধ), তেহাই (পত্রিকা), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সম্পা. সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯, পৃষ্ঠা - ৩৭২।

৭. দ্রষ্টব্য ঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ (২য় খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-১৮২৮।

৮. দ্রষ্টব্য ঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৮২৮।

৯. দ্রষ্টব্য ঃ দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, অকাদেমি অব ফকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৪৮৩।

১০. দ্রষ্টব্য ঃ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা (প্রবন্দ), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), দ্বাদশ ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ৪৬-৪৭।

১১. দ্রষ্টব্য ঃ দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১৫৪।

১২. দ্রষ্টব্য ঃ কেদারনাথ মজুমদার (সম্পা.), '**সৌরভ**' পত্রিকা, ময়মনসিংহ, ১৩৩৪ বাংলা, কার্তিক, পৃষ্ঠা - ৫৬।

১৩. দ্রষ্টব্য ঃ দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৮৩।

১৪. দ্রষ্টব্য ঃ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৪৭।

১৫. দ্রষ্টব্য ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, মফঃস্বল সংখ্যা, ১৮ই বৈশাখ, বাংলা ১৩৩৬ সাল, পৃষ্ঠা - ৯।

১৬. দ্রষ্টব্য ঃ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৪৭।

১৭. দ্রষ্টব্য ঃ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৪৭।

১৮. দ্রষ্টব্য ঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম খণ্ড), সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩২২।

১৯. দ্রষ্টব্য ঃ সুধীররঞ্জন দাস, বাংলার লোকধর্ম (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা - ২০২।

২০. দ্রষ্টব্য ঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয়ার্ধ), ফার্মা কে.

এল. এম (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৫৮।

২১. দ্রষ্টব্য ঃ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবদেবী (প্রবন্ধ), পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি (পত্রিকা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা - ৯৬৭।

২২. দ্রষ্টব্য ঃ বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫০, পৃষ্ঠা - ৬৮২-৬৮৩।

২৩. দ্রষ্টব্য ঃ বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৬৮২-৬৮৩।

২৪. দ্রষ্টব্য ঃ দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, অকাদেমি অব ফকলোর, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৪৮৫ - ৪৮৬।

২৫. দ্রষ্টব্য ঃ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ১৬৬।

২৬. দ্রষ্টব্য ঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা - ২৩৯-২৪০।

২৭. দ্রষ্টব্য ঃ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৩৮।

২৮. দ্রষ্টব্য ঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ৪৫।

২৯. দ্রষ্টব্য ঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭।

৩০. দ্রষ্টব্য ঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭।

৩১. দ্রষ্টব্য ঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭৭।

৩২. দ্রষ্টব্য ঃ ফটিকচাঁদ ঘোষ, '**কড়চা, পূর্ব মেদিনীপুর**', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ক ৪।

৩৩. দ্রষ্টব্য ঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, গীতিকা ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩ পৃষ্ঠা - ৪১।

৩৪. দ্রষ্টব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশণী, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১১২-১২৩।

পঞ্চম অধ্যায়

ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্য : পরিচয় উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা

ক. ষোড়শ শতকের কবি ও কাব্য ঃ

১. ব্রজবুলি গীতা — রায় রামানন্দ

২. কৃষ্ণলীলা — রায় রামানন্দ

৩. গঙ্গামঙ্গল — জগন্নাথ দাস

৪. ভজনতত্ত্ব — অনন্ত দাস

খ. সপ্তদশ শতকের কবি ও কাব্য ঃ

৫. দ্বারিকা পালা — ধনঞ্জয় ভঞ্জ

৬. মনসামঙ্গল — দ্বারিকা দাস

গ. অষ্টাদশ শতকের কবি ও কাব্য ঃ

৭. কবি কর্ণের পালা — কবি কর্ণ

৮. জয়ানন্দ পালা — দ্বিজ রঘুনাথ

৯. ভুবনমঙ্গল — রঘুনাথ দাস

১০. প্রকাশ চৈতন্যরত্ন — সনাতন

১১. বসন্তরাস — পিণ্ডিক শ্রীচন্দন

১২. পঞ্চামৃতসিন্ধু — দিব্যসিংহদেব

ঘ. ঊনবিংশ শতকের কবি ও কাব্য ঃ

১৩. একাদশী মাহাত্ম্য — কবিচন্দ্র জগন্নাথ

১৪. নারদগীতা — জগন্নাথ মহামিশ্র

১৫. রামায়ণ শক্তিশেল — দ্বিজ রামজীবন

পঞ্চম অধ্যায়

ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্য : পরিচয় উদ্ধার ও তার পর্যালোচনা

ওড়িশা পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি অন্যতম রাজ্য। বর্তমান ভৌগোলিক মানচিত্রকে লক্ষ্য করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ওড়িশার ভৌগোলিক সীমাকে একই ভেবে নেওয়া সমীচীন হবে না। ওড়িশার শুধু ভৌগোলিক রূপ নয় তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসটিও অকল্পনীয়। খ্রিস্টিয় প্রথম শতক থেকে শুরু করে এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, সাধারণভাবে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শতকে কলিঙ্গে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় সেই বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন মহাপরাক্রমশালী খারবেল। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক অবধি গুপ্ত রাজবংশের অধিনে ছিল কলিঙ্গ প্রদেশ।

> *"আনুমানিক ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ভৌমকর বংশের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সেই সময় এই ভূ-খণ্ডের নাম ছিল তোসলা বা তোসলি। আদি ও মধ্য যুগে এই তোসলা ভূখণ্ডের বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর থেকে ওড়িশার গঞ্জাম অঞ্চল পর্যন্ত।"*[১]

'ওড়িশার জাজপুরের মধ্যবর্তী বৈতরণী নদী থেকে মেদিনীপুরের কাঁসাই নদী পর্যন্ত এককালে ওড়িশা রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল।'[২] ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেব সিংহাসনে আরোহন করার পর, ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিঙ্গ নগর থেকে কটকে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই নৃপতি শ্রীক্ষেত্র পুরীতে জগন্নাথ ও লক্ষ্মীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গরাজবংশের চতুর্থ নরপতি ভানুদেবের মৃত্যু হয় ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর রাজা হন কপিলেন্দ্রদেব। ১৪৩৬ খ্রীস্টাব্দে কপিলেন্দ্রদেব ওড়িশার সিংহাসনে বসার সময় বঙ্গদেশ তখন মুসলমান শাসনের অধীনে। ওড়িশার এই রাজত্বকালকে সূর্যবংশের রাজত্বকাল বলা হয়। কপিলেন্দ্রদেবের রাজ্যটির অপর সীমায় চলছিল বাহ্মনি আর বিজয়নগরের শাসন। কপিলেন্দ্র পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করে কিছু কিছু অংশ অধিকার করে আপন রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। এই রাজার মৃত্যু হয় ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। কপিলেন্দ্রদেবের আঠারোজন পুত্র ছিলেন।

"তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুরুষোত্তমদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহন করেন আর বাকি সতেরোজন ভাই রাজ্যেরই সতেরোটি ভাগের অধিপতি হন। এগুলি পরবর্তীকালে ওড়িশার স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দ হরিচন্দন ওড়িশার সিংহাসনে বসলেও তাঁকে অন্তর্বিপ্লবে বলি হতে হয় আর ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার উত্তরাঞ্চল মুসলমানের দখলে চলে যায়। তখন যে সব হিন্দু রাজারা মুসলমান শাসকের প্রতিনিধি হয়ে রয়ে গেলেন তাঁদের বলা হোত 'মনসবদার' আর অন্যেরা ছিলেন 'জমিদার'। ইতিমধ্যে কিন্তু এই রাজ্যগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মারাঠা শাসনের সময় ওড়িশা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, 'মোগলবন্দী' আর 'গড়জাত'। এই 'গড়জাত' বা ছোট রাজ্যগুলির অস্তিত্ব ইংরেজ শাসনকাল পর্যন্ত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ১৮০৩ সালে সতেরোটি আর ১৮০৫ সালে বাকি সাতটি রাজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে ১লা জানুয়ারী ওড়িশার ২৪টি ছোট ছোট রাজ্য বৃহত্তর ওড়িশা রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।"[৩]

ওড়িশার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করার কারণ এই যে, গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে ওড়িশা ভূখণ্ডে ওড়িয়া কবিদের দ্বারা বাংলা কাব্যচর্চার ইতিবৃত্ত। ওড়িশার ইতিহাসের এই ধারা বিবরণে লক্ষ্য করা যায় যে, এর উত্থান-পতনের সঙ্গে প্রতিবেশী বঙ্গদেশের ইতিহাসও জড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক নয়, সমন্বয়ধর্মী এক সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বটে। দুটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যচেতনা কত নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছিল তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় উৎকলবাসী কবিদের বাংলা সাহিত্য রচনার মধ্যে।

ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিষয় করে যে সব বাঙালি চর্চা, গবেষণা ও আলোচনা করেছেন তাঁদের নাম ও কীর্তি এক্ষেত্রে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর '**ওড়িয়া সাহিত্য**' নামক গ্রন্থে বাঙালির দ্বারা ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃতির গবেষণার একটি তালিকা বিবরণী উল্লেখ করেন। সেই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওড়িশার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে গেছেন। মনোমোহন চক্রবর্তী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে

আলোচনা ও গবেষণা করে **'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল'** এর মুখপত্রে প্রকাশ করেছেন, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **'আধুনিক ভারতকোষ'** বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করে ওড়িয়া সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পরিচয় প্রদান করে গেছেন। অধ্যাপক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ওড়িশার বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মধ্যযুগে ওড়িয়া লিপিতে বাংলা কাব্যচর্চার যে অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে তা প্রথমে জনসমক্ষে আনেন ভুবনেশ্বর রিজিওনাল কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। অধ্যাপক পাণ্ডা রিজিওনাল কলেজের অধ্যাপকরূপে কর্মরত থাকাকালীন ওড়িশার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে প্রাপ্ত তালপাতার পুথি ও অন্যান্য প্রাচীন পুথি-পত্রের সন্ধান করে অজ্ঞাত ও প্রায় অবলুপ্ত ওড়িয়া লিপিতে রচিত ওড়িশার কবিকুলের সৃষ্ট মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নমুনা আহরণ ও উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। বেশ কয়েকটি পুথি তিনি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।

বিশ শতকের সাত ও আটের দশকে অধ্যাপক পাণ্ডা এইরূপ বাংলা লিপিতে ওড়িয়া সাহিত্য নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে গেছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ভুবনেশ্বরে অবস্থিত **'ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা'** বা '**Orissa State Musium**'। এই প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত আছে ওড়িয়া কবিদের দ্বারা ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যের প্রায় একশ সাতাশ খানির মতো পুথি। এই সকল পুথির রচনাকাল মধ্যযুগ। বিশেষ করে ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে, ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় ওড়িয়া কবিদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যচর্চার যে বৃহৎ নিদর্শন পেলেন তার কিছুটা অংশ অর্থাৎ দশটির মতো পুথি তিনি তাঁর জীবৎকালে সম্পাদনা ও প্রকাশ করে যেতে পেরেছেন। গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত পুথিগুলি সম্পর্কে আলোচনা থাকবে। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় যে সকল পুথি অধ্যাপক পাণ্ডার সম্পাদনার বাইরে বা আলোচনার বাইরে ছিল তার কয়েকটি পুথি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার পুথি সংগৃহীত এবং যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে। পুথিগুলির ভাষা, লিপি ও উপাদানগত বৈচিত্র্য আছে। এই সংগ্রহে বেশ কয়েকটি পুথি গবেষকের হাতে নিয়ে দেখবার সুযোগ হয়েছে বেশ কয়েকবার। এগুলির লিপিরূপ ওড়িয়া। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের গবেষকবৃন্দ এগুলির সন্ধান পাননি বা পেলেও ওড়িয়া লিপির অনভিজ্ঞতার কারণে এই সকল পুথিগুলি সম্পর্কে উৎসাহবোধ করেন নি। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালার কর্তৃপক্ষ

গবেষককে পুথিশালায় কাজ করতে বেশ কয়েকবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি পুথির পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়েছে। ওড়িশা প্রান্তবঙ্গের মানুষ হওয়ার কারণে ওড়িয়া লিপির পাঠ-অভিজ্ঞতা গবেষকের আছে এবং সেই সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে এই পুথিগুলির পাঠ ও পর্যালোচনা এই গবেষণা পত্রে উপস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে।

মধ্যযুগের ওড়িয়াভাষী মানুষগণ যে বাঙালি কবিদের কাব্যরস পানে উৎসাহী ছিলেন তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ওড়িশায় সংরক্ষিত পুথিগুলির মধ্যে প্রায় দু'শ খানি পুথি হলো কৃত্তিবাস ওঝাকৃত রামায়ণ, কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃতের আংশিক এবং সম্পূর্ণ অনুলিপি ও লিপ্যন্তর। সুতরাং এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মধ্যযুগে ওড়িশায় বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি উৎকলবাসীর এক স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও অনুরাগ ছিল। বাধা ছিল একমাত্র লিপিগত। পারস্পরিক সাহচর্য ও কথ্যভাষা রূপে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সেকালে এই ভাষাভিত্তিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে কলিঙ্গবাসী বঙ্গভারতীর সাহিত্য উদ্যানে প্রবেশ করে কাব্যমধু পানে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বা ওড়িয়া সাহিত্যের প্রচার মাধ্যম ছিল গান। এই রামায়ণ কথা বা মহাভারতের সরল পয়ার, ত্রিপদীর মধুর মূর্ছনার কারণে শুধুমাত্র বাঙালি নয়, প্রতিবেশী ওড়িয়াগণও তা স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই স্মৃতিকে সম্বল করে ওড়িয়া লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস করেছেন হয়তো। আমাদের ধারণা বঙ্গ সীমান্তবর্তী ওড়িশায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতে এইরূপ লিপ্যন্তর হয় এবং পরবর্তীকালে বিস্তৃত ওড়িশায় সেগুলির অনুলিপি হতে শুরু করে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস নামাঙ্কিত রামায়ণ ও মহাভারতের পুথিগুলি এইরূপে ওড়িশার ভূখণ্ডে লালিত হয় এবং কালক্রমে ভুবনেশ্বরে স্থিত '**ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা**'য় সংরক্ষিত হয়।

গবেষণাপত্রে এই সকল রামায়ণ, মহাভারতের পুথিগুলির পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। গবেষণাপত্রে আলোচিত হবে শুধুমাত্র ওড়িয়া কবিকুলের ওড়িয়া লিপিতে মৌলিক বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রসঙ্গটি।

'**রাজ্য প্রদর্শশালা**'য় সংরক্ষিত বাংলা ভাষায় রচিত চারশ' পুথি থেকে একশ' সাতাশখানি পুথিকে উৎকলীয় কবিদের রচিত মৌলিক বাংলা কাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন আমাদের পূর্ববর্তী গবেষক অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। সুতরাং সেই একশ' সাতাশখানি কাব্যের রচয়িতাদের জীবৎকালকে

ধরে বলা যায় ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই তিনশ' বছর ওড়িয়া কবিদের বাংলা কাব্যচর্চার সময় পরিধি বিস্তৃত ছিল। এই সকল কবিদের মধ্যে অধিকাংশ কবিদের পরিচয় ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত। আশ্চর্যের বিষয় এই সকল কবি ওড়িয়া সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি যে বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছিলেন তার কোন উল্লেখ ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে নেই।

সুতরাং উৎকলে বাংলা সাহিত্যের চর্চা ছিল দ্বিধাবিভক্ত। বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিকে ওড়িয়ায় লিপ্যন্তরিত করিয়ে দ্বিভাষিক লিপিকরগণ সাক্ষর ওড়িশাবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করলেন — এটি ছিল প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা হলো বাংলা ভাষায় মৌলিক কাব্য সৃষ্টি করা। এই স্রষ্টারা ছিলেন বিশেষ প্রতিভা সম্পন্ন। এঁদের বাংলা ভাষাশিক্ষা ছিল স্বোপার্জিত, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিয়ে নয়। তাই এদের বাংলা বলতে, বুঝতে আর পড়তে কোন অসুবিধা না থাকলেও লিখতে পারতেন না। অন্য ভাষার লিপি কৌশল আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে অন্তত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন। এঁরা সে সুযোগ পাননি বা গ্রহণ করেন নি। তাই তাঁরা ওড়িয়া লিপিতে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করে গেছেন। এগুলি সবই ধরা আছে অজস্র তালপাতার পুথিতে।

এই সকল সাহিত্য রচনার সময়কাল ও কবিদের জীবৎকাল ধরে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা কবিদের কাব্যচর্চার সময়সীমাকে নিম্নোক্ত ভাবে কয়েকটি কাল পর্যায়ে বিভাজন করেছেন।[৪] ষোড়শ শতকে কাব্য রচনা করেছেন **রায় রামানন্দ, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস** প্রমুখ; সপ্তদশ শতকে **দ্বারিকা দাস, ধনঞ্জয় ভঞ্জ, শীতলা চরণ, দ্বিজ লোকনাথ, পুরুষোত্তম দাস, যদুনন্দন দাস, মধু দাস, কবি প্রসাদ** প্রমুখ; অষ্টাদশ শতকে **কবি কর্ণ, দ্বিজ রঘুরাম, রঘুনাথ দাস, সনাতন, পিণ্ডিক শ্রীচন্দন, কানাই খুঁটিয়া, দিব্যসিংহ দেব, নারায়ণ দাস** প্রমুখ কবি ব্যক্তিত্ব এবং ঊনবিংশ শতকের অন্যতম কবি **কবিচন্দ্র জগন্নাথ, জগন্নাথ মহামিশ্র, দ্বিজ রামজীবন, দ্বিজ গৌরচরণ, গৌরচন্দ্র, নটবর দাস, নারায়ণ মর্দরাজ এবং অন্যান্য কবিগণ** একই পদ্ধতিতে ওড়িয়া লিপিতে বাংলা ভাষায় মৌলিক কাব্য রচনা করে গেছেন। রচনাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ নয় তাই এই তালিকাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এইরূপ ভাবা যায় যে, যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থিতিই (১৫১০ - ১৫৩৩) বাংলা ভাষার প্রতি ওড়িশার বিদ্যোৎসাহী মানুষদের এক প্রকার শ্রদ্ধা মিশ্রিত অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল। মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ধর্মকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষাকেও উৎকলবাসী সেদিন ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ধর্মক্ষেত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকিরণ কেন্দ্র। হাজার হাজার যে সব তীর্থযাত্রী এইসব তীর্থক্ষেত্রগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন, তাঁরা হলেন প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সংস্কৃতির দূত। অজস্র ধর্মক্ষেত্র আর লক্ষ লক্ষ তীর্থপ্রিয় ভারতবাসী যে কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে তুলেছেন একটি অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতি, এই মহৎ সত্যটিকে আজ আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই।

ইংরেজ শাসনের কৃপায় যে নতুন শিক্ষার প্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবাহিত হয়েছিল তার সুফল যেমনি আহরণ করেছি, কিন্তু কুফলও আমরা আত্মসাৎ করেছি। যে স্বাদেশিকতা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, তারই সংকীর্ণ রূপ অচিরেই দেখা গেল ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ চেতনায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐ ভাষার ভিত্তিতেই প্রদেশগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রক্রিয়ার সমাপ্তি আজও ঘটেনি, কবে ঘটবে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। উনিশ শতকের শেষাশেষি ওড়িশায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাটি স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে ওড়িশার কবিরা বাংলায় যেসব কাব্য-কবিতা সৃষ্টি করে গেছেন সারস্বত বাঙালি সমাজের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা থাকলেও ব্যক্তিগত ভাবে তা গবেষকের সামর্থ্য বা সাধ্যের বাইরে। কারণ মধ্যযুগের ওড়িয়া লিপির দুর্বোধ্যতা ভেদ করে সেই সকল সাহিত্যবস্তুকে জনসমক্ষে তুলে আনা শক্তিশালী গবেষকের কাজ। এই সকল পুথির পাঠোদ্ধার করতে গেলে প্রযুক্তি নির্ভর হতে হবে। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালার পুথিশালায় সেই ব্যবস্থা নেই। বৃহৎ পুথির সম্ভার থেকে যতটুকু অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা উদ্ধার করতে পেরেছেন এবং বর্তমান গবেষকের দ্বারা যতটুকু পুথি পাঠ ও পর্যালোচনা সম্ভবপর হয়েছে তার একটি কালানুক্রমিক ইতিবৃত্ত এই গবেষণা পত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্য চর্চার যে ধারা ওড়িশায় বহমান ছিল তা একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে দাঁড়াবে এই যে, ষোড়শ শতকে সংখ্যায় যতজন কবি তা সপ্তদশ শতকে বেড়েছে আর সেই সংখ্যা সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অষ্টাদশ শতকে। রেখাচিত্রটি উনিশ শতকে অধোমুখী ও সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে। গবেষণাপত্রে ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের

মধ্যে কয়েকজন কবির রচনা থেকে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করে সেই সকল সৃষ্টিকর্মের নান্দনিক মূল্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. ষোড়শ শতকের কবি ও কাব্য

ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠিত কবি রায় রামানন্দ। বাংলা সাহিত্যের ধারায় রায় রামানন্দকে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের মাধ্যমে। এছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ **'পহিলহি রাগ নয়ন-রঙ্গ ভেল'** পদের রচয়িতা রূপে এই কবি ব্যক্তিত্বকে জানেন।

ওড়িশা রাজ্যের জাজপুরের নিকট **'রামাই আনন্দকোল'** নামক একটি গ্রামে রায় রামানন্দের নিবাস ছিল। করণ কুলে কবির জন্ম। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান অনুযায়ী রায় রামানন্দ ১৩শ শকাব্দেরর শেষে জন্মগ্রহণ করেন আর তিনি দেহত্যাগ করেন মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ১৪৫৫ অথবা ১৪৫৬ শকাব্দে। ইনি শ্রীচৈতন্য শাখান্তর্গত বৈষ্ণব ও ব্রজলীলার **'বিশাখা'** রূপে চিহ্নিত।

রায় রামানন্দ নামাঙ্কিত বা ভণিতাযুক্ত দুটি ওড়িয়া লিপিতে বাংলা পুথি **'ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা'**য় সংরক্ষিত আছে। বি. ১১৮ ক্রম সংখ্যা বিশিষ্ট পুথিটির নাম **'ব্রজবুলি গীতা'** ও বি. ১৪১ ক্রম সংখ্যা বিশিষ্ট পুথির নাম **'কৃষ্ণলীলা'**। **'কৃষ্ণলীলা'** পুথিখানিতে **'রাধা জন্ম'** ও **'গৌর জন্ম'** শীর্ষক দুটি অংশ আছে যা **'ব্রজবুলি'** গীতায় অনুপস্থিত। আবার **'দণ্ডবেলা'** আর **'ললিতা কুঞ্জে মিলন'** অংশ দুটি উভয় পুথিতে পাওয়া যায়। কাব্য দুটির ভণিতা অংশগুলিতে রায়, দাস পদবীগুলি উল্লিখিত আছে। পদবী ছাড়া শুধু রামানন্দ নামটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। A history of Bengali Literature গ্রন্থে সুকুমার সেন বলেছেন যে, রায় রামানন্দ আর রামানন্দ একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তাঁর মতে—

> *"সাধারণভাবে মনে হয় 'রাধাজন্ম' আর 'গৌরজন্ম' অংশ দুটির অন্তর্গত পদগুলি বেশ দুর্বল।'গৌরজন্ম' অংশে কিছু তথ্যগত ত্রুটীও চোখে পড়ে। রায় রামানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করে যাবেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পাণ্ডুলিপিতে*

যেভাবে তথ্যগুলি এসেছে তাকে লিপিকর-প্রমাদ বলে গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া 'শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটক'-এর রচয়িতা রায় রামানন্দের নামাঙ্কিত পদগুলিতে যে দীপ্তি আর ভাবগভীরতা আকাঙ্খিত ছিল, পদগুলি তাও পূর্ণ করতে পারেনি।"[৫]

'**দণ্ডবেলা**' শীর্ষক কাব্যাংশটি ৩২টি পদের সমষ্টি। এটি একটি কাহিনীকাব্য। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাই এর উদ্দেশ্য। যশোদা, জটীলা, বিশাখা, রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ, সুবল ইত্যাদি চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও মুখ্য চরিত্র শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ।

কৃষ্ণলীলা (বি.১৪১) কাব্যের '**দণ্ডবেলা**' অংশের একটি শিল্প সুষমামণ্ডিত অংশ এইরূপ—

"হের হের ওরে ভাই গোধনের পল্লী।
বেলা অবসান হৈল নিজ গৃহে চলি।।
তবে সর্ব সখাগণ পুষ্পডাল ভাঙ্গে।
মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করয়ে ত্রিভঙ্গে।।
তু তু শৃঙ্গা ধ্বনি লু লু বংশীর শবদে।
গাভী হাম্বা রবে কৃষ্ণ চলয়ে কদম্বে।।
চরণে চরণ দিয়া বংশী করে ধরি।
বিরহ মুরলী স্বনে ডাকে রাধা করি।।
সে ধুনি শুনিয়া বৃষভানুর নন্দিনী।
ললিতার ভুজ ধরি চলিলা আপনি।।
আর সখী ধূপ দীপ করেন চামর।
লয়্যা চলে বিনোদিনী অট্টালিকা পর।।"

কবি জগন্নাথ দাসের রচিত আদি, মধ্য ও অন্ত সমন্বিত '**গঙ্গামঙ্গল**' নামে অক্ষত একখানি পুথি ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত আছে। পুথিখানির সংখ্যাক্রম বি. ২০৭। পুথিখানির লিপিরূপ প্রাচীন নয় এবং এটি সযত্নে রক্ষিত আছে বলে বিষ্ণুপদ পাণ্ডার পক্ষে এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। তালপাতার এই পুথিখানির পাতাগুলির আয়তন ৩১.১ X ৩.৪ সেন্টিমিটার।

প্রতিটি পৃষ্ঠায় চার অথবা পাঁচ ছত্র লেখা হয়েছে।

পুথিখানির ভণিতাংশে সর্বত্রই প্রায় **'বিপ্র জগন্নাথ'** উল্লিখিত হয়েছে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে **'জগন্নাথ দাস'** ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

১) বিপ্র জগন্নাথ বলে সারদার পায়।
শুন রাজা পরীক্ষিত বলিয়ে তুমায়।। (পৃঃ ১৩)

২) বিপ্র জগন্নাথ ভাবে শুনব রাজা কহি অবে
শুনিয়া সংসারে যাবে তরি। (পৃঃ ১৭)

৩) জগন্নাথ দাসে কয় দেখ যা বিষয় হয়
কহে রাজা ক্রোধভর হইয়া। (পৃঃ ২৯)

৪) সে কথা করিয়া মনে ভাবিল অন্তরে।
বিপ্র জগন্নাথ বলে ডাকিয়া সভারে।। (পৃঃ ৬০)

'গঙ্গামঙ্গল' এর পুথিটিতে সুদীর্ঘ পুষ্পিকা পাওয়া গেছে। পুষ্পিকাটির শেষে লিপিকরদের বহুল ব্যবহৃত একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

"পুস্তকং কঠিনী বামা চন্দনং বাহনং ধনম্।
পরহস্তে ন দাত্তব্য দৃষ্টিমাত্রে সুরক্ষিতা।
পুস্তকং হরতে যন্তু কালোদৃষ্টি ভবেৎ নর।
জন্মে জন্মে দরিদ্র স পিতৃনাং নরকং ব্রজেৎ।।
ভগ্ন পৃষ্ঠ কটি গ্রীব তুল্য দৃষ্টিরধোমুখং।
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থ পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।।"

পুথির লিপিকর কালীপ্রসাদ বালেশ্বর জেলার অধীন ভোগরাই পরগণার অন্তর্গত মল্লারবেড়্যা গ্রামের একটি **'বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ'** বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। **'গঙ্গামঙ্গল'** এর পুথির

অবস্থা দেখে স্বাভাবিকভাবে এটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে লিখিত হয়েছে– এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'গঙ্গামঙ্গল'-এ মূলত কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত সগরতনয়দের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। জগন্নাথ দাস কাহিনী উপস্থাপন করেছেন এইরূপ–

সূর্যবংশের রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হয়ে পড়েন। ইন্দ্র তখন সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে দেবর্ষি নারদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নারদ ইন্দ্রের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে স্বয়ং যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন এবং পাতালে তপস্যারত কপিলমুনির অজ্ঞাতসারে তাঁরই পেছনে অশ্বটিকে রেখে আসেন। পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সগর সন্তানেরা অশ্বের সন্ধানে এলে নারদ তাদের অশ্বের সন্ধান জানিয়ে দেন। তারা কপিলের কাছে যজ্ঞাশ্ব দেখেই তাঁকেই অশ্ব অপহরণকারী ভেবে নিয়েই তাঁর ওপর দৈহিক নির্যাতন করেন। ফলস্বরূপ মুনি তাদের শাপ দিয়ে ভস্ম করেন। কুল-পুরোহিত বশিষ্টের উপদেশক্রমে রাজা সগর কপিলমুনিকে তপস্যায় তুষ্ট করে শুনলেন যে তাঁরই ভবিষ্যৎ বংশধর ভগীরথ গঙ্গা এনে বংশের উদ্ধার করবেন।

কালক্রমে সগর, তাঁর পুত্র এবং প্রপৌত্র গত হলেন। তাঁর প্রপৌত্রের এক পুত্র ছিল। তাঁর নাম দিলীপ। দিলীপ অন্তর্হিত হবার পর তাঁর দুই রাণীর একজনের গর্ভে ভগীরথ নামে এক বিকলাঙ্গ অস্থিহীন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই এই বিকলাঙ্গ শিশু অষ্টাবক্রমুনির আশিসে সুস্থ ও সুন্দর দেহের অধিকারী হন। ভগীরথ আপন বংশের দুর্ভাগ্যের কথা জেনে বংশ উদ্ধারে ব্রতী হবার পূর্বেই বিবাহ করেন এবং একটি সন্তানের জনক হন। এরপর সকলের অনুমতি নিয়ে পুত্র রঘুনাথের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য যাত্রা করেন।

ভগীরথ প্রথমে নির্ঘাত নামক এক ঋষির করুণা লাভ করেন এবং মূলত তাঁরই উপদেশে গঙ্গার সন্ধানে মহাদেবের কাছে যান। তিনি ভগীরথকে পাঠান ব্রহ্মার কাছে এবং ব্রহ্মা পাঠিয়ে দেন নারায়ণের কাছে। নারায়ণের কাছেই ভগীরথ গঙ্গার সন্ধান পান। এরপর ভগীরথ তপস্যায় গঙ্গাকে প্রীত করে মর্তে আসতে তাকে রাজী করিয়েছেন।

দেবী গঙ্গা মর্তে যাত্রা করার পূর্বেই ভগীরথকে দিয়ে সত্য করিয়ে নিলেন যে তাঁর পথ প্রদর্শক হবেন ভগীরথ। ভগীরথ যে পথে অগ্রসর হবেন গঙ্গা সেই পথে এগিয়ে চলবেন। যাত্রা

শুরু হলে কিছুদূর যাওয়ার পর গঙ্গার স্রোতধারা সুমেরু পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হল। কীভাবে সেখান থেকে গঙ্গার মুক্তিলাভ সম্ভব তার সন্ধান দিলেন সুমেরু স্বয়ং। তিনি বললেন—

"আমার হৃদয় দিয়া যাউ গঙ্গা বিদরিয়া
আন গিয়া ইন্দ্র পাটহস্তী।" (পৃঃ ১১)

ভগীরথ গেলেন পাটহস্তীর কাছে। তিনি বললেন—

"ইন্দ্র আজ্ঞাধারী আমি কি আর করিব।
সেই আজ্ঞা দিলে তবে নিশ্চয়েতে যাব।।" (পৃঃ ১৩)

ইন্দ্রের তপস্যায় বসলেন ভগীরথ। দীর্ঘ তপস্যায় ইন্দ্র প্রীত হয়ে সম্মতি দিলেন এবং তাঁর সম্মতিসূচক পারিজাত মালা প্রেরণ করলেন ঐরাবতের উদ্দেশ্যে। এবার ঐরাবত এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসলেন, বললেন—

"হস্তি বলে শুন তুমি অযোধ্যার রাজা।
তোর গঙ্গা এইবার হবেকি ভারিজা।।" (পৃঃ ১৭)

ভগীরথ অত্যন্ত বিপন্নবোধ করলেন। কীভাবে এই কথা তিনি গঙ্গাকে জানাবেন, সেইটি হয়ে উঠল সমস্যা। তাঁকে একা ফিরে আসতে দেখে গঙ্গা কিন্তু একটা অমঙ্গল আশা করলেন। অনেক পীড়াপীড়িতে ভগীরথ ঐরাবতের প্রস্তাব নিবেদন করলেন। গঙ্গা সব শুনে বললেন—

"হব পাছে ভারিজা সুরতি দিব তারে।
মোর তিনি ঢেউ যদি সহিতে সে পারে।।" (পৃঃ ১০০)

শেষ পর্যন্ত সুমেরু পর্বত থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করার পর তাঁর প্রবল ঢেউতে ঐরাবত ভেসে চললেন। গঙ্গার স্তব করে সে যাত্রায় সে রক্ষা পেলেন। গঙ্গার নতুন নাম হোল '**সুরধুনী**'। আবার এগিয়ে চললেন ভগীরথের পেছনে।

গঙ্গা এবার পৌঁছলেন রাজঘাটে। মহাযোগী মহেশ্বরের কাছে। মহেশ্বর গঙ্গাকে আপন

জটার মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। শিবের তপস্যায় বসলেন ভগীরথ। দীর্ঘ তপস্যায় প্রীত হয়ে শিব আপন জটাকে ত্রিধা বিভক্ত করে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। গঙ্গার নতুন নামকরণ হল 'ত্রিবেণী'। গঙ্গা উন্মত্ত প্রবাহে ভগীরথের পেছনে পেছনে চলেছেন, এমন সময়–

"জহ্নু নামে ছিল মুনি দেখিয়া সে গঙ্গাপানি
ততক্ষণে হস্ত ফিরাইল।।
চৌরাশি যোজন ছিল মুনি তারে লুকাইল
শুন কহি তুমার সাক্ষাতে।
উর্ধেতে করিয়া মুণ্ড বস্তার করিল তুণ্ড
ফেলিয়া সে দিলেক গর্ভেতে।।" (পৃঃ ১০৩)

তপস্যায় বসলেন রাজা ভগীরথ এবং সন্তুষ্ট হয়ে–

"তারে মুনি কৃপা কৈল আজানু চিরিয়া দিল
'জাহ্নবী' বলিয়া দিল নাম।।" (পৃঃ ১১০)

এর পরেও অজস্র বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে ভগীরথকে ।আলিশা, গোয়ালিনী ও হনুমান এরা একে একে পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যেককে তপস্যায় প্রীত করে গঙ্গার মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আলিশা ও গোয়ালিনীর কাছ থেকে মুক্তির পর গঙ্গার নতুন নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে **'মাহেন্দ্রী'** এবং **'সুরভী'**। মুক্তি পেয়ে গঙ্গা এরপর পথে পেয়েছেন স্বয়ং কপিল মুনিকে। তিনি তখনও সগর তনয়দের অত্যাচার ও দৈহিক নির্যাতনের কথা ভুলতে পারেননি। তিনি গঙ্গার যাত্রাপথে বাধা দিলেন কিন্তু তাঁকেও শেষপর্যন্ত ভগীরথের সাধনায় সতুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে মুক্তি দিতে হোল। এরপর ভগীরথ যমুনা ও সরস্বতীকে এনে গঙ্গার ধারার সঙ্গে যুক্ত করে যজ্ঞকুণ্ডের নিকটবর্তী হয়েছেন।

ভগীরথ এবার গঙ্গার কাছে প্রার্থনা জানালেন। যজ্ঞকুণ্ড প্লাবিত করে সগরবংশ উদ্ধার করবার জন্যে কিন্তু গঙ্গা ভগীরথকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রতিশ্রুতি ছিল, গঙ্গার পথপ্রদর্শক হিসাবে সবসময় সামনে থাকবেন ভগীরথ। এখন যদি তিনি যজ্ঞকুণ্ডের গগনস্পর্শী অগ্নিশিখায় আত্মাহুতি দেন তবেই তাঁকে অনুসরণ করে গঙ্গা যজ্ঞকুণ্ডে প্রবেশ করতে পারেন।

প্রথমে ভগীরথ বহু অনুনয় বিনয় করে গঙ্গাকে রাজি করাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু গঙ্গার বক্তব্য সেই এক–

"শুন বাছা ভগীরথ আমার বচন।
রাধা সঙ্গে সত্য কৈল কমললোচন।।
সেই রাধা সেই কৃষ্ণ সরস্বতী আর।
দশকালে দশরূপ দশ অবতার।।
পূর্বের সত্যতে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গতি।
কালে কালে রাধিকার কৃষ্ণ হবে পতি।।
সত্যের লাগিয়া কত বধিল অসুর
সত্য লাগি বোলাইল জগৎ ঠাকুর।।
অবে যদি সত্য ভঙ্গ করিবেক তুমি।
কেমনেতে ব্রহ্ম অগ্নি নিবাইব আমি।।
তুমা প্রতি কহি আমি শুন বারে বার।
সত্যভঙ্গ কর তুমি কি দোষ আমার।।
তুমি আগে আমি পিছে বলিলে আপনি।
রাজা হয়্যা সত্য ভঙ্গ কেন কর তুমি।।" (পৃঃ ১৩৬)

এমতাবস্থায় রাজা ভগীরথ চললেন অযোধ্যায়। সেখানে গিয়ে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত দুই মাতা, পত্নী, পুত্র এবং পাত্র-মিত্রদের জানিয়ে সবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন। এরপর–

"গঙ্গানারায়ণ রাজা উচ্চারিল তুণ্ডে।
হা কৃষ্ণ বলিয়া সেই পড়িল অগ্নিকুণ্ডে।।
অগ্নির নিকটে তবে গঙ্গা দেবী ছিল।
ভগীরথ রাজা বলি কুণ্ডে ঝাঁপ দিল।।
রাজার মরণ যবে শ্রীকৃষ্ণ জানিল।
পুষ্পরথে করি তারে বৈকুণ্ঠেতে নিল।।" (পৃঃ ১৪৬)

এরপর সগর বংশের '**যত ছিল অগ্নিত্রাসে গেল তারা স্বর্গবাসে**' এবং মূল কাহিনীর পরিসমাপ্তি

ঘটল। প্রসঙ্গক্রমে কবি বহুবার গঙ্গার কাহিনী শ্রবণের পুণ্যফলের কথা বলেছেন। গঙ্গার জল স্পর্শ, গঙ্গা জলে স্নান প্রভৃতিতে যে কী পরিমাণ পুণ্য হয় বা কত পাপ থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে, কবি বহুবার সেকথা শুনিয়েছেন।

ভাষাগত দক্ষতা কাব্য-সাহিত্য রচনার প্রাথমিক শর্ত। কাব্য বা সাহিত্য রচনার বিষয়বস্তু মনের মধ্যে রূপ নেয় ভাষারই মাধ্যমে। তারপর সেটি যখন প্রকাশিত হতে চায় তখন ভাষার সাবলীলতাই তাকে স্বতঃস্ফূর্ত করে। সে সময় ভাষাগত আড়ষ্টতা কাব্য সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অতএব ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে যে সব ওড়িশাবাসী কবির রচনার পুথি ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংগৃহীত আছে তাদের অধিকাংশেরই যে বাংলা ভাষার দক্ষতা যথেষ্ট ছিল, তাতে কারোর সন্দেহ থাকার কথা নয়। অধিকাংশ কবি বলা হল এই কারণে যে, দুয়েকজনের ক্ষেত্রে সেই সাবলীলতার অভাব দেখা যাচ্ছে। এঁরা বাংলার সঙ্গে একটু বেশি পরিমাণে ওড়িয়া ভাষা মিশিয়েছেন বা বাংলায় লেখার পাশাপাশি বিশুদ্ধ ওড়িয়া ভাষায় কিছু লিখেছেন।

সনাতন বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের অন্যতম অনুবাদক হিসেবে বিশেষভাবেই পরিচিত। তিনি নিজেকে বঙ্গদেশীয় বলে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, **'কলিকাতা ঘোষাল বংশে'** তাঁর জন্ম।[৬] তিনি যে কটকে থাকতেন তার প্রমাণও তাঁর রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যেও একটি **'ভাষাবন্ধ ভাগবত'** আছে।[৭] এই পুথির দশম স্কন্দের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে–

"শুন শুন শ্রোতাগণ করি নিবেদন।
প্রথম হইতে গ্রন্থ লেখিল আপন।।
দশমের শেষ ষষ্ঠ অধ্যায় না পাইল।
ভানে কত পশি গ্রামে বেড়াইল।।
এ হেতু উৎকল ভাষা করিল লিখন।
জগন্নাথ দাসকৃত অপূর্ব বর্ণন।।
গ্রন্থ সমাপন হেতু উৎকণ্ঠা হইয়া।
বঙ্গজ ভাষায় উৎকল মিশাইয়া।।
দশম স্কন্দ ভাগবত সম্পূর্ণ হইতে।

সভ অধ্যায় লিখিলাম শ্রীগুরু ইচ্ছাতে।।

ইথে সাধুগণ মোর দোশ না লইবে।

ভাগবত সাধুবাক্য আনন্দে শুনিবে।।" (পৃষ্ঠা - ৭১)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি সামনে রেখে একথাই বলতে চাই যে, জগন্নাথ দাসের বাংলা ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারণা যাই হোক না কেন, বাংলা ভাষায় কবির দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। তাঁর রচনাভঙ্গির সাবলীলতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি বা কাব্যখানি আদ্যন্ত পাঠের সময় কখনো একথা মনে হয়নি যে, কবি জগন্নাথ দাসের বাংলা কোথাও কোথাও দুর্বল। তাঁর কাব্যটিতে ব্যবহৃত ওড়িয়া শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। কবি কোথাও কোথাও দুয়েকটি ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করলেও অন্যত্র সেই শব্দের সমার্থক তৎসম বাংলা শব্দও ব্যবহার করেছেন।

"দৈব <u>চড়কা</u> মাগো পড়ে যে গাছেতে।

ডাল ফল মূল মাগো যায় সে অগ্নিতে।। (পৃঃ ৮৬)

(অথবা)

<u>বজ্র</u> যে পড়িলে গাছে কিছুই নাইক বাঞ্চে

ডালপত্র সকলি সে যায়।।" (পৃঃ ১১৭)

কবির এই তৎসম শব্দ ব্যবহারের কারণ এই যে, তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মানুষ। সংস্কৃতে রচিত তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। অতএব একথা মেনে নিতে হয় যে, কবির বহুমুখী ভাষা দক্ষতা ছিল।

কবি জগন্নাথ দাস ঠিক কতখানি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার পরিচয় মাত্র কয়েকটি ছত্রে উদ্ধৃত করে দেখানো সম্ভব নয়, তবু ভাষা দক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে দু'একটি অংশের নমুনা দেওয়া হল।

রাজা ভগীরথ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর গঙ্গার তপস্যা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার পর এক সময় তিনি ভগীরথকে দর্শন দিলেন। গঙ্গার রূপ বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন–

"মাথায় সিন্দুর সাজে আর সাজে বেণী।

উপমা কি দিব তারে খঞ্জনী নয়নী।।

নাসাতে বেসর দুলে হীরা নীলা ফুল।

চন্দ্রমা জিনিয়া মুখ করে ঢলমল।।

গলে গজমতি হার বিচিত্র কাঞ্চলি।

মেঘে যেন সাজিয়াছে এ নব বিজুলি।।

ধবল বসন গায় রূপে মনোহারী।

কতশত লাগিয়াছে মুকুতার ঝারি।।" (পৃ - ৮৪)

দেবীকে দেখে ভগীরথ প্রশ্ন করলেন—

"কে তুমি তুমার নাম কহ দেখি শুনি।

কি অবা সারদা তুমি জাতি কমলিনী।।

কিবা রম্ভা কন্যা তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।

চিনিতে না পারি আমি কহ দেখি শুনি।।" (পৃ - ৮৫)

তার উত্তরে গঙ্গা ভগীরথের পরিচয় জানতে চাইলেন। আপন পরিচয় দিতে গিয়ে ভগীরথ জানালেন—

"অযোধ্যা নগরে ঘর সগর রাজন।

তাহার পুত্রের পুত্র তাহার নন্দন।।

সগরের পুত্র অংশুমান নামে তথি।

দিলীপ নামেতে অংশুমানের সন্ততি।।

দিলীপের পুত্র আমি কহি তব ধাম।

অযোধ্যা নগরে ঘর ভগীরথ নাম।।" (পৃঃ ৮৫)

এইভাবে বহু উদ্ধৃতি নিয়ে প্রমাণিত করা যায় যে, বহুক্ষেত্রেই কবির সুললিত বাচনভঙ্গি পাঠকের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

সমগ্র **'গঙ্গামঙ্গল'** কাব্যখানি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এবং পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত। গঙ্গামঙ্গলের

পয়ারগুলি সর্বক্ষেত্রেই ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার। অপর ক্ষেত্রে ত্রিপদীগুলি সবই ৮ + ৮ + ১০ মাত্রার। কবি ছন্দের ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রকার-বৈচিত্র্য আনেননি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারের শিথিলতা চোখে পড়েনা বলাই সঙ্গত। প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে যে সব অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে তার একটির প্রতি এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। সেটি হল গঙ্গাদেবীর রূপবর্ণনার অংশ। এই উদ্ধৃতাংশের তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষাংশে আছে যথাক্রমে **'নীলা ফুল'** এবং **'ঢলমল'**। পাঠক যদি **'ফুল'** এবং **'ঢলমল'** স্বরান্ত পদ রূপে উচ্চারণ করেন তাহলে কোন অসঙ্গতি কানে ধরা পড়বেনা। মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় স্বরান্ত উচ্চারণেরই প্রাধান্য ছিল। একথা ওড়িয়া লিপিতে রচিত বাংলা কাব্যগুলি পাঠ করার সময় অবশ্যই স্মরণীয়।

অলংকার প্রয়োগের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তার সংখ্যা কাব্যখানিতে যথেষ্ট পরিমাণে কম। কাব্যটিতে শব্দালংকারের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। অধিকাংশ অলংকারই অর্থালংকার শ্রেণীভূক্ত। ওড়িশার কবিকুল রচিত বাংলা কাব্যে অর্থালংকারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শব্দালংকারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির সচেতন ও সঠিক শব্দজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। যখন কবি মাতৃভাষা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ভাষায় কাব্য চর্চা করেন তখন শব্দালংকারের দিকে সুচারু মনোনিবেশ সম্ভবপর হয়না। কবি জগন্নাথ দাসের **'গঙ্গামঙ্গল'** কাব্যে উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। **'গঙ্গামঙ্গল'** কাব্যের কয়েকটি উদাহরণ জগন্নাথ দাসের অলংকার প্রয়োগের কলাকৌশল সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলবে, যেমন—

১. *"তারে দেখি দুই রানী আনন্দিত মন।*
দরিদ্র পাইল যেন অমূল্য রতন।।" (পৃঃ ৪৭)

২. *"ভালেতে চন্দন চান্দ রমনীর মন ফান্দ*
শ্রুতিমূলে সাজন কুন্ডল।
প্রভাতে যেন রবি তাহারে জিনিয়া ছবি
করিয়াছে সেই ঢলমল।।" (পৃঃ ৮২)

৩. *"সিংহ বিনা শৃগালকে কে করে উদ্ধার।*

এমনি ভরসা মাগো কর‍্যাছি তুমার।।

সিংহের প্রসাদে যদি শৃগাল যে তরে।

এই পুণ্যধর্ম মাগো রহিবে সংসারে।।" (পৃঃ ৮৬)

'গঙ্গামঙ্গল' কাব্যখানির ভাষা, বিষয়বস্তু আর রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ করে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা প্রচুর ত্রুটী-বিচ্যুতি আবিষ্কার করতে পারবো, কিন্তু সমান্তরাল ভাবে মাতৃভাষা ও দ্বিতীয় কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে আপন দক্ষতার প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির নজির শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে থাকলেও তা বিরল। এছাড়া কবি ও ভক্তপ্রবর জগন্নাথ দাসের **'গঙ্গামঙ্গল'** কাব্যখানিতে রসাবেদন কী পরিমাণে আছে সে বিচারের পূর্বে বিচার্য এই যে, তিনি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। কী পরিমাণ মানসিক ঔদার্য্য আর আত্মপ্রত্যয় থাকলে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় দক্ষতা অর্জনে প্রয়াসী হতে পারে, সে বিচার অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

চৈতন্য সমকালীন জগন্নাথ দাসের সমসাময়িক অন্য একজন কবি অনন্ত দাস ছিলেন 'পঞ্চসখা'র একজন। ষোড়শ শতকে যে সকল ওড়িয়া কবি বাংলা কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনন্ত দাস। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় অনন্ত দাস রচিত **'ভজনতত্ত্ব'** (বি.১১২) নামক একটি পুথি সংরক্ষিত আছে। এই পুথিটির পাঠ ও পর্যালোচনা করেছেন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা তাঁর **'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত'** গ্রন্থে। অধ্যাপক পাণ্ডা এই পুথিটির অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন এইরূপ —

> ***"অনন্ত দাস রচিত 'ভজনতত্ত্ব' (বি.১১২) বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কিত কাব্যাশ্রয়ী আলোচনা। এই রচনার দ্বিতীয় একটি পাণ্ডুলিপি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে (৪৯০১) এবং তৃতীয় একখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় (২৭৭২) আছে।"***[৮]

কবি ছিলেন পুরাণবেত্তা এবং বৈষ্ণব দর্শনে সুপণ্ডিত, সে বিচারে তিনি জগন্নাথ দাসের সমকালীন। **"এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রাপ্ত পুথি দু'খানিতে কবি পরিচিতি যেরূপ পাওয়া যায় তা থেকে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কবি ছিলেন ষোড়শ শতকেরই অন্যতম বৈষ্ণব কবি জগন্নাথ দাসের সমকালীন কবি অনন্ত দাস।"**[৯]

'ভজনতত্ত্ব' কাব্যে কবি অনন্ত দাস শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বয়োবিভাগকে নিপুণভাবে কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে পরিবেশন করেছেন।[১০] কবি লিখেছেন এইরূপ —

"দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস।
এই চারিভাবে কৃষ্ণ সদাই বিবশ।।
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর যৌবন।
এই বয়োধর্ম্ম বুধ করে আচরণ।।
কৌমার বয়সে নন্দ যশোদা সহিতে।
বাৎসল্য ভাবেতে সুখী করিল নিয়তে।।
পৌগণ্ড বয়সে শ্রীদামাদি সখা গণ।
সখ্যভাবে তোষিল যে সভাকার মন।।"[১১]

খ. সপ্তদশ শতকের কবি ও কাব্য

ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্য রচনার প্রয়াস সপ্তদশ শতকেও পরিলক্ষিত হয়। সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জ **'দ্বারিকাপালা'** নামে একখানি পুথি রচনা করে গেছেন। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত বি. ৫০ ক্রম সংখ্যা বিশিষ্ট পুথিটির নাম **'দ্বারিকাপালা' (পরিশিষ্ট পুথিচিত্র ১ক দ্রষ্টব্য)**। ওড়িশায় প্রখ্যাত কবি উপেন্দ্রনাথ ভঞ্জের পিতামহ ছিলেন কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জ।

"ধনঞ্জয় ভঞ্জ (১৬১১ - ১৭০১) ঘুমসরের একজন প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। এটি করদ-মিত্র রাজ্য নয়, বেশ বড়ো একটি জমিদারী। ময়ূরভঞ্জের 'ভঞ্জদেও' পরিবার এবং হলদিয়ার 'ভঞ্জ' পরিবারের সঙ্গে ঘুমসর পরিবারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একদিকে প্রজানুরঞ্জক রাজা অন্যদিকে প্রতিভাবান কবি হিসেবে ধনঞ্জয় যে দুর্লভ উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, নীলকণ্ঠ এবং উপেন্দ্র তার সার্থক উত্তরসূরী।"[১২]

'দ্বারিকাপালা' পুথিটির পাঠ ও প্রতিলিপি সংগ্রহের সুযোগ ঘটেছিল বর্তমান গবেষকের। মধ্যযুগীয় কাব্যরীতির যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্মপরিচয় অংশ– এই পুথিটিতে তা অনুপস্থিত। যেহেতু

ধনঞ্জয় ভঞ্জের একটি মাত্র বাংলা কাব্য **'দ্বারিকাপালা'** তাই কবি বাহুল্যবোধে আত্মপরিচয়কে পরিহার করে গেছেন। কাব্যটির শেষে একটি বাক্যের খণ্ডাংশে 'রাজন্যকে কর দয়া' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি তাঁর আত্মপরিচয়ের বিস্তৃত বিবরণ না দিলেও একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রেখে গবেষকের অনুসন্ধানী মনকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। **'রাজন্য'** এই ইঙ্গিতবহ শব্দ আর এর উপরেই নির্ভর করে বিষ্ণুপদ পাণ্ডা তাঁর সম্পাদিত ধনঞ্জয় ভঞ্জের 'দ্বারিকাপালা' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, এই কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জ ব্যতীত অন্য কেউ নন।

কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জ তাঁর অগ্রজ ও সুপরিচিত কবি বলরাম দাসের **'লক্ষ্মীপুরাণ'** থেকে কাহিনীর মূল কাঠামোটি সংগ্রহ করলেও ধনঞ্জয় তাঁর কাব্যরচনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য রেখে গেছেন। ধনঞ্জয় তাঁর কাব্যে বলরাম দাস বর্ণিত কাব্যকাহিনীর কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন, যেমন— মহালক্ষ্মী স্তব, লক্ষ্মীব্রতের সুফল বর্ণনা, বিপদ সংকুল পথে হনুমানের গমন ইত্যাদি।

ধনঞ্জয়ের দ্বারিকাপালার মূল চরিত্র বলরাম, জগন্নাথ এবং লক্ষ্মী। রেবতী বা অন্যান্য কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্রও এই কাব্যে আছে। এরা সকলে দেবদেবী হলেও কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদের আচার-আচরণ একান্তই লৌকিক। এই সকল পৌরাণিক চরিত্রের কথাবার্তা সমকালীন সমাজের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বলরাম যেহেতু জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই হেতু সংসারের কর্তা তিনি। পরিবারের মান-সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা সবকিছুই বলরামের দায়িত্ব পালনের মধ্যে পড়ে। বলরাম যৌথ পরিবারের প্রধান। জগন্নাথকে প্ররোচিত করে ভ্রাতৃজায়া লক্ষ্মীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার মতো কাজ বলরামকে করতে হয়েছে শুধুমাত্র পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে। একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠের অবাধ কর্তৃত্ব এবং জাতপাতের তীব্রতা ইত্যাদি সমাজচিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বলরাম চরিত্রের ব্যক্তিত্ব এখানে দৃঢ়তর রূপে নির্মিত হয়েছে। বলরাম সম্পদের ন্যায়সঙ্গত অংশ গ্রহণ না করেও পরিবার থেকে পৃথগন্ন হতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে বলরাম বলেছেন–

"বাউন ভাণ্ডার সকলি তুমি নেই
কিছু দয়া থাকে যদি দিতে পার দেই।।" (পৃঃ ৭)

কিন্তু এই বলরাম যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে চণ্ডালিনীবেশী লক্ষ্মীর গৃহে অন্নগ্রহণের সম্মতি জানায়, তখন তাঁর বাস্তববুদ্ধির পরিচয় এই চরিত্রটিকে অনন্য মাত্রা দান করেছে। তখন বলরাম বলেছেন—

"বলরাম বলে তুমি শুনগো যুবতী।

অন্ন দিয়া রাখ প্রাণ কি করিবে জাতি।।" (পৃঃ ১৯)

আখ্যানভাগের প্রথমাংশে এই চরিত্রের ক্রোধ, মধ্যভাগে দুঃখভোগ এবং শেষভাগে লক্ষ্মী-জগন্নাথের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বলরাম চরিত্রটিতে।

জগন্নাথ চরিত্রটি একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পত্নী লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অসীম ভালোবাসা সত্ত্বেও তাঁকে বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব মেনে নিতে হয়েছিল জগন্নাথকে। নিজের লক্ষ্মীহীন অবস্থার কথা জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামকে বলতে গেলে বলরাম শ্লেষাত্মক বাক্যে বলেন **'নারীর মহত কথা আমারেতে কয়'** (পৃঃ ৮)। পরিবারের শান্তি রক্ষা করবার জন্য যতটুকু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন তা জগন্নাথ করেছেন। লক্ষ্মীর গৃহত্যাগের পর দুই ভাই সমান কষ্ট পেয়েছেন। তাঁদের সেই দুর্দশা করুণার উদ্রেক করে। এই দুই চরিত্র লৌকিক স্তরে নেমে গিয়ে আমাদের বাস্তবের ধূলি-মাটির সংসারের সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে।

'দ্বারিকাপালা'র মুখ্য চরিত্র লক্ষ্মীদেবী। কাহিনী শুরু হয়েছে তাঁকে নিয়ে। নগর পরিভ্রমণ করে তিনি যখন চণ্ডালিনীর ঘরে উপস্থিত হয়েছেন – কাহিনীর জটিলতা তখন থেকেই শুরু। বলরাম জাতিবিচারহীনা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে দিতে অসম্মত হন। কৃষ্ণজগন্নাথও নিজ পত্নীর এহেন কর্মে অসন্তুষ্ট। স্থূল ভর্ৎসনায় লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করলেন কৃষ্ণ। প্রকৃতপক্ষে জগতের কল্যাণের জন্য লক্ষ্মী নিয়োজিত থাকেন। সেই কাজে তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এইরূপ শর্তে জগন্নাথ তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু আজ এইরূপ অবস্থা দেখে লক্ষ্মীদেবী মর্মাহত। যুক্তিযুক্তভাবে লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের নিকট জানতে চাইলেন এইরূপ —

"লক্ষ্মীদেবী বলে আমারে যে কালে

বিবাহ করিলে তুমি

সংসারের চিন্তা করিব সর্বথা

পূর্বে কহিয়াছিলু আমি।।" (পৃঃ ৮)

প্রতিবাদ ও বক্তব্য উপস্থাপনে লক্ষ্মী চরিত্রটি বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণা এক নারী। তাঁর শ্লেষোক্তি

ও রসবোধ অতুলনীয়। কৃষ্ণ যখন লক্ষ্মীকে কিছুতেই মন্দিরে থাকতে দেবেন না, লক্ষ্মী তখন বললেন—

"...... শুন গদাধর।
আমিতো চণ্ডালী বটি তুমি জাতিস্মর।।
বিদুরের ঘরে গিয়া কলা চোপা খায়্যা।
পাণ্ডবের সঙ্গে বুল নফর হইয়া।।" (পৃঃ ৯)

'দ্বারিকাপালা' কাব্যখানি অক্ষরবৃত্তের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। পয়ারগুলি ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা বিশিষ্ট। ত্রিপদী ছন্দের ক্ষেত্রে দু-প্রকার মাত্রা বিন্যাস লক্ষিত হয়। বহু জায়গায় ৮ + ৮ + ১০ মাত্রা বিশিষ্ট এবং দুয়েক স্থলে ৬ + ৬ + ৮ মাত্রার ত্রিপদী দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্যে ছন্দের দোষ ত্রুটি আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে রচনাটির কাব্যমূল্য কতখানি হ্রাস পেয়েছে তা বিচার্য বিষয়।

ধনঞ্জয় ভঞ্জের **'দ্বারিকাপালা'** কাব্যে শব্দালংকারের প্রয়োগ লক্ষিত হয় না। স্বাভাবিক কারণ এই, যেহেতু মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষায় কাব্য রচনা করছেন কবি। ফলে বাংলা শব্দভাণ্ডারের অধিকার ওড়িয়া কবিদের ততোধিক ছিলনা বা শব্দালংকারে প্রয়োগ করবার মতো শব্দ চয়নের ক্ষমতা কবিদের ছিলনা। ধনঞ্জয় ভঞ্জের এই কাব্যখানিতে কিছু অর্থালংকারের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে—

১। *কপালে সিন্দুর ছবি যেন প্রভাতের রবি*
নৌতন বেষ্টিত গন্ধরাজে।
দশচন্দ্র পদনখে আরশি বসিয়া দেখে
সুবর্ণ বলয় তায় সাজে।। (পৃঃ ১)

২। *মুকুতার মালা যেন যোলকলা*
চান্দ ঝলমল করে।। (পৃঃ ১১)

'দ্বারিকাপালা' সম্পর্কে বিষ্ণুপদ পাণ্ডা লিখেছেন —

"আলোচ্য কাব্যখানি করুণ রসাশ্রিত। লক্ষ্মীর বিতাড়ন পর্ব থেকে শুরু

করে বলরাম জগন্নাথের ভিক্ষোপজীবী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীরই বাড়ীতে বলরামের ব্যর্থ রন্ধন প্রচেষ্টা এই করুণরসকে ঘনীভূত করে। কাব্যের সমাপ্তি কিন্তু মিলনাত্মক। বিচ্ছেদ বেদনায় বিমণ্ডিত কাব্যখানি যখন মিলনের নিগূঢ় আনন্দে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তখন পাঠক মাত্রেরই অন্তর আনন্দে আপ্লুত হয়। বলরাম জগন্নাথের ভিক্ষারী মূর্ত্তি বা বলরামের পাচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার পর ব্যর্থতার আক্রোশে হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে ফেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রগুলি হাস্য রসাত্মক। করুণ রসের পটভূমিতে এই শুভ্র ও সংযত হাস্যরস অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে।”[১৩]

সপ্তদশ শতকের অন্যতম সাধক কবি দ্বারিকাদাসের একখানি পুথি ওড়িশা রাজ্যপ্রদর্শশালায় সংরক্ষিত আছে। পুথিটির বিষয় **‘মনসামঙ্গল’**। দ্বারিকাদাসের **‘মনসামঙ্গল’** কাব্যখানি সম্পাদন করেন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। অধ্যাপক পাণ্ডার সম্পাদিত দ্বারিকাদাসের **‘মনসামঙ্গল’** কাব্যটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে।[১৪] অধ্যাপক পাণ্ডা তাঁর **‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত’** গ্রন্থে বলেছেন :

“কলকাতার কোনো এক প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় উড়িষ্যার মধ্যযুগের বাংলা পুথি আবিষ্কারের ঘটনাটি সালঙ্কারে প্রকাশিত হয় এবং এরপর সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখে এবিষয়ে খোঁজখবর নেন। সম্পাদিত মনসামঙ্গলখানি দেখার জন্য তিনি ভুবনেশ্বরে আসেন আর এখানি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেন।”[১৫]

কবি দ্বারিকাদাস (১৬৫৯ - ১৭৩৯) ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডার মতে —

“তাঁর জন্মের সাল তারিখ সম্পর্কে উড়িষ্যার সর্ব শ্রদ্ধেয় গবেষক ড. আর্তবল্লভ মহান্তী, ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা বিনায়ক মিশ্র, পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ দাস প্রভৃতির অভিমত এবং ওড়িয়া রচনা ‘শিবপুরাণে’ কবির নিজস্ব বক্তব্য ইত্যাদি একত্রে বিচার করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।”[১৬]

কবি দ্বারিকাদাসের কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্যটি নয়, রামায়ণ ও ভাগবতাশ্রয়ী কাব্যও রচনা করেছেন। এছাড়া ওড়িয়া ভাষায় বারো-তেরোখানি কাব্য রচনা করেছেন। মনসামঙ্গলখানি কবির বাংলা রচনা। এইরূপ সাহিত্য রচনার কারণ সম্পর্কে কাব্যে আভ্যন্তরীণ কিছু তথ্য আমাদের সাহায্য করে। যেমন, একটি ভনিতায় কবি বলেছেন –

"গুমগড় নন্দীগ্রামে এ গীত বর্ণন।
মনসামঙ্গল গীত কবিরাজে কন।। (পৃঃ ৯)

অন্যত্র কবি আবার শোনালেন –

কেরুড়ে নিবাস করি নন্দীগ্রামে আসি।
রচিলু তুমার গীত মনে অভিলাসি।। (পৃঃ ১৩)

সাধক কবি দ্বারিকাদাস মেদিনীপুরে থেকে তাঁর '**মনসামঙ্গল**' কাব্যের পুথিটি রচনা করেছেন – এইরূপ অভিমত পোষণ করেছেন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। অধ্যাপক পাণ্ডার মতে–

> ***"গুমগড় আর নন্দীগ্রাম সঙ্গীতচর্চা ও নাট্যচর্চার জন্য বিখ্যাত দুটি জনপদ মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত। এ দুটি স্থানের উপরিউক্ত খ্যাতি খুবই প্রাচীন। অনুমান করতে পারি, গৃহী-সন্ন্যাসী এই সাধক মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম অঞ্চলে কিছুদিন বসবাস করছিলেন আর সেই অবসরে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল পাঠ করেন বা গীত হতে শোনেন। বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী তাঁর নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিলনা।"***[১৭]

দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যটির সাথে পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের সপ্তদশ শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যের সাথে যথেষ্ট মিল আছে। দ্বারিকাদাসের কাব্যপাঠের দ্বারা উপলব্ধ হয় যে, কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের প্রভাব দ্বারিকাদাসের কাব্যের উপর পড়েছে। এপার বঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাসের জনপ্রিয়তা এতখানি ছিল যে সীমান্ত বঙ্গপ্রদেশগুলিতে তার ভাষান্তর বা অনুবাদ হয়েছে।

"মানভূম থেকে দেবনাগরী হরফে লেখা ক্ষেমানন্দের ভণিতায় আঞ্চলিক শব্দে পূর্ণ একখানি অতিক্ষুদ্র মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। ভাষা দেখে একে অর্বাচীন বলে মনে হয়।পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাস অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করলে তাঁর ভণিতার অনুকরণে প্রান্তীয় অঞ্চলে বোধ হয় কেউ কেউ এই পুস্তিকাখানি লিখে থাকবেন।"[১৮]

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী শুধুমাত্র মানভূম নয়, ওড়িশার অঞ্চলগুলিতে কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের প্রভাব পড়েছে। কবি দ্বারিকাদাস তাঁর কাব্যে নন্দীগ্রাম ও গুমগড় এলাকায় শ্রুত মনসামঙ্গলের কাহিনীতে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যরচনা শুরু করেন যা কবি কাব্যে উল্লেখ করেছেন একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও গুমগড়ে সপ্তদশ শতকের কবি কেতকাদাসের কাব্যের প্রচলন ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সাধক কবি দ্বারিকাদাস মনসামঙ্গল রচনার অভিলাষে সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাব্যকাহিনীর উপর নির্ভরশীল হবেন এটাই স্বাভাবিক।

দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের উপর কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের ছায়াপাত যে পড়েছে নিম্নে কাব্যাংশগুলি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ—

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরীগুলির মাঝি-মাল্লার সবাই ছিল পূর্ববঙ্গীয়। কবি কেতকাদাস পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। পূর্ববঙ্গের বাঙালদের নিয়ে কবি রসিকতা করতে কুণ্ঠিত হননি। কেতকাদাস তাঁর কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরীগুলি ডুবে যাওয়ার পর **'চাঁদের দুর্জয় মনোবল'** অংশে মাঝি-মাল্লাদের দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেছেন নিম্নরূপ :

"বাঙ্গাল কাঁদে হুডুর বাফে বাফে (ধ্রু)

** * * * * * * * * * * * * * * * * * **

শিরে হস্ত দিয়া কান্দে সকল বাঙ্গাল।

সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙাল।।

পোস্তের হোলা[*১] *ভাস্যা গেল ছাকিনার কানি।*

আর বাঙ্গাল বলে গেল ছেঁড়া কাঁথা খানি।।

ধুলায় লুটায়্যা কান্দে যত বাঙ্গালেরা।

সাত গাঁট্যা টেনা[*২] তার হয় জ্ঞানহারা।।"*

[১. পোস্তের ফলটির ওপরের খোসা (খোলা > ছোলা > হোলা) জলে ভিজিয়ে খেলে আফিমের মত নেশা হয়। ২. ছেঁড়া কাপড়।]

দ্বারিকাদাস তাঁর কাব্যে অনুরূপ অংশে বর্ণনা করলেন এইভাবে —

"মনসা করিল বল সাত ডিঙ্গা গেল তল
মরিল বাঙাল কর্ণধার।
সর্বস্ব ভাসিল জলে চাঁদ বান্যা কোণে বলে
মনসারে নিন্দয় অপার।।
বলে কানি চেঙমুড়ি ভরা নৌকা খাইল বুড়ি
প্রাণে মাইল সকল বাঙালে।
ছ পুত্র আমার খায়্যা আছিল ভরসা পায়্যা
আজু ডিঙা ডুবাইলা জলে।।" (পৃঃ ২৮)

'সনকার ক্রন্দন' অংশে কেতকাদাসের চাঁদ সদাগর বলেন—

"শুনিয়া তা চাঁদ বেনে হরষিত হৈল।
স্কন্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল।।
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ।
কানি চেঙমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ।।
ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বান্যা।
কানির উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টানা।।
কাট করয়া কাট নাড়া, রাম কলার পাত।
মৎস্য পোড়া দিয়া আজি খাব পান্তা ভাত।।"

উপরোক্ত কাব্যবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়ভাবে বিচার্য দ্বারিকাদাসের বর্ণনা—

"রজনীর শেষ ভাগে দংশিল কালিনী নাগে
বুঝিয়া সকল সমাচার।
হেন্তালের বাড়ি কান্ধে নাচিতে লাগিল চান্দে
আনন্দেতে হাসিয়া অপার।।
বোলে মোর ভাল হৈল পুত্র লক্ষ্মীন্দর মৈল
ঘুচিলেক কানির বিবাদ।।"

মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যের কাহিনীবস্তু মূলত তিন প্রকার, যথা– বৈষ্ণব সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কাহিনী, অন্যান্য পুরাণের কাহিনী বিষয়ক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মতো মঙ্গলকাব্য চর্চা মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে বিরল। ফলে দ্বারিকাদাসের কাব্যের মধ্যে রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়[১৯], এই বৈশিষ্ট্য ওড়িয়া কবির স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। ফলে দ্বারিকাদাসের কাব্যে দেখি বাণিজ্যতরীগুলি ডুবে যাবার পর আশ্রয়হীন চাঁদ সদাগর পুরানো বন্ধু ধর্মদাসের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। এক বন্ধুর বিপদে অন্য বন্ধুর সহায়তাদান খুবই প্রত্যাশিত, তবু ধর্মদাসকে তার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে চাঁদ শুনিয়েছেন এইরূপ —

"যবে রঘুনাথ গেল বনে।
সঙ্গে লয়্যা জানকী লক্ষণে।।
সীতারে হরিল দশশির।
কাঁদিয়া আকুল রঘুবীর।।
মৈত্রী কৈল সুগ্রীবের সাথে।
বালিবধ করি শরাঘাতে।।
মৈত্রে দিলা রাজ্য বল সুখ।
সে পুন্য হরিল তার দুখ।।
সঙ্গে লয়্যা নানা বীরগণ।
সমুদ্র বান্ধিয়া কৈল রণ।।
রাবণের বংশ বধ করি।
উদ্ধারিল জনক কুমারী।।

জটায়ু নামেতে পক্ষী ছিল।

মৈত্রের কারণে প্রাণ দিল।।" (পৃষ্ঠা ১৯)

উদ্ধৃত অংশটিতে রামায়ণের কাহিনী শুনিয়ে বন্ধুকে তার কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসটি যেমন দেখা গেল তেমনি দেখা গেল ৬ + ৪ = ১০ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ। কেতকাদাসের কাব্যের প্রভাব বা ছায়াপাত যা-ই ঘটে থাকুক দ্বারিকাদাসের কাব্যের ছন্দ প্রয়োগ, শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শালীনতাবোধ ও সাধক জনোচিত সংযম তাঁর কাব্যকে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব দান করেছে।

গ. অষ্টাদশ শতকের কবি ও কাব্য

অষ্টাদশ শতকের পালা রচয়িতা কবি কর্ণ একটি বিতর্কিত নাম। ওড়িশায় **'কবি কর্ণের ষোল-পালা'** নামে একটি কথা প্রচলিত আছে। ১৯৮২ সালে কবি কর্ণের পালাগুলি সংকলন করবার জন্য এগিয়ে আসেন **'ওড়িশা রিজিওন্যাল কলেজ অফ এডুকেশন'**-এর অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। **'ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা'**র অধ্যক্ষ এবং ওড়িশা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত নীলমণি মিশ্রের সহযোগিতায় কবি কর্ণের পালাগুলিকে সম্পাদন করার কাজে অগ্রসর হন।[২০] কবি কর্ণের পালাগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে অধ্যাপক পাণ্ডা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এইরূপ—

"কবি কর্ণের রচনাগুলিকে পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে প্রথম সমস্যা দেখা দিল পণ্ডুলিপির বাহুল্য নিয়ে। প্রায় ছ'বছর আগে (১৯৮২) যখন কবি কর্ণকে নিয়ে কাজ করি তখন তাঁরই নামাঙ্কিত পালার পাণ্ডুলিপি প্রায় দু'শ খানি সংগৃহীত হয়েছিল। কোন কোন পাণ্ডুলিপির সংখ্যা একখানি বা দু'খানি হলেও কিছু পালার সংখ্যাধিক্য সমস্যা রূপেই দেখা দেয়।..... যাই হোক যে ৩৫ খানি পালার রচয়িতা হিসেবে কবি কর্ণের নাম উড়িষ্যা রাজ্য পুথিশালার মুদ্রিত তালিকায় উল্লিখিত আছে। সেগুলির মধ্য থেকে মোট কুড়িখানি পালা কবি কর্ণের বাংলা রচনা রূপে সম্পাদনার যোগ্য বলে গ্রহণ করার পর তুলনামূলক বিচারের জন্য শঙ্কর আচার্যের 'উগ্রতারা পালা' (ও. এল. ২৭৫) তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। একুশখানি পালা সম্পাদিত হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।"[২১]

পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করি কবি কর্ণের পালাগুলি গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে। *"ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি আর্টস, নিউদিল্লী ও মোতিলাল বানারসী দাস পাবলিশার্স প্রা. লি., দিল্লী থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কলামূলশাস্ত্র গ্রন্থমালার ৪-৭ খণ্ডের বিষয় সত্যপীর। গ্রন্থমালার সাধারণ সম্পাদক কপিলা বাৎসায়ন। পালা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। ওড়িশা স্টেট মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রায় ৫৫ হাজার পুথির মধ্যে বাংলা পুথিগুলি আলাদাভাবে বিষ্ণুপদ বাবু চর্চা করেছেন। এসব পুথির মধ্যে কবি কর্ণের ২১টি পালার আলোচনা চার খণ্ডের পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি হরফে যেমন একপ্রস্থ মুদ্রিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি তার ইংরেজি অনুবাদও রয়েছে।"*[২২] যে সকল কবিকর্ণ নামাঙ্কিত পুথিগুলি বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদনা করেছেন সেগুলি হল, **'সত্যনারায়ণ জন্ম পালা'** (ও. এল. ১২৭৬), **'পদ্মলোচন পালা'** (ঐ), **'গুড়িয়া শঙ্কর পালা'** (ঐ), **'বিদ্যাধর পালা'** (ঐ), **'মর্দগাজী পালা'** (ও. এল. ১৩৪৩), **'মর্দগাজী বিভাপালা'** (ও.এল ১২৭৬), **'মদন সুন্দর পালা'** (ও. এল. ২৭৩), **'শ্রীমন্ত সৌদাগর পালা'** (ও.এল. ১২৪২), **'অভিন্ন মদন পালা'** (ও.এল. ৬১৯), **'দুর্জন সিংহ পালা'** (বি. ২২১), **'হেরাচান্দ পালা'** (ও.এল. ৬১৯), **'ফাশিয়ারা পালা'** (ও.এল. ১২৭৬), **'কাঠুরিয়া পালা'** (ও.এল. ১৩৪৩), **'কিশোর মোহন পালা'** (বি. ৮৩৯), **'লক্ষণ কুমার পালা'** (ও.এল. ১২৪২), **'সত্যনারায়ণ পালা'** (বি. ১৫০), **'চন্দ্রাজিত বিভা পালা'** (ও.এল. ১২৭২), **'হীরামোহন পালা'** (বি. ১৪৯), **'দশ অবতার পালা'** (ও.এল. ২৭৩), এবং **'নীলসুন্দর পালা'** (ও.এল. ১৮৪৫)।

এই পালাগুলির মূল কাঠামো হলো সত্যনারায়ণ পূজার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ফলে দুর্গতিভোগ তারপরে পূজা করে শিরনি গ্রহণের পর দুর্গতির কবল থেকে মুক্তি লাভ। কবি কর্ণ এই কাঠামোর মধ্যে নতুন নতুন কাহিনী এনেছেন নানা সূত্র থেকে। সেগুলিতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটি মাত্রার সংযোজন ঘটিয়েছেন। সেই নূতন মাত্রাটি হলো, সত্যনারায়ণ আর সত্যপীরকে অভিন্নভাবে দেখানো। ফকির বেশধারী সত্যপীর কাহিনীর নায়কের কাছে পূজা আর শিরনি চেয়ে ব্যর্থ হবেন। তিনি বোঝাবেন যে সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ অভিন্ন। কোরাণ আর পুরাণের মূল বক্তব্যের মধ্যে কোন ভেদ নেই। নায়ক এসব স্বীকার না করে নিজে বিপন্ন হবেন। পরে ফকিরবেশী সত্যপীর নায়ককে বিভিন্ন দেবতার রূপ দর্শন করিয়ে পুজো করতে আর শিরনি করতে রাজী করাবেন।

নায়কের সব দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। অবশ্য কাহিনীকে কবি কর্ণ কোথাও সহজভাবে উপস্থাপন করেননি। বিচিত্র নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি মিলনাত্মক মধুর সমাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এর সঙ্গে আছে সত্যনারায়ণ পূজার বর্ণনা আর হিন্দু-মুসলমানের একত্র শিরনি প্রসাদ গ্রহণের কথা। সাধারণ ব্রতকথার কাঠামোর মধ্যে ঐখানে কবি কর্ণের মৌলিক কবি প্রতিভার সন্ধান মেলে।

পালাগুলির মধ্যে গীতিপ্রাণতা আছে। এই পালাগুলি প্রধানত গানের জন্য রচিত হয়েছিল। গায়েনরা গীতি পরিবেশন করার সুবিধার্থে কিছু কিছু অংশ যোগ করেছেন। **'দুর্জন সিংহ পালা'**-র একটি অংশ গীতিধর্মীতার একটি নিদর্শন —

"দেখিয়া সে মহারাজা হৈল চমৎকারে।
ফকীর আইলা কাছে এই বারে বারে।।
সেত সরস নাগর
সেই কালারে
হায় হায়রে।
ফকীর বলে রাজা শুন মন দিয়া।
ভিক্ষা মোরে দেঅ রাজা হরষিত হয়া।।"[২৩]

'দশ অবতার' পালায় রানী সুভগার সাধভক্ষণ তালিকা তুলে ধরলেন কবি এইরূপ —

"চিঙ্গুড়ি কাণ্ঠাল মঞ্জি খর লুন দিয়া।
বাসি পান্তাভাত খাবো পোড়া মাছ দিয়া।।
মার্গশীরে খই দই খাইতে লাগে মিঠা।
আর কিছু খাইতে দিবে বাসি পানিতে পিঠা।।
রানী সব কহনা লো
কালি জনম হইব চান্দ পরা পো।
মাঘেতে মধুর পিঠা কটু তৈলে সিম।
ফাল্গুনেতে দিবে মোরে বার্তাকুতে নিম।।"[২৪]

এই পুথিগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে সম্পাদক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা উপরোক্ত এই অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করেছেন। '**এগুলি মূল রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বা এই সংযোজনগুলি সামাজিক, ঐতিহাসিক কোন নতুন মাত্রার সন্ধান দেয়না।**'[২৫]

কবি কর্ণের জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ যথেষ্ট আছে। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা কবি কর্ণের জন্মস্থান উল্লেখ করেছেন খড়্গপুর নিকটবর্তী '**পাপড়িয়া**' নামক একটি গ্রামকে। মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে অধুনা '**কর্ণগড়**' নামে স্থানটিতে এখনো সেকালের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, সেখানে রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রিত ছিলেন কবি কর্ণ। কবি কর্ণের '**কবি**' উপাধী নিয়ে সপ্তম পুরুষ এখনো পাঁপড়িয়া গ্রামে বাস করে আসছেন। স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিতে পারি যে, কবি কর্ণের রচনাগুলি তাঁরই এক বংশধর ওড়িশা নিয়ে আসেন অষ্টাদশ শতকে। উনিশ শতকের মধ্যেই কবি কর্ণের পালাগুলিকে কেন্দ্র করে একটি নিবিড় পালা সংস্কৃতি ওড়িয়াা সংস্কৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। কবি কর্ণের অনুকরণে বহু পালা ওড়িয়া ভাষায় রচিত হয়েছে। ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় (Odissa State Museum) কবি কর্ণ ভণিতায় প্রায় ৩৫খানি পুথি পাওয়া যায়। কবি কর্ণের ভণিতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পুথিগুলির ভাষা-ই কবির জন্মভূমি ও বাসস্থানগত পরিচিতিকে অস্পষ্ট করে রেখেছে। তার কারণ, কবি কর্ণ ভণিতায় অনেকে বাংলা ভাষায় পুথি লিখেছেন। আর কোন কোন পুথিতে বাংলা ও ওড়িয়া শব্দের যথেষ্ট মিশ্রণ আছে — যেগুলির বাক্য গঠন ওড়িয়া ভাষানুসারী। কিছু পুথি সম্পূর্ণ ওড়িয়া ভাষায় রচিত। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত কুঞ্জবিহারী দাসের '**A Study of Orissan Folklore**' (১৯৫৩) গ্রন্থে অধ্যাপক দাস কবি কর্ণের পরিচিতি দিয়েছেন এইরূপ —

> ***"This Kavi Karna most probably is a man of Midnapore – a border district between Bengal and Orissa. He could neither express himself in Chaste Bengali nor Chaste Oriya. Persian was used due to influence of the court language of the time. But percentage of Bengali words is greater than those of Oria and Persian. He was a Bengali but was intimately acquanted with the social life of Orissa."***[1]

সুতরাং ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্যচর্চার যে প্রয়াস ওড়িশার ভূখণ্ডে পরিলক্ষিত হয় তা মূলত দুই প্রকার কবিকুলের প্রচেষ্টায়। **প্রথমতঃ** সিংহভাগ কবি চৈতন্যসংস্কৃতিতে লালিত ও বাংলা ভাষায় দক্ষ ওড়িশার মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী এবং **দ্বিতীয়তঃ** ওড়িশা প্রান্তবর্তী ওড়িয়া ভাষাও লিপি বিদ্যায় শিক্ষিত বঙ্গপ্রদেশের অধিবাসী। কবি কর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিব্যক্তিত্ব এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কালানুক্রমে অনুলিপি ও লিপ্যন্তরের মাধ্যমে **'কবিকর্ণ'** ভণিতায় যথেষ্ট পরিমাণ পুথির জন্ম হতে পারে — এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অষ্টাদশ শতকে ওড়িশার প্রায় অজ্ঞাত পরিচিত কবি দ্বিজ রঘুরাম। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা **'জয়ানন্দ পালা'** টির পুথি ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালয় (বি. ৬২) সংরক্ষিত আছে। পুথিটির লিপি ওড়িয়া এবং ভাষা বাংলা। এই পুথিটির সম্পাদনার কাজ শুরু করেছিলেন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা মহোদয়। পরবর্তীকালে তাঁর সম্পাদিত কাজটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে পারেনি। অধ্যাপক পাণ্ডার সম্পাদিত জয়ানন্দ পালার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি আমাদের সংগ্রহে আসে এবং তা নির্ভর করে গবেষণা অভিসন্দর্ভে **'জয়ানন্দ পালা'**র স্বরূপ ও মৌলিকত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিজ রঘুরামের নাম ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে অনুল্লিখিত। এঁর রচিত বাংলা বা ওড়িয়া ভাষায় রচিত দ্বিতীয় কোন পুথি আজও সংগৃহীত হয়নি। মূলত ওড়িয়া ভাষায় রচিত কোন পুথি পাওয়া যায়নি বলেই তার সম্পর্কে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হয়নি। পুথিটিতে প্রাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করেই কবি সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে আমরা কবির পরিচয় অন্বেষণে সচেষ্ট থাকবো।

কাব্যের মধ্যে কবি বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেই সব ওড়িয়া শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কবি ওড়িশা ভূখন্ডের অধিবাসী ছিলেন। কবি রঘুরাম ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করলেও তা মধ্যযুগের অন্যান্য ওড়িয়াভাষী বাংলা কবির তুলনায় অনেক কম ওড়িয়া শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর বাংলা ভাষায় ভাষাজ্ঞান অন্যান্যদের তুলনায় অনেক গভীর ছিল।

দ্বিজ রঘুরামের কাব্যভাষা নিঃসন্দেহে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক পূর্বের বাংলা ভাষা। সন্ধি ও অভিশ্রুতি, পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান লোপ, ব্রজবুলি শব্দের প্রয়োগ, আরবি-ফারসি শব্দের

সংমিশ্রণ ইত্যদি অন্ত্য-মধ্য বাংলার লক্ষণ যা আমাদেরকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলা ভাষাকে। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগবৈচিত্র্য মূলত অষ্টাদশ শতকে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। সেদিক থেকে রঘুরামের 'জয়ানন্দ পালা'য় আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ আছে। হয়তো লিপিকরের শব্দ সংযোজন কর্ম হতে পারে। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে রচিত কোন কাব্যের পুথির অনুলিপি অষ্টাদশ শতকে যদি লিখিত হয় তাহলে সমকালের ব্যবহৃত শব্দ পুথিতে প্রযুক্ত হতে পারে। এই সকল কারণ যদি স্বীকার করা যায় তাহলে কবি রঘুরামের কাব্য রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য পুথিখানির প্রথম অংশ বিনষ্ট হওয়ার কারণে সম্পাদক অধ্যাপক পাণ্ডা কাব্যভূমিকার কিছু অংশ আলোচনা করে যেতে পারেননি। তবু অবশিষ্টাংশ থেকে একটি সম্পূর্ণ আখ্যানবৃত্ত পাওয়া যায়। জয়ানন্দ পালাটি সত্যপীরের মহিমাজ্ঞাপক পালা। কবি কর্ণের সত্যনারায়ণ পালাগুলির মতো এই পালাটিও অলৌকিক কাহিনী নির্ভর রূপকথাধর্মী এক সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের মহিমাজ্ঞাপক পালা। কাব্য কাহিনীটি এইরূপ—

হীরানন্দ সাধুরা বা সদাগরেরা ছিলেন ছ'ভাই — হীরানন্দ, পুরন্দর, গোপাল, মুকুন্দ, বিদ্যানিধি, আর জয়ানন্দ। এদের মধ্যে কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে এসেছেন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এবং তাদের দুই স্ত্রী। বাদবাকি ভাইয়েরা কাব্য কাহিনীতে সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপে আছে। ত্রিহট্ট নগরে বাস করতেন এই সদাগরেরা। ঐ রাজ্যের ভাণ্ডারে চন্দন ও চামর ছিলনা। এই দুটি বস্তুর অভাবে রাজার পক্ষে খুব অবমাননাকর মনে হয়েছিল। রাজা তাই এই সকল দ্রব্য সংগ্রহের জন্য হীরানন্দের উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন। রাজার আদেশে, **'শীঘ্রগতি ছয় ডিঙ্গা করিল সাজন'** এবং হীরানন্দেরা যখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত, তখন সত্যপীর এলেন তাঁদের কাছে। তাঁর কামনা ছিল এদের কাছ থেকে শিরনির মানত পেয়ে এদের যাত্রা যাতে সফল হয় তার জন্য আশীর্বাদ করে যাওয়া। তবে এবিষয়ে পীর মনস্থির করে এসেছিলেন যে —

"যদ্যপি কপট বেটা করিবেত নাম।
তবেত করাব তারে ঘোর বিড়ম্বন।।" (পৃঃ ৪)

পীর এসেছেন সাধারণ ফকিরের বেশে। শুভ কাজে যাত্রার সময় ভিখারী দর্শন শুভ নয় বলে

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়ানন্দ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং এর ফলে সত্যপীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তখনই ঘোষণা করলেন যে তাঁর যদি দৈবশক্তি থাকে তাহলে জয়ানন্দের পত্নী চাঁপাবতীকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে যথোচিত শিক্ষা দেবেন তিনি। পরবর্তীকাল জয়ানন্দকে এবং তার স্ত্রীকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। জয়ানন্দের পুত্র অমর পিতা-মাতা ও তার পরিবারের অন্যান্যদের উদ্ধার করেন এবং চন্দন ও চামর এনে রাজাকে উপহার দেন। রাজকন্যাকে বিবাহ করে ত্রিহট্ট নগরে ফিরে এসে সত্যপীরের পূজা দেন ও শিরনি প্রদান করেন।

দ্বিজ রঘুরাম রচিত এই পালার মৌলিকতার কথা বলতে গেলে প্রথমেই এর কাহিনী পরিকল্পনা লক্ষণীয়। দ্বিজ রঘুরাম পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে স্বকপোলকল্পিত গল্প বা উপকথা এবং রূপকথার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কল্পিত কাহিনীর উপর রোমান্স প্রবণতা শেষ পর্যন্ত বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের শাবক হত্যায় উদ্যত অজগর এমনকি জীয়নকাঠি আর মারণকাঠি (সোনা ও রূপার) প্রসঙ্গও এনেছেন। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পালার ক্ষেত্রে এ এক অভিনব সংযোজন বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে যে সকল সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া যায় সেই সকল কাব্যের কাহিনী পরিকল্পনায় এই রকম রূপকথার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়না। এর সাথে অলৌকিকতা ও রোমান্স **'জয়ানন্দ পালাকে'** মৌলিকতা দান করেছে। এই সংমিশ্রিত উপস্থাপনার ফলে কাব্যকাহিনীর অখণ্ডতা বা সমগ্রতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। নিম্নোক্ত একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে।

অমর গিয়েছে সবাইকে উদ্ধার করবার জন্যে। প্রথমেই যোগীর বাড়ির মধ্যে গিয়ে চাঁপাবতীকে বাঁচিয়ে তুলেছে জীয়নকাঠি ছুঁইয়ে। এরপর তাকে অনুরোধ করেছে যোগীর কাছ থেকে তার মৃত্যু রহস্যটি জেনে নেবার জন্যে। কিন্তু কী প্রকারে জানবে কবি বর্ণনা করলেন এইভাবে—

> ***"অমর বলেন তুমি মোর কথা শুন।***
> ***রমনী অশেষ কলা কত ছলা জান।।***
> ***মোহিবে যোগীর মন কটাক্ষের শরে।***
> ***কহিবে তাহার মৃত্যু তুমার গোচরে।।" (পৃঃ ২৯)***

এর চাইতে বাস্তবতর বুদ্ধি বোধহয় অকল্পনীয়। চাঁপাবতী যখন যোগীকে কটাক্ষ বাণে জর্জরিত

করলেন এবং প্রশ্ন করলেন **'বিদেশে ঘটিলে মৃত্যু কে জিয়াবে মোরে?'** যোগী উত্তর দিয়েছে যে সে অমর— তার মৃত্যু নেই। চাঁপাবতী তার উত্তরটিকে সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি। তখন চাঁপাবতী পৌরাণিক কাহিনীর প্রসঙ্গ এনেছে—

"রমণীর বশে বটে গোলকের নাথ।
সত্যভামা মাগিতে দিলেন পারিজাত।।" (পৃঃ ৩১)

এরপর যোগী মোহগ্রস্ত হয়ে সত্যকথা অকপটে বলে ফেলেন—

"রাবণের মহানাদ প্রাচীর ভিতরে।
বটবৃক্ষে পেচক আছে কোটর ভিতরে।।
পেচক মারিলে মরি শুনগো সুন্দরী।
নতুবা আমার মৃত্যু নাই প্রাণেশ্বরী।।" (পৃঃ ৩১)

মৃত্যু রহস্যের এইরূপ পরিকল্পনায় একান্তভাবে রূপকথার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ওড়িশার সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব স্বাভাবিক ঘটনা। এক্ষেত্রে রামায়ণের প্রসঙ্গ এনেছেন কবি। সুতরাং পৌরাণিক কাহিনীর সাথে রূপকথার মিশ্রণে **'জয়ানন্দ পালা'**টি নির্মিত। এরফলে কাব্যকাহিনী হয়ে উঠেছে এক নিটোল উপাখ্যান।

কবির কাব্য চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে তাঁর ব্যবহৃত ভাষায়। **'জয়ানন্দ পালা'**য় বাংলার সঙ্গে ওড়িয়া আর আরবি-ফারসি শব্দের অনায়াস সংমিশ্রণ দেখা যায়। ত্রিবিধ ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে উপযুক্ত শব্দ চয়ন এবং রচনার কাব্যমূল্য অক্ষুণ্ণ রেখে সেই শব্দ সমূহের প্রয়োগ ঘটানো যথেষ্ট শক্তিসাপেক্ষ।

বিশ্বভারতীর পুথি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত যে পুথিগুলির উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল, সেই সকল পুথির উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় যে, সেগুলিতে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দুটো উদাহরণ দেখা যেতে পারে —

১) *মদকের মাত্তা লয়্যা হুজুরে হাজির হআ*
হুকুমে চলয়ে দস বিষ।

খোসালে খেজমত করে কখন দোউড়্যা মরে

খাতক সাধিএ অহর্নিশ।।

(শ্রী দয়াল রচিত শঙ্কর গুড়্যা পালা)[২৬]

২) *যুনিঞা রাজা(র) কথা রানি লজ্জা পায়্যা*

হগিগত পুছেন বিরলে মাঙ্গাইয়া।

সমুখে বসাইয়া (তারে) পুছে দণ্ডরায়

চারি প্রহর দিন তোর জঙ্গলে কেন যায়।।

(বল্লভ দাসের মদন সুন্দর পালা)[২৬]

'**জয়ানন্দ পালা**'য় কিন্তু আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার যথেষ্ট স্বল্প। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভণিতায় আছে, '**হাজারে সেলাম দিয়া গায় রঘুরাম**'। এরপর কতগুলি ভনিতায় আছে, '**নৌতম কালাম দ্বিজ গায় রঘুরাম**', '**পীরের কালাম দ্বিজ রঘুরামে গান**', বা '**পীরের কালাম দ্বিজ রঘুরাম ভণে**' ইত্যাদি ধরণের ছত্র। এছাড়া দোয়া, জিগির, হাম, মুলাকাত, তুরুক, তাজিক, ডেরা এবং এইরকম আরো কয়েকটি শব্দ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

কবির পাণ্ডিত্য সম্পর্কে প্রথমে বলতে হয় যে— রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের উপাদান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর পৌরাণিক জ্ঞানে অধিকার যে কতখানি তা প্রমাণ দিয়ে গেছেন বহুক্ষেত্রে। শুধু রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত নয়, চৈতন্য জীবনী থেকে কবি উদাহরণ গ্রহণ করেছেন এইভাবে—

১) *হীরানন্দ বলে ভাই নয়ানের তারা*

তিলে না দেখিলে হয় কত যুগ হারা।।

এক পুত্র ছিল দেখ সুমিত্রা নন্দন।

রামের সঙ্গেতে যেন চলিল লক্ষণ।।

কি করিতে না পারয়ে নবঘনশ্যাম।

তিলে না ছাড়ই সেত ভাই বলরাম।। (পৃঃ ২)

২) *পতির বচনে কান্দে চাঁপাবতী নারী।*
গোকুল ছাড়িয়া কি মথুরা যাবে হরি।।
আমি অভাগিনী যাও অনাথ করিয়া।
চৈতন্য বিচ্ছেদে যেন কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া।।
রমণীর মুখ হেরি কহে জয়ানন্দ।
গোপীরে প্রবোধ যেন করিল গোবিন্দ।। (পৃঃ ২)

৩) *দু নয়ানে বহে ধারা শ্রাবণের পানি।*
সীতাশোকে যেমনি আকুল রঘুমণি।। (পৃঃ ১১)

৪) *ধূলায় ধূসর তনু জননী রোদনে।*
কৌশল্যা কান্দেন যেন রাম যায় বনে।
গোকুল ছাড়িয়া যে মথুরা যায় হরি।
শোকজলে ভাসে যেন গোকুলের নারী।।
নিমাই সন্ন্যাস কৈল অবধূত রায়।
গুরুতর নারী কান্দ্যা ধূলায় লোটায়।। (পৃ ২৫)

৫) *ভকত বৎসল হরি সমুদ্রে পশিল।*
পেচকে ধরিয়া সে সাধুহস্তে দিল।।
সত্রাজিতে যেন কৃষ্ণ আন্যা দিল মণি।
ভীম আসি জরাসন্ধে বধিল যেমনি।। (পৃঃ ৩৮)

উদাহরণগুলিতে কবির পুরাণ অভিজ্ঞতা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। রচনাটিতে একাধিক উপমান মালার আকারে উপস্থাপিত হয়ে মালোপমা অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে। সচেতন উপমা অলংকারের প্রয়োগ থাকায় রচনাটির কাব্যমূল্য যেমন বর্ধিত হয়েছে তেমনি পুরাণ অনুষঙ্গের ব্যবহারে কবির পাণ্ডিত্য যে কত গভীর তা প্রমাণিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের অন্যতম কবি রঘুনাথ দাস। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন এবং কিছু জনপ্রিয় সংস্কৃত সাহিত্যের টীকা রচনা করেন। ওড়িয়া ভাষায় কয়েকটি মৌলিক কাব্য রচনা করেন। কবি রঘুনাথ দাসের একখানি বাংলা কাব্যের পুথি উদ্ধার হয়েছে। '**ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা**'য় ও.এল - ৫১৮ ক্রমসংখ্যা বিশিষ্ট '**ভুবনমঙ্গল**' শীর্ষক একখানি ভাগবত বিষয়ক পুথি সংরক্ষিত আছে। অধ্যাপক অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ১৯৮৬ সালে '**ভুবনমঙ্গল**' পুথিটির সম্পাদনার কাজ শেষ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদিত পুথিটি ১৯৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রঘুনাথ দাসের '**ভুবনমঙ্গল**' কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ইনি একমাত্র কবি যিনি তাঁর এই কাব্যে নিজেকে ওড়িশার মানুষ হয়ে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার জন্য উৎসাহী হয়েছেন বলে উল্লেখ করে গেছেন। কবি বিনয়ের সঙ্গে বার বার পাঠকের কাছে আপন ভাষাদোষের কথা স্বীকার করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কাব্যের শেষাংশে '**কংসবধ**' অধ্যায়ের শেষে বলেছেন—

''অবনী আনন্দ হইল দিগ পরিমল।
রঘুনাথ দাস ভণে ভুবনমঙ্গল।।
ওড্রদেশী হইয়া কৈল বঙ্গলা বর্ণন।
না লইবে বচন দোষ সব সাধুজন।।
যইসনে তুলসী গান্থিয়া নিজ পটে।
না লয়ে তা দোষ দেবে ভূষণ মুকুটে।।
তৈছে ব্রজলীলা গান্থি ওড়িয়া বঙ্গালে।
একত্র করিয়া এহু ভুবন মঙ্গলে।।"

অথবা চতুর্দশ লীলার শেষে কবি বলেছেন—

''না লইবে সাধুজনে বচনের দোষ।
শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি জানে রঘুনাথ দাস।।"

রঘুনাথ দাসের '**ভুবনমঙ্গল**' কাব্যাটি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। কবি মূল ভাগবতের বহু অংশ বর্জন করে নিজের মতো করে কাব্যটিকে সাজিয়েছেন। কবির আসল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণের মাধুর্যলীলার দিকটি ফুটিয়ে তোলা। যার ফলে কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাকে কবি প্রকট রূপে দেখাননি।

এই কাব্যে কবির বৈষ্ণব জনোচিত বিনয় ও নম্রতা লক্ষ্য করা যায়। ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দ নির্মাণ করেছেন কবি। মায়াদাম (মায়ার সমষ্টি), সত্বরমনা (দ্রুতচিন্তাশীল), কাকুস্থ (ভয় মিশ্রিত কণ্ঠস্বর সহ), সীমস্থান (শীর্ষস্থান) প্রভৃতি শব্দ উদ্ভাবন করেছেন কবি। বিক্রমিল, প্রহারিল, উধারিল (ঋণ করল) প্রভৃতি নামধাতু বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ গঠন করেছেন কবি তাঁর কাব্যে। জনাজনি (একজনের সাথে একজন), পঁচাপঁচি (উভয়তঃ প্রস্তুত), অঁচাঅঁচি (টানাটানি) শ্রেণীর ব্যতিহার বহুব্রীহি, সুগঠিত সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য কবির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়।

শব্দালংকার ও অর্থালংকার কাব্যে সুপ্রযুক্ত হয়েছে। শব্দালংকারের একটি সার্থক উদাহরণ এইরূপ—

> ***"শ্রীগুরু শ্রীগদাধর গৌরপদদ্বন্দে।***
> ***রঘুনাথ দাস চিত লুব্ধ মকরন্দে।।"***

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের একটি নিদর্শন—

> ***"দিখিল গোপিনী কৃষ্ণ পুতনা হৃদিরে।***
> ***বেনি গিরিমধ্যে যেন শোভে দিবাকরে।।"***

ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় '**ভুবনমঙ্গল**' কাব্যে। কবি রঘুনাথ দাস ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রার পয়ার এবং ৮ + ৮ + ১০ মাত্রাবিশিষ্ট ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কাব্যে। মাঝে মাঝে ছন্দের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য ৩ + ৫ = ৮ মাত্রার পয়ার নির্মাণ করে ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন।

আধুনিক বাংলা ভাষায় হলন্ত উচ্চারণ রীতির প্রাধান্য অপরক্ষেত্রে ওড়িয়া ভাষায় স্বরান্ত উচ্চারণের প্রাধান্য থাকে। রঘুনাথ দাসের '**ভুবনমঙ্গল**' কাব্যটি পাঠক হলন্ত উচ্চারণে না পড়ে

স্বরান্ত উচ্চারণে পাঠ করলে অন্ত্যানুপ্রাসের শ্রুতিমাধুর্য্য লাভ করতে পারবেন।

> *"কাব্যটির মধ্যে উড়িষ্যার সমাজচিত্র এবং পল্লীচিত্রের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এ না থাকলেই বরং পাঠকেরা বিস্মিত হতেন। কাব্যটির মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রেও কবি বলেছেন যে, অশুভ শক্তির মুখোমুখি হওয়ার পর কৃষ্ণ গৃহপ্রত্যাগত হলে মাতা গোবৎসের পুচ্ছ পুত্রের মাথায় বুলিয়ে দিয়েছেন, কখনোবা গোক্ষুর রজ পুত্রের অঙ্গে স্পর্শ করিয়ে সমস্ত অমঙ্গল দূর করে দিয়েছেন। জানা গেল, এখনো পল্লীগ্রামে প্রাচীন ব্যক্তিরা এ রীতিকে মান্য করে চলেন। গোপিনীরা তাদের অপহৃত বস্ত্র সংগ্রহ করতে এসে বিশেষ ধরনের নাম বলে নিজেদের শাড়ি বেছে নিতে চেয়েছে। সে সব নামের শাড়ি এককালে উড়িষ্যায় খুব প্রচলিত ছিল।"*[২৭]

'ভুবনমঙ্গল' কাব্যের সম্পাদক অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা কবি রঘুনাথ দাসের মূল্যায়ন করেছেন এইরূপ—

> *"রঘুনাথ দাস অষ্টাদশ শতকের কবি। আপন চিন্তা ও অভিরুচির বশবর্তী হয়েই তিনি তাঁর পূর্বসূরী জগন্নাথ দাস, দীনবন্ধু দাস, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ককে অনুসরণ করে ভাগবতের অনুবাদ করেননি। ভাগবতের অনুসরণে তিনি একটি মৌলিক কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন মাতৃভাষা বা প্রথানুগ শিক্ষার সাহায্যে প্রাপ্ত নয় এমন একটি ভাষা। আমাদের বিশ্বাস সমস্ত রকমের বাধা সত্ত্বেও রঘুনাথ দাস তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আরব্ধ কাব্য সৃষ্টিতে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন।"*[২৮]

রঘুনাথ দাসের **'ভুবনমঙ্গল'** কাব্যে সমকালিন সমাজ জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। এই কাব্যের অষ্টাদশ লীলা অধ্যায়ের শুরুতে **'নতব্রত পূজা'**র উল্লেখ আছে। মূল ভাগবতে এই কাহিনীতে কাত্যায়নী পূজার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু রঘুনাথ **'নতব্রত পূজা'**র বিষয়টিকে সংযোজন করেছেন। এই পরিবর্তনে ভাগবতের কাহিনীর সাথে **'ভুবনমঙ্গল'** এর কাহিনীর কোন অসংগতি ঘটেনি কারণ উভয় কাহিনীর শেষে বস্ত্রহরণের ঘটনা ঘটেছে। কবি তাঁর এই কাব্যে কিছু খাদ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ

করেছেন যা বাঙালির প্রিয় খাদ্য আবার মাঝে মাঝে ওড়িশার কিছু খাদ্য দ্রব্যাদির নাম উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কাব্যের রসগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মালাধর বসুর **'গৌরাঙ্গ বিজয়'** কাবের বর্ণনায় যেমন খাঁটি বাঙালিয়ানা ফুটে উঠেছে রঘুনাথ দাসও খাদ্যরসিক বাঙালির স্বভাবকে সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

রঘুনাথ দাস তাঁর কাব্যে ভাগবতের অনুসরণ করেছেন অতি সচেতনভাবে। ঐশ্বর্য ভাবের বিষয়কে কোথাও বর্জন বা গৌণভাবে উপস্থাপন করে মাধুর্য রসের বিষয়কে নিজের মনের মাধুর্যে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীর সংযোজন ঘটালেও তা কাহিনীর সাথে সঙ্গতিসাধন করেছেন। এই সংযোজনের ফলে কাব্যকাহিনী অহেতুক ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি।

ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত আছে ও. এল ৫৪৮ ক্রমসংখ্যক একখানি পুথি। এই পুথির ভাষা বাংলা ও লিপি ওড়িয়া। এই কাব্যটির রচয়িতা কবি সনাতন। পুথিটি জীর্ণ ও কীটদষ্ট। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা এই পুথিটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত পুথির পাণ্ডুলিপি নিয়ে সুহৃদকুমার ভৌমিক মেছেদার মারাংবুরু প্রেস থেকে ১৯৮৭ সালে মুদ্রিত আকারে **'সনাতন রচিত প্রকাশ চৈতন্য রত্ন'** শীর্ষক গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করেন। এই পুথিটির মধ্যে কবি পরিচিতি বা লিপিকরের পরিচয় ও সন-তারিখ কিছুই উল্লিখিত হয়নি। এই পুথির শিরোনাম বলতে কিছুই উল্লিখিত হয়নি। শুধুমাত্র এই পুথির অন্তঃশ্লোকে কবি নিজের নাম উল্লেখ করে বলেছেন এইরূপ—

> ***"চৈতন্য চরণ সভা লইয়া শরণ।***
> ***প্রকাশ চৈতন্য রতন কহে সনাতন।।***
> ***-ইতি শ্রীপ্রকাশ চৈতন্য রত্ন সমাপ্ত।"***

সংক্ষিপ্ত আকার বিশিষ্ট ও একটি মাত্র অধ্যায় বিশিষ্ট হওয়ার কারণে হয়তো কবি তাঁর পরিচিতি সবিস্তারে উল্লেখ করে যেতে পারেননি।

পুথিশালায় এই পুথির নাম **'চৈতন্য প্রকাশ'** বলে নথিবদ্ধ আছে। বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত গ্রন্থটির কাব্যনাম **'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন'।** সম্পাদক পুথিতে উল্লিখিত শেষোক্ত শ্লোকটির উপর নির্ভর করে কাব্য শিরোনাম **'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন'** রেখেছেন—এই কথা তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকাংশে

উল্লেখ করেছেন।

কবি সনাতন ওড়িশার একজন বৈষ্ণব কবি। এই কবির পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদক বলেছেন—

> *"ওড়িয়া বা অন্য কোন ভাষায় রচিত এঁর দ্বিতীয় কোন রচনা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। এমনকি এই পুথির দ্বিতীয় অনুলিপিও সংগৃহীত হয়নি। কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না যে সনাতন দ্বিতীয় কোন কাব্য রচনা করেন নি। গত দুয়েক দশকের মধ্যে এমন কিছু কবির রচনা আমাদের হস্তগত হয়েছে যাঁদের জীবৎকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক অথচ এঁদের রচনা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ইতিপূর্বে ছিলনা।..... যাইহোক, কবি সনাতন সুপণ্ডিত ও শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর সমস্ত উৎসাহ এবং শক্তি একখানি স্বল্পায়তন কাব্য রচনায় অবসিত হয়েছে এ অনুমান দুঃসাধ্য।"*[২৯]

কাব্যটির রচনাকাল সম্পর্কে পুথিটিতে কোন কালজ্ঞাপক শ্লোক বা সন তারিখের উল্লেখ নেই। বিষ্ণুপদ পাণ্ডা এই কাব্যের ভাষারূপ লক্ষ্য করে সপ্তদশ শতকের শেষাংশ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমাংশকে **'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন'** কাব্যের রচনাকাল বলে অনুমান নির্ভর মত দিয়েছেন। সুকুমার সেন এই কাব্যের রচনাকাল, কবির ধর্ম ও বাসস্থান প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *"ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা উড়িষ্যায়প্রাপ্ত পুথির উপর দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি 'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন' নামে একটি পুথি উড়িয়া লিপি থেকে বাংলা লিপিতে রূপান্তর করেছেন এবং সম্পাদন করে তা বাঙালিদের উপহার দিচ্ছেন। এই জাতীয় রচনা বাঙলায়ও পাওয়া গেছে। এই পুথির রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নয়।...... মনে হয় লেখক শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এ অনুমান করি তাঁর ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের বিরোধ ভাবনা থেকে। ইনি সম্ভবত ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের অথবা সীমান্তবঙ্গের লোক ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে বইটিকে উপেক্ষা করা যাবে না।"*[৩০]

সুকুমার সেনের এইরূপ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য এই কারণে যে, ওড়িশা সীমান্তবর্তী বঙ্গ বা

বঙ্গসীমান্তবর্তী ওড়িশায় শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের বিরোধ ছিলনা।[৩১] সুতরাং এই অষ্টাদশ শতকের পরবর্তীকালের রচনা এবং কবি সনাতন সীমান্ত বঙ্গের লোক হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন' কাব্যের কাহিনীতে আমরা দেখি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন নিত্যানন্দকে নিয়ে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হলে আচার্য তাদের যথোচিত সেবায় নিযুক্ত হন। অদ্বৈত আচার্যের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য আবেগ-আপ্লুত হন এবং সংজ্ঞা হারান। এমতাবস্থায় অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করেন। জ্ঞান ফিরে এলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভূকে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং সেই সঙ্গে ভক্তের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধও করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে ভক্ত, বৈষ্ণব ও গুরু এই তিন শ্রেণীর মানুষের গুণাবলী ও নানাবিধ প্রসঙ্গ। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের উপস্থিতি ও ভক্ত-ভগবান বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্র হওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেছেন এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। অদ্বৈত আচার্য সম্পর্কে নিত্যানন্দ বলেছেন.....

"..... শুন অদ্বৈত গোঁসাই।
তুমা সম ভাগ্যবান পৃথিবীতে নাই।।
যাহার শিষ্য হইলেন শচী ঠাকুরানী।
তাহার মহিমা কেবা কহিবে বাখানি।।
তুমার আশ্রয়ে প্রভু শান্তি পুরে আইল।
কতক পাতক সব কারণ লভিল।।" (পৃঃ ২৮)

কাহিনীর প্রায় সমাপ্তিতে লক্ষ্য করা যায় রূপ ও সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত হন। মহাপ্রভূ তাদের বক্তব্য শোনার পর আদেশ দেন যে, তারা যেন বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। কাব্যটির শেষাংশে কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে কবি সনাতন সকলকে শ্রীচৈতন্যচরণে ঠাঁই নেওয়ার উপদেশ প্রদান করে কাহিনী শেষ করেছেন।

কবি সনাতন ওড়িশার কবি কিংবা ওড়িশা প্রান্তবঙ্গের ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষ ছিলেন। **'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন'** পুথিটির ভাষা বাংলা কিন্তু কাব্যভাষায় বেশ কিছু ওড়িয়া শব্দ, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কন্টা (কাঁটা), হেঙ্গল (কুকুর), বানা (পতাকা), ভঁউরি (ঘূর্ণাবর্ত) প্রভৃতি বিশেষ্য পদ এবং আন্ট (শক্ত) প্রভৃতি বিশেষণ পদ, ফিটিবে (খুলে যাবে), মেন্টি (দূর করে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ, অপাদান কারকে **'উ'** বিভক্তির প্রয়োগ, যেমন— দুরু, উদরু, পাপু প্রভৃতির ব্যবহার ওড়িয়া ভাষা অনুসারী। **'মানে'** বিভক্তির প্রয়োগের দ্বারা বহুবচনের ব্যবহার ইত্যাদি ওড়িয়া ভাষার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। উল্লেখ্য এই যে, এই সকল শব্দ ও বিভক্তির প্রয়োগে বাংলা ভাষার বোধগম্যতা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

কবি সনাতন রচিত **'প্রকাশ চৈতন্যরত্ন'** কাব্যখানি চৈতন্য জীবনীকাব্য নয়, ভক্তিবাদ সমৃদ্ধ স্বল্পায়তন একখানি রচনা। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপদ পাণ্ডার অভিমত এইরূপ—

> ***"সনাতনের কাব্যখানি ভক্তিবাদ প্রতিপাদক, তাই কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ অবশ্যই সংরক্ষিত হয়নি। কবি সমগ্র গুরু তথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্যই এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যখানি রচনা করেছেন। আপন বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কবি সনাতন চৈতন্য-জীবন দর্শনে যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ কাব্যটির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে।"***[৩২]

অষ্টাদশ শতকের অপর একজন কবি পিণ্ডিক শ্রীচন্দন (১৬৮৮ - ১৭১৫) ওড়িয়া হরফে বাংলা কাব্যচর্চার নিদর্শন রেখে গেছেন। কবি ছিলেন মূলতঃ ওড়িয়াভাষী মানুষ। আশ্চর্য এই যে, এ পর্যন্ত তাঁর ওড়িয়া ভাষার পুথি বা কাব্যচর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ওড়িয়া হরফে বাংলা কাব্য **'বসন্তরাস'** ব্যতীত অন্য কোন ওড়িয়া কাব্যের পুথি পাওয়া যায়নি। কবি পিণ্ডিক শ্রীচন্দন ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুরী জেলার বেগুনিয়া থানায় অবস্থিত সানাপদর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৩] জয়দেবের **'গীতগোবিন্দম্'** কাব্যের অনুবাদ ও অনুসরণ ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে শুরু হয়ে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। সেই ধারার অন্যতম কবিগণ হলেন— ধরণীধর দাস, বৃন্দাবন দাস, দীনকৃষ্ণ দাস, ভজহরি দাস, উর্দ্ধব দাস, অনন্ত রথ বাণীভূষণ, জগন্নাথ মিশ্র, বাসুবেদ মিশ্র, পিণ্ডিক শ্রীচন্দন, শ্যামসুন্দর ভঞ্জ প্রমুখ। পিণ্ডিক শ্রীচন্দনের **'বসন্তরাস'** কাব্য গীতগোবিন্দের অনুসরণে রচিত কিন্তু অনুবাদ নয়।

'বসন্তরাস' কাব্যটির পুথি ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় বি-১৫ ক্রম সংখ্যায় সজ্জিত ও সংরক্ষিত আছে। '**কবি শ্রীচন্দন জয়দেব গোস্বামীর কাব্যখানি সামনে রেখে কবি জনোচিত স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন**।'[৩৪] কবির কাব্যাংশের একটি উৎকৃষ্ট রূপ—

"মন্দ মন্দ হাস গন্ধ উজ্জ্বল কর্পূর।
রতিকৃত লোভ নব পল্লব অধর।।
সুকেশে কুসুম গভা[১] সুন্দর সিন্দুরে।
উছলিল চন্দ্রকর নীল জলধরে।
কপালে চন্দন বিন্দু অতি অনুপমা।
কাল মেঘে উদে[২] যেন নির্মল চন্দ্রমা।।
বিপুল পুলক ভুজ নীপফুল তুল।
কিবা রতি কেলি কলা অঙ্গর মঙ্গল[৩]।।
মণিগণ কঙ্কণে সমূহ উজ্জ্বল।
ভূষণ সুভঙ্গ অঙ্গ আলোক নির্মল।।"

'**বসন্তরাস**' কাব্যের পঞ্চম ছাঁদে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরী রাধার মিলনদৃশ্য প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেছেন কবি—

"অখিল ভূষণজন জনিত আনন্দ।
ইন্দিবরদলজিনি রূপ শ্রীগোবিন্দ।।
নিজ অঙ্গে অনঙ্গের উচ্ছব[৪] বাড়ই।
সৎসঙ্গে ব্রজসুন্দরী নির্ভয়ে রমই।।
সেই অবিবাহী যুবা ধন্যা কন্যাগন।
নির্ভয়ে প্রত্যঙ্গে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ।।
শ্রদ্ধার রসিক সখী মূর্তিমগু হৈছে।
মুগ্ধা মন হরি হরি ক্রিড়া আরম্ভিছে।।
এহি কহি বিনোদিনী বিপিনে বিহরে।
বাতুল[৫] অন্তরে লোকে কভু কভু হেরে।।

পঞ্চম ছন্দের ব্যাখ্যা হৈল সমাগত।

শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে কোটিপ্রমাণিত (প্রণামিত)।।"

(১. কেশসজ্জার পুষ্পগুচ্ছ, ২. উদিত হয়, ৩. পবিত্র অঙ্গচ্ছটা, ৪. অনঙ্গ বা কামদেবের উদ্দীপনা, ৫. সন্দিগ্ধ মনে।)

বাংলা হোক কিংবা ওড়িয়া উভয় ভাষায় 'বসন্তরাস' কাব্যের উপস্থাপন মাধ্যম ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটগীতি বা নাটকের আঙ্গিকে গান। এ প্রসঙ্গে বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী বলেছেন —

> **"বসন্তরাস অভিনয়ের মধ্য দিয়েই সর্বাধিক প্রচারিত। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে এই কাব্যটি সাড়ম্বরে অভিনীত হত। এখনও তাই হয়। বসন্ত রাসের এই চৈত্র পূর্ণিমার রাতে অভিনীত হওয়ার সঙ্গে বসন্ত উৎসবের যেন যোগ আছে।"[৩৫]**

এছাড়াও **'বসন্তরাস'** অভিনীত হত ওড়িশি নৃত্যগীতির দ্বারা। এই ওড়িশি নৃত্যের আদলে কাব্যটি নাটকের মাধ্যমে পরিবেশিত হত। **"বসন্তরাসের অভিনয়ের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত শ্রদ্ধেয় কালীচরণ পট্টনায়ক লিখেছেন, "All the departments of the staging of BasantaRasa, ie. music, dance, play acting is according to the odisi style."[৩৬]**

ওড়িশার জনজীবনে এই কাব্যের নানাবিধ প্রায়োগিক মাধ্যমে লক্ষ্য করলে সহজে অনুমেয় হয় যে— **'বসন্তরাস'** কাব্যের জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ওড়িয়া ও বাঙালি মানুষের কাছে এই কাব্যের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট ছিল। ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে পিণ্ডিক শ্রীচন্দনের **'বসন্তরাস'** কাব্যের পুথি পাওয়া গেছে। ওড়িয়া সাহিত্যের এক গবেষকের মতে—

> **"Sri Chandan – native of village Sanapadar under Begunia P.S. of Puri District (1688-1715) wrote his Vasanta Rasa in imitation of Geeta Govinda far wide circulation among the Bengali followers of Sri Chaitanya. It was written in Bengali with soe sweet Oria songs incorporated of different places of the text.**

It gainted great popularity due to its simple and charming language for which a large number of manuscripts of this work are availability. It has been printed by several publishers." [2]

ওড়িশার বহু রাজবংশ সাহিত্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। এগুলির মধ্যে ওড়িশার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জের ঘুমসর রাজবংশ বিশেষভাবেই স্মরণীয় — যেখানে উপেন্দ্রের পিতা ও পিতামহ কবি হিসেব প্রভূত খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। ভুবনেশ্বর আর কটকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি রাজবংশ ছিল। এই অঞ্চলটির নাম পটিয়া। এই পটিয়া রাজবংশের অন্যতম রাজা দিব্যাসিংহদেব অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ওড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ওড়িয়া কাব্য রচনার পাশাপাশি তিনি একটি বাংলা কাব্যও রচনা করেন। রাজা দিব্যসিংহদেবের রচিত পুথিটির নাম **'পঞ্চামৃত সিন্ধু'**। কারণ রচনাগুলির মধ্যে তাঁর এই একটি মাত্র রচনা যা ওড়িয়া লিপিতে বাংলা ভাষায় রচিত।

'পঞ্চামৃত সিন্ধু' পুথিটি ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় ও. এল-১৫৩ ক্রমসংখ্যায় সজ্জিত ও সংরক্ষিত আছে। ভুবনেশ্বরে ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোড়ার দিকে সেগুলি ভাষাভিত্তিক বর্গীকরণ না করে সবগুলোই O. L অর্থাৎ ওড়িয়া লিটারেচার — এইরূপ বর্গীকরণে সাজিয়ে রাখা হয়।

কাব্যটির রচনাকাল সম্পর্কে পুথিটিতে কোন স্পষ্ট সময়কালের উল্লেখ নেই। দিব্যসিংহ দেবের সময়কাল নিয়ে অনেকটা সংশয় আছে। উৎকলীয় সাহিত্যিকদের মতে আনুমানিক ১৭৩৬ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবির জীবৎকাল ছিল।

'পঞ্চামৃত সিন্ধু' কাব্যটি তেরোটি বিন্দু বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই পুথিটি খণ্ডিত হওয়ার কারণে বারোটি বিন্দু বা অধ্যায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাব্যখানিতে দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়। কবি প্রতিটি বিন্দুর শেষে বর্ণিত বিষয়বস্তুর যে অতিসংক্ষিপ্ত নামোল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ—

১ম বিন্দু : ভাগবত তত্ত্ব ও নিত্য আচরণ বিধি।

২য় বিন্দু : ভক্ততত্ত্ব ও বৈষ্ণবাচরণ তথ্য।

৩য় বিন্দু : রসতত্ত্ব ও রাগকথা।

৪র্থ বিন্দু : রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব।

৫ম বিন্দু : জটিলাভবনে চন্দ্রসেনার দণ্ডবিধান।

৬ষ্ঠ বিন্দু : শ্রীরাধিকার কর্ণাভরণ হরণ।

৭ম বিন্দু : কর্ণাভরণের কর্ত্রী নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দোললীলা।

৮ম বিন্দু : রজকী ও নাপিতানী সংযোগ।

৯ম বিন্দু : মালিনী সংযোগ এবং শ্রীকৃষ্ণের নারীবেশ ধারণ।

১০ম বিন্দু : সরোবর শুষ্ককরণ।

১১শ বিন্দু : শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দাবতীর মিলনে তুলসীর আগমন।

১২শ বিন্দু : শ্রীরাধার বেশবর্ণনা।

কাব্যখানির মূল ভাষাকাঠামো বাংলায় কিন্তু এতে প্রচুর ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ আছে। এই মিশ্রভাষা লক্ষ্য করে বলা যায় যে, কবি তাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়ার মাধ্যমে কাব্য রচনা করতে পারতেন, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগবশত ওড়িয়া শব্দমিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রচেষ্টা করেছেন। যতদূর সম্ভব ওড়িশার মনোজগতে শ্রীচৈতন্যের ধর্মাদর্শের বিপুল প্রভাব এই সকল ওড়িয়াভাষী কবিদের বাংলা কাব্যচর্চায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। মানুষকে ভালোবাসার সাথে সাথে তাঁর ভাষাকে আত্মীকরণ করার প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই থেকে ওড়িশায় বাংলা কাব্যচর্চার পথচলা শুরু হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে কবি দিব্যসিংহদেব সেই ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন।

ঘ. ঊনবিংশ শতকের কবি ও কাব্য

ঊনবিংশ শতকে ওড়িশায় বাংলা কাব্যচর্চার স্রোত ক্ষীণ ধারায় চলতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ ও আপন ভাষার প্রতি মমত্ববোধের কারণে এই ধারা সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতকের অন্যতম কবিরা হলে কবিচন্দ্র জগন্নাথ, জগন্নাথ মহামিশ্র, দ্বিজ রামজীবন, দ্বিজ গৌরচরণ, নটবর দাস, নারায়ণ মর্দ্দরাজ প্রমুখ।[৩৭]

কবিচন্দ্র জগন্নাথের '**একাদশী মাহাত্ম্য**' (বি-৫৬) একটি ক্ষুদ্রতর আয়তনের পুথি। এই কাব্যটি ব্রতকথাধর্মী। ব্রতের প্রচার বা ধর্মীয় প্রচার যদিবা এই কাব্যের উদ্দেশ্য তথাপি এই রচনার সাহিত্যগুণ অস্বীকার করা যায়না। কাব্যটির অংশবিশেষ এইরূপ—

"কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিল যে যুধীষ্ঠির মহাঋষি।
অবনী আনিল কেবা ব্রত একাদশী।।
করিলে যে পুণ্য হয় কিবা তার ফল।
না করিলে কিবা পাপ কহনা সকল।।
কি লাগিয়া উপবাস করয়ে সংসার।
কিবা পুণ্য কিবা পাপ কি বিধি তাহার।।
সত্য করি কহ মোরে এ সকল ভাষ।
সন্দেহ ঘুঁচায়্যা করি ব্রত উপবাস।।
হাসিতে লাগিল কৃষ্ণ শুনি হেন বাণী।
একাদশী ব্রত কথা কহেন আপনি।।"

ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় জগন্নাথ মহামিশ্রের ভণিতায় '**নারদগীতা**' (বি. ১৪৭) শীর্ষক একখানি পুথি সংরক্ষিত আছে। কবি ছিলেন মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ এবং উনিশ শতকের মানুষ। এই কবি গীতগোবিন্দের ওড়িয়া অনুবাদও করেছেন। জগন্নাথ মিশ্রের '**নারদগীতা**' পুথিটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে কবি আপন রচনার শীর্ষকগুলি উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায়ের শীর্ষনামগুলি দণ্ডিকা পুরাণ, নারদ গীতা, যম পুরাণ ইত্যাদি। নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুটি চরিত্রের প্রশ্নোত্তর ছলে রচিত জগৎ সংসারের পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আছে পরলোকের শাস্তি বিধান ও পুণ্যফল প্রাপ্তির কথা। নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরের একটি নমুনা এইরূপ—

নারদ প্রশ্ন করেন—

"কি কি পাপে কি কি দণ্ড দিএ যমরাএ।
এহার বৃতান্ত মোরে কহ দেবরাএ।।"

এর উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ যমপুরীর বিবরণ দিলে এইরূপ—

"যমদণ্ড লয়া যম বসিয়াছে পাটে
চারিদিগে চারিদ্বার জবদ কবাটে।।"

পুথিটিতে বৈষ্ণবধর্মের গুণগান করা হয়েছে কৃষ্ণের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। পুথিটির আটটি পাতা বৈষ্ণব বন্দনায় পরিপূর্ণ। কবি যে স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মের মানুষ ছিলেন তাঁর রচনাটির মাধ্যমে তা ফুটে উঠেছে।

উনিশ শতকের কবি দ্বিজ রামজীবনের কাব্য '**রামায়ণ শক্তিশেল**' (বি. ২০৬) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। কবি রামায়ণে বর্ণিত লক্ষণের শক্তিশেলের ঘটনাকে কাব্যের কাহিনীবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সমগ্র কাব্যে কৃত্তিবাসের '**শ্রীরাম পাঁচালী**'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে কবির স্বকীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় এই কাব্যে অনুপস্থিত নয়। কবির কাব্যের একটি অংশ নিম্নরূপ—

"বান ভস্ম গেল উঠি বসিল লক্ষণ।
কোলে ধরি কান্দে রাম হয়্যা অচেতন।।
এতক্ষণে আমাকে ছাড়িয়া ছিলে কাই।
তুমার বালাই লয়্যা আমি মরি যাই।।
একুআরে প্রেমসুখে করেন রোদন।
পরম আনন্দমতি ভাই দুইজন।।
সেবন করিয়া ব্যাস বাল্মীকির পাএ।
শ্রীরামের বরে দীন রামজীবন গাএ ।।"

এই সকল সাহিত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অধিকাংশ পুথি কীটদষ্ট। পুথির ভূমিকা পত্র বা সমাপ্তি পত্র কালের কবলে জলবায়ুর গ্রাসে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। এছাড়া ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত কবিদের পুথি ছাড়া অন্যান্য পুথিগুলির কোন দ্বিতীয় অনুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে

মূল পাঠ নির্বাচন করার কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি। অপর ক্ষেত্রে এটাও সত্য ও স্বীকৃত যে বাংলা ভাষার পুথি হওয়ার কারণে ওড়িয়া লিপিকরদের অনুলিপি করার কোন তাগিদ বা প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। সুতরাং এই পুথিগুলির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে ওড়িশার কাব্য-রসিকদের কাছে এটি দ্বিতীয় ভাষার সাহিত্য, সেইহেতু এইসব পুথির অনুলিপি বা পাঠান্তরের কোন প্রয়াস ছিলনা বললেই চলে। আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে, পুথিগুলি কোন ব্যক্তিগত সংগ্রহে না থেকে সরকারিভাবে ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংগৃহিত ও সংরক্ষিত আছে। সেখানে পাঠক-গবেষকের দ্বার অবারিত। আগামী দিনের শক্তিমান গবেষক প্রযুক্তিনির্ভর পুথিচর্চার মাধ্যমে এই পুথিগুলির সাহিত্যমূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী হলে আমাদের এই গবেষণা আরো ঋদ্ধ ও সিদ্ধ হবে। এখনও অনেক পুথি সম্পাদনার স্পর্শ পেতে চায়, একবিংশ শতকের সারস্বত প্রতিভার নিকট মূল্যায়িত হতে চায়। ভবিষ্যতে তা যদি সম্ভব হয় বহির্বঙ্গের বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য : বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায় (সম্পা.), মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ৯৯।

২. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১০১।

৩. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ১৩৯।

৪. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৮।

৫. দ্রষ্টব্য : সুকুমার সেন, বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), অপরার্ধ, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা- ৬০-৬১।

৬. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৬২-৬৩।

৭. ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালা, পুথি বিভাগ, পুথি সংখ্যা - বি.১০।

৮. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ২৮।

৯. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৮।

১০. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৯।

১১. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২৯।

১২. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা (সম্পা.), কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জের দ্বারিকা পালা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, মারাংবুরু প্রেস, মেছেদা, পৃষ্ঠা- ২।

১৩. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ১৭।

১৪. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৪০।

১৫. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪১।

১৬. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪১।

১৭. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪১।

১৮. দ্রষ্টব্য : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, নতুন সংস্করণ, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১০৮।

১৯. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৪৪।

২০. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.), প্রত্যয় প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৩৬৫।

২১. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৪৬।

২২. দ্রষ্টব্য : শ্যামল বেরা ও কিশোর নাগ (সম্পা.), পত্রিকা - রাঢ়কথা, 'সত্যপির ও সত্যনারায়ণ' সংখ্যা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৭

২৩. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৪৪।

২৪. দ্রষ্টব্য :পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪৪।

২৫. দ্রষ্টব্য :পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৪৪।

২৬. দ্রষ্টব্য : পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পা.), পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড, ১৩৫৮, পৃষ্ঠা- ৩৭৮ - ৩৮২।

২৭. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, রঘুনাথ দাস কৃত ভুবনমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ৫৯।

২৮. দ্রষ্টব্য :পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ৬০।

২৯. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, সনাতন কৃত প্রকাশ চৈতন্যরত্ন, মারাংবুরু প্রেস, মেছেদা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭, ভূমিকাংশ, পৃষ্ঠা- খ।

৩০. দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'প্রাক্‌কথন' অংশ।

৩১. দ্রষ্টব্য : বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায় (সম্পা.), মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, ২য় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ৩৭২।

৩২. দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ভূমিকাংশ, পৃষ্ঠা- ৬।

৩৩.	দ্রষ্টব্য : বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রত্যয়-প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৪৪৮।

৩৪.	দ্রষ্টব্য : বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ৭৯।

৩৫.	দ্রষ্টব্য : বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী (সম্পা.), কবি পিণ্ডিক শ্রীচন্দনকৃত বসন্তরাস, কালিমাটি (অনলাইন সংস্করণ), কটক, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৬।

৩৬.	দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬

৩৭.	দ্রষ্টব্য : বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩২১।

1.	Kunjabihari Das, A study of Orissan Folklore, Visvabharati, 1953, Page : 143.

2.	K. C. Pattanayak, Impact of Sri Geeta Govinda on Oria literature, Orissa Review, May' 2007, Page- 48

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওড়িয়া হরফে রবীন্দ্রসাহিত্য : বিবরণ উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

ক. ওড়িশায় রবীন্দ্রনাথ

খ. ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব

গ. রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ

ঘ. ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল্যায়ন

ঙ. ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলির কালানুক্রমিক তালিকা

চ. ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থাবলির কালানুক্রমিক তালিকা

ছ. ওড়িয়া 'সবুজ যুগ' -এর সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওড়িয়া হরফে রবীন্দ্রসাহিত্য ঃ বিবরণ উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ওড়িয়া সাহিত্য সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রচর্চার গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীভাবে ওড়িশার সাংস্কৃতিক মনোজগতে আলোড়ন ফেলেছিল এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিফলন কতখানি ওড়িয়া সাহিত্যের উপর পড়েছে সে বিষয়ে একটি কালানুক্রমিক ধারণা এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে। এই আলোচনার বিষয়বস্তু মূলত কয়েকটি ক্রমবিন্যাসে উপস্থাপিত হবে, যেমন ঠাকুরবাড়ির জমিদারি দেখভাল সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাথে ওড়িশার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা। তুলে ধরা হবে ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্তকে। এছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে। ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল্যায়নধর্মী কয়েকটি গ্রন্থের বিশ্লেষণ থাকবে। এরপরে কালানুক্রমিক ভাবে ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রগ্রন্থের তালিকা এবং রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল্যায়নধর্মী বেশ কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা তুলে ধরা হবে। এই অধ্যায়ের শেষাংশে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত **‘সবুজ যুগ’** -এর কবিদের কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর সারা বিশ্ব জুড়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবানুবাদ ও ভাষানুবাদ চলতে থাকে। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের প্রচেষ্টা করা হয়। ঠিক এই সময় ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশেষ করে গীতাঞ্জলির অনুবাদ হতে শুরু করে। শুধুমাত্র গীতাঞ্জলি নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাস, নাটক ও কাব্যের ওড়িয়া অনুবাদ প্রকাশ হতে শুরু করে। অনুরূপভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে ওড়িয়া ভাষায় বেশ কয়েকটি সাহিত্যের অনুবাদ ও সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ওড়িশার সাথে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যোগাযোগ অনেক দিনের। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ নীলমনি ঠাকুর থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ওড়িশার জমিদারী সূত্রে যাতায়াত ছিল। বাংলাদেশের যশোহর জেলা থেকে রামজয় ঠাকুরের পুত্র নীলমনি ঠাকুর কটকে এসেছিলেন ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এক জমিদারের সেরেস্তাদারির কাজে। সেখান থেকে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বসবাসের জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িটি নির্মাণ করেন। তিনি ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে মারা যাওয়ার পর তাঁর পৌত্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ওড়িশার কটক জেলার পাণ্ডুয়ায়

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে জমিদারি ক্রয় করেন। কটকের তুলসীপুরে দ্বারকানাথ ঠাকুর বসবাসের জন্য একটি বাংলোও নির্মাণ করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের হাতে পাণ্ডুয়ার জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নেন ও পাণ্ডুয়ার জমিদারি পরিদর্শনে যান। সেই সময় তিনি কটক ও পুরীতে থেকেছিলেন। ওড়িশার শিক্ষা ক্ষেত্রে ও ওড়িশায় ব্রাহ্ম সমাজ গঠনে দেবেন্দ্রনাথের অনেক অবদান আছে। সেই সময় তিনি কটকের রেবেনশ ডিগ্রি কলেজকে দুই হাজার পাঁচশ টাকা দান করেন এবং ওড়িশার কটক শহরের ওড়িয়া বাজারে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন।[1]

জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য ঠাকুরবাড়ির সদস্যগণ নিয়মিত ওড়িশা পরিদর্শনে যান। কটকে থাকাকালীন জ্যোতিরীন্দ্রনাথ তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ পুরীতে থাকাকালীন কয়েকটি চিত্র অঙ্কন করেন। ওড়িশার কোনারকের সূর্য মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরের শৈল্পিক ও দার্শনিক তাৎপর্য নির্ভর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পাথারপুরী নামে পুরীর সমুদ্র সৈকতে ঠাকুরবাড়ির সৈকতাবাসটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে সজ্জিত ছিল। এই সকল পরিবেশ ঠাকুর পরিবারের শিল্পিদের নন্দনচর্চায় অনুপ্রাণিত করতো। সেই সময়ের ওড়িশার বিখ্যাত ভাস্কর চিন্তামনি মহাপাত্র, গিরিধারী মহাপাত্র এবং শ্রীধর মহাপাত্র প্রমুখ শিল্পীগণ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস -এর প্রতিষ্ঠাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে এসে কলাবিদ্যা লাভ করেন। অবনীন্দ্রনাথ এই ভাস্করদের সোসাইটিতে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং তাঁদের নির্মিত শিল্প সকল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শিল্পগুলি সোসাইটির আর্ট গ্যালারির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত করে রাখা হয়।[2]

ক) ওড়িশায় রবীন্দ্রনাথ ঃ

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার কয়েক মাসের পর ওড়িশার পাণ্ডুয়ার এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় ছয় বছর দায়িত্বভার পালনের সময় ওড়িশার গ্রাম ও শহর উভয় জনজীবনের সাথে কবির নিবিড় যোগসূত্র তৈরি হওয়ায় সেখান থেকে কবি সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অনেকটা রসদ পেয়েছিলেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জমিদারি দেখাশোনার কাজে কটকে যান তখন রবীন্দ্রনাথ বাবার সাথে ওড়িশায় যান। তাঁরা দ্বারকানাথ ঠাকুর নির্মিত কটকের তুলসীপুরের বাড়িতে বসবাস করেন। ঐ বাড়িতে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি আসর বসে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১৪ বছর। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা **'প্রকৃতির খেদ'**

কবিতাটি সুধী সমক্ষে পাঠ করেন। এই খবরটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে মে ওড়িয়া সাপ্তাহিক '**উৎকল দীপিকা**'য় উল্লিখিত হয়। এই সাপ্তাহিকটি কটক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরের শিরোনামটি ছিল 'বিদ্বতজন সমাগম'। পরে এই খবরটি বাংলা '**তত্ত্ববোধিনী**' পত্রিকা'য় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে প্রকাশিত হয়।[3]

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ৩০ বছর বয়স তখন দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে পাণ্ডুয়ার জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন। কলকাতা থেকে পাণ্ডুয়ায় কবি গেছিলেন নৌকা, স্টীমার ও পাল্কি করে। সেই যাত্রাপথের তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার কথা ভাইঝি ইন্দিরাদেবীকে পত্রের মাধ্যমে লেখেন। পাণ্ডুয়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার কাহিনী পরিকল্পনায় '**চিত্রাঙ্গদা**' গীতিনাট্যটি রচনা করেন।[4]

এরপর রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডুয়া যান। এস্টেট পরিদর্শনের পর দু'জন মিলে কটক, পুরী ও ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁরা দু'মাসের মত ওড়িশায় কাটান। কবি সেই সময় কটক থেকে ১০.০২.১৮৯৩, ১৭.০২.১৮৯৩, ২৫.০২.১৮৯৩, ২৭.০২.১৮৯৩ বালিয়া থেকে ২৮.০২.১৮৯৩, ০১.০৩.১৮৯৩ পুরী থেকে ১৪.০২.১৮৯৩ এবং তিরান থেকে ০৪.০৩.১৮৯৩ তারিখগুলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ, ধর্মচর্চা, যাতায়াত ব্যবস্থা, ইংরেজের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার, ওড়িশার মানুষজনের সারল্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জোড়াসাঁকোয় পত্র প্রেরণ করেন। কবি রাস্তার দুপাশে তাল-নারিকেল-আম-কলার বাগান ইত্যাদি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আবেগাপ্লুত ও বিমোহিত হয়ে পড়েন। পাখির ডাক, কাঠবেড়ালির নাচ, সমুদ্রের গর্জন, দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ, উন্মুক্ত আকাশ, চন্দ্রালোকিত রাত্রি কবির মনকে মুগ্ধ করেছিল। এই সকল অনুভূতির কথা তাঁর পত্রগুলিতে লিখে গেছেন। পাণ্ডুয়া থেকে কটক যাওয়ার পথে ঠাণ্ডা ও সামুদ্রিক আবহাওয়ায় কবি দু'দিন সময় কাটান। সেই সময় তিনটি কবিতা রচনা করলেন '**অনাদৃত**', '**নদীপথে**' ও '**দেউল**'। ওড়িশায় থাকাকালীন তিনি অন্যান্য দুটি কবিতা যথা '**বিশ্বনৃত্য**', '**সমুদ্রের প্রতি**' রচনা করেন। শেষবারের মতো কবি ওড়িশায় আসেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি জমিদারি তদারকির কাজে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'মালিনী' শুরু করেন।[5]

দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে জমিদারি ভাগ করেন এবং ওড়িশায় অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব অর্পন হয় গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। ফলে পরবর্তী সময়কালে দেখছি জমিদারি

সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ওড়িশায় যাননি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস কলকাতায় এসে কবিকে ওড়িশায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ করে যান। কবি সানন্দ চিত্তে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলাপচারিতায় কবি বলেন—

> **"I belongs also to odisha. I entertain goodwill, love and effection for the people of odisha, so I am closely watching the political development of odisha."** [6]

পরবর্তীকালে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পুরীতে এসেছিলেন। কয়েকটি কবিতার অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টি হয় ওড়িশার মাটিতে—

> **"He came to odisha in the third week of April 1939 as state guest. He left Puri in the second week of May. During his stay he composed three poems : 'Prabasi' (the outsider), 'Janmadin' (birth day) and 'Epare Opare' (this side and that). He wrote about nineteen poems in odisha, a few of them important ones."** [7]

এ বিষয়ে অন্য এক গবেষক বলেছেন যে—

> *"মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে কবি পুরীতে এসে কিছুদিনের জন্য সমকালীন মন্ত্রীদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে গিয়ে তিনি এই ভাবে আতিথ্য গ্রহণ করেননি। তাঁর আতিথ্য গ্রহণের সময় কোন অভিমানী ওড়িয়া তাঁকে 'ঝুঁটিবাঁধা উড়ে' সম্পর্কে আক্ষেপের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন। এতে কবি কিছু পরিমাণ দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এভাবে বিচার করলে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের অবকাশটিই হয়ে পড়বে সংকুচিত।"*[১]

খ) ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব ঃ

ওড়িশার সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের এক চিরন্তনী আবেদন আছে। ওড়িশায় রবীন্দ্রসাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকেরা এখনও রসতৃষ্ণা নিবারণে নিমগ্ন। এখনও ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ, সাহিত্য পাঠ, সমালোচনা ইত্যাদি দ্রুততার সাথে চলছে। প্রায় শতাব্দী ব্যাপী ওড়িশার কবি সাহিত্যিক ও পাঠকের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ে আসছে একথা বলা

যেতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অন্যান্য প্রদেশের মানুষের মতো ওড়িশার পাঠককুলের ছিল এবং এখনও আছে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে জমিদারির কাজে ওড়িশায় গিয়েছিলেন কবি তখন কটকে ডিস্ট্রিক ও সেশন জর্জ বি.এল গুপ্তের আতিথ্য গ্রহণ করেন।[২] সেই সময় তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থাপিত ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিয়ে নিজের একটি কবিতা গান করেন। কবিতাটি '**কি গাব আমি কি শোনাব...**'। যথা সম্ভব আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি মধুসূদন রাওয়ের (১৮৫৩ - ১৯১২) সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয়।[৩] তার কারণ '**নব্যভারত**' পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কবি মধুসূদনের '**ঋষিচিত্র**' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পাঠ করে সেই বছর '**সাধনা**' পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় অভিমত দেন—

> ***" কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশিরস্নাত পবিত্র ঊষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। রচনায় প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন, তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত রসাস্বাদন পাওয়া যায় না, কিন্তু 'ঋষিচিত্র' কবিতাটির মধ্যে একটি প্রাচীন ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে।"[৪]***

মধুসূদন রাওয়ের সাথে কটকে কবির সাক্ষাৎ হওয়ার পর উভয় কবির মধ্যে বহুবার দেখা হয় এবং অনেকটা আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিভাবনার প্রভাব পড়েছে তাঁর '**কুসুমাঞ্জলি**' ১৯০৩ কাব্যের উপর।

> ***"উপনিষদের ভাবনায় আলোকিত দুই কবির রচনাগত সাদৃশ্যে দেখা যায়। মধুসূদনের 'কুসুমাঞ্জলি' (১৯০৩) ও রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) উভয় গ্রন্থে বিশ্ব নিয়ন্ত্রক অসীম শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ও অকপটে সর্বস্ব নিবেদনের সুর ধ্বনিত।"[৫]***

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে মধুসূদন শান্তিনিকেতনের অতিথি হন। পরে ওড়িশায় ফিরে কবি মধুসূদন নিজের ডায়েরিতে (০৯.০৩.১৯১১) লিখেছেন ঃ

"রবিবাবুর সঙ্গে বাঙলা ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা হল। দীনেন্দ্র বাবুর কণ্ঠে রবিবাবুর কয়েকটি ধর্মসঙ্গীত শুনলাম। রবিবাবু শুধু সাধারণ কবি বা লেখক ছিলেন না, তিনি বাস্তবে একজন ঋষি। তাঁর বিনয়, বিশ্বাস ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কার্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং সরল সুন্দর জীবন আমাকে যেভাবে প্রভাবিত করল সেইভাবে খুব কম জীবনই করেছে।"[৬]

ওড়িয়া কবি মধুসূদন রাও **'ভক্তকবি'** রূপে পরিচিত। **'মধুসূদন শান্তিনিকেতনে আসার পর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ওড়িশায় ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নেন।'**[৭] তিনি যে সব ভক্তিমূলক গীতিকবিতা রচনা করেন তার একটি বিশিষ্ট সংকলন হল **'কুসুমাঞ্জলি'** (১৯০৩) যা পূর্বে উল্লিখিত। এই গীতিকাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভক্তকবি মধুসূদন রাও -এর কাব্যে যে ভক্তিভাবনা লক্ষ্য করা যায় তা রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের ভক্তিভাবনার সমতুল। তবে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ে মধুসূদন রাও যেমন বিশেষ কিছু আলোচনা করেননি, তাঁর সমসাময়িক অন্য দুই প্রধান সাহিত্যস্রষ্টা রূপে ফকিরমোহন সেনাপতি বা রাধানাথ রায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় নীরব থেকেছেন।[৮] এই ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই সময়ে ওড়িয়া সাহিত্যিক সমাজে প্রতিবেশী সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্য সমালোচনার কোন মৌলিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে কিছুটা হলেও মধুসূদনের পর ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্র আত্মীকরণের ধারাটি অব্যাহত থেকেছে। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসকার তথা কবি মায়াধর মানসিংহ, শচী রাউতরায়, চন্দ্রশেখর দাস, চন্দ্রমোহন গড়নায়েক ও অন্যান্য কবিরা বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রনাথকে কবিতার মাধ্যমে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন। কখনও রবীন্দ্রছন্দ, কখনও রবীন্দ্র কাব্যদর্শকে তাঁরা মাধ্যম করে ওড়িয়া সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করেছেন। অপরদিকে ফকিরমোহন ও রাধানাথের ন্যায় কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত কবিরা বাংলাভাষায় দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র কাব্যদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়েছেন। বিশ শতকের প্রথম দশকে ওড়িয়া ভাষা রক্ষার জন্য বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল[৯] তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি। সুতরাং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের কারণে ফকিরমোহন বাংলাসাহিত্য তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পর থেকে ব্যাপক হারে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ হতে শুরু করে। প্রতিটি ভাষা তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে তাদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র **'সবুজ যুগের'** কবিরা রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শকে পথ ও পাথেও করলেও

অন্যান্যদের মধ্যে সেই উদ্দীপনা ছিল না। ১৯৪৯ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অনুবাদ লক্ষ্য করা যায়না। ১৯৫০ সাল থেকে অনেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও অন্যান্য সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদকদের মধ্যে অনেকেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। এর একটি কারণ ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ এবং বাংলা ভাষা ও লিপির পঠন-পাঠন দক্ষতা। দ্বিতীয় কারণটির সম্পর্কে সবুজগোষ্ঠীর লেখক হরিহর মহাপাত্র বলেছেন — **''রবীন্দ্রসাহিত্য ওড়িয়াকে অনুবাদিত হোই নাহিঁ কাহিঁকি। ভারতবর্ষরে অন্য সবু ভাষারে, ভারত বাহারের বহু ভাষারে তাহার প্রসার হোইথিবা স্থলে ওড়িআ ভাষান্তর কশ্চিৎ ঘটিছি।... আপাতশ্রাব্য বঙ্গীয় বিরোধ বহু কথার অবতারণা অপরিহার্য্য থিলা। কেতেগুটিএ বঙ্গীয়ঙ্ক পক্ষরে অপ্রীতিকর ঐতিহাসিক ঘটনা ও তৎসংলগ্ন সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাবরে বঙ্গভাষার বহুল প্রচলন ফলরে অধিকাংশ ওড়িয়া পাঠকঙ্ক নিকটরে রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী বঙ্গভাষারে স্বতঃআদৃত হোই আসিথিবারু অনুবাদর আবশ্যকতা উপলব্ধ হোই ন থিবা।''**[১০]

রবীন্দ্রনাথের মূলত জাতীয় চেতনার আদর্শ ও ভাবধারার সাথে ওড়িয়া সাহিত্য ধারায় **'সত্যবাদী'** গোষ্ঠীর লেখকদের মিল ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্যবাদী সাহিত্য গোষ্ঠীর উপর পড়েনি। এই গোষ্ঠীর প্রবর্তক গোপবন্ধু দাস (১৮৭৭ - ১৯২৮) শিক্ষা প্রসার ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন। ***''গোপবন্ধু ১৯১৮ সালে কবিগুরুর অতিথি হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'শান্তিনিকেতন ভারতের প্রাচীন ঋষি আশ্রমের আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।''***[১১]

ওড়িয়া সাহিত্য ধারায় **'সবুজ গোষ্ঠী'**র (১৯২০ - ১৯৩৫) লেখকবৃন্দ রবীন্দ্রদর্শন ও রবীন্দ্র ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার গণ্ডী ও কুসংস্কারমুক্ত এই কবিদের লেখনীতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দশৈলী অনুসরণে যে গীতিধর্মী কবিতা রচিত হয়েছিল, তাতে বিশ্বমানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। **'সবুজ গোষ্ঠী'**র যে সকল কবি রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, শরৎ মুখার্জী ও হরিহর মহাপাত্র। **'সবুজপত্র'** -এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর মত ব্রাহ্ম নেতা বিশ্বনাথ করের সম্পাদিত **'উৎকল সাহিত্য পত্রিকা'**কে মাধ্যম করে এই সকল ওড়িয়া কবিগণ সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর **'সবুজপত্র'** কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহৃত **'সবুজ'** শব্দটিকে আহরণ করে কবিতায় সম ব্যঞ্জনাধর্মী ভাবানুষঙ্গের

প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সুতরাং *"সবুজ নামটি প্রতিবেশী বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক আবহ থেকে গৃহীত। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকার সঙ্গে সবুজগোষ্ঠীর কবিদের ছিল আত্মিক পরিচয়।"*[১২] **'সবুজপত্র'** প্রকাশিত ১ম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের **'সবুজের অভিযান'** কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সবুজগোষ্ঠীর অন্যান্য সাহিত্যিকেরা এই কবিতাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন—

> *"উৎকল সাহিত্য ক্রমে আমাদের কয়েকজনের মুখপত্র হয়ে গেল। লোকে বলল, 'সবুজ দল' বলে এক লেখক গোষ্ঠী আছে। এ নামকরণ কার কৃতিত্ব, আমার মনে নেই। বাংলা 'সবুজপত্র' -এর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' আমাদের মূলমন্ত্র ছিল।"*[১৩]

ওড়িয়া কবি বৈকুণ্ঠনাথের 'সবুজ পরী' একটি ব্যঙ্গ কবিতা বিশেষ। তারা গঠন করেছিলেন **'সবুজ সাহিত্য সমিতি'**। *"কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কপ্রমুখ সবুজগোষ্ঠীর ওড়িয়া সাহিত্যিকবৃন্দ ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী এবং অনুপ্রাণিত। মানবপ্রত্যয় এবং সৌন্দর্য ভাবনার তাৎপর্য তারা রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করে উপলব্ধি করেন। কালিন্দীচরণ তাঁর দিনপঞ্জীতে রবীন্দ্রগ্রন্থ পাওয়ার ও পড়ার আগ্রহের কথা যেভাবে লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরপ্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল বৈকুণ্ঠনাথের কাব্যরচনায়। রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধ ও গীতিধর্মিতা বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের রচনায় কান পাতলে শোনা যায়।"*[১৪]

কবি অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথের **'সবুজের অভিযান'** কবিতাটির অবলম্বনে লিখলেন **'সবুজপরী'** কবিতাটি যা তার **'পরীমহল'** কাব্যে অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতায় কবি জীর্ণজরাকে বিদায় দিয়ে নব চেতনায়, যৌবনের অফুরন্ত গতিতে উজ্জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন—

"সবুজপরী, আস!
পত্র রহে কান ডেরি
উর্দ্ধে চাহে ঘাস।
শীত গলা বনে বনে   পল্লব ঝড়াই
উত্তরা পবণে তার   উত্তরী উড়াই।

দিগে দিগে সংরচিলা শুষ্কতার শ্বাস

সবুজপরী, আস!

যৌবনের মন্ত্রে সখি, জীর্ণজরা নাশ।"[১৫]

সবুজ যুগ ও রবীন্দ্রপ্রভাব প্রসঙ্গে ওড়িয়া কবি মায়াধর মানসিংহ বলেছেন—

> ***"একদল আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট বাংলা ট্রেড মার্কা মারা তরুণ সত্যবাদী দলের পরে আবির্ভূত হন। তখন রবীন্দ্রনাথের নাম ও যশ শীর্ষস্থানে পৌছেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মদ্যের উগ্রস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।"***[১৬]

সবুজ যুগের কবিদের উপর রবীন্দ্রপ্রভাবের কথা বলেও ওড়িয়া সাহিত্যের এই ইতিহাসকার নিজেই রবীন্দ্রদর্শনে নিমগ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শে বিমুগ্ধ থাকতেন মায়াধর। সবুজ যুগের অন্যতম কবি মায়াধর মানসিংহের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন —

> ***"পরবর্তীকালে মায়াধর মানসিংহ তাঁর ওড়িয়াতে লেখা 'রবীন্দ্রপূজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে উজাড় করে দিয়েছেন। মায়াধর রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের তত্ত্বভাবনার দ্বারা যে প্রভাবিত ছিলেন তা তাঁর 'হেমশস্য' (১৯৩৬), 'ক্রুশ' (১৯৫১) প্রভৃতি কাব্য সংকলনে কান পাতলে বোঝা যায়।"***[১৭]

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল সচ্চিদানন্দ রাউতরায়ের **'পাথেয়'** (১৯৩১) কাব্যসংকলনে। এই কাব্যের সনেটগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনার প্রভাব পড়েছে। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সচ্চিদানন্দ রাউতরায়ের বিশেষ পরিচিতি ছিল। এককালে কলকাতায় ছাত্রজীবন কেটেছে। পরবর্তীকালে কেশোরাম কটন মিলের পদাধিকারী রূপে কর্মজীবন নির্বাহ করেছেন। কটকে **'দিগন্ত'** পত্রিকার সম্পাদনা কালে নিজেকে **'জনতার কবি'**[১৮] রূপে পরিচিতি লাভ করেন। আবার এই কবি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে স্বকীয় কাব্যধারার পথে অগ্রসর হন। সবুজ যুগের পর সমাজবাদী ও বাস্তববোধের চিন্তাধারা ওড়িয়া কবিতায় সংক্রমিত হয়। ***"কবি সচ্চিদানন্দ রাউতরায়, অনন্ত পট্টনায়ক ও মনমোহন মিশ্র প্রমুখ প্রগতিশীল কবিরা সর্বহারার জয়গান করতে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধ তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে পারেনি,***

এইকারণে কবি রাউতরায় 'রাজজেমা' কবিতায় 'আমি টেগোর বা শেলী নই' বলে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন।" [১৯] সচ্চিদানন্দ রাউতরায় রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেরিয়ে এলেও সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে মুক্তছন্দে কবিতা লিখেছেন।

বিশেষ করে ১৮৯১ - ৯৩ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ওড়িশা ভ্রমণের সময় লব্ধ অনুভূতি কবি প্রায় ষোলটি চিঠিতে লিখে গেছেন। কবির ভাষায় ***"এই চিঠিগুলির মধ্যে আমার মনের সমস্ত ভাব যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি আমার আর কোন লেখায় হয়নি।"*** [২০] শেষবারের ওড়িশা যাত্রায় ১৯৩৯ সালে ২৮শে এপ্রিল পুরীর মুক্তিমণ্ডপ সভার পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিন কবি ওড়িশা সরকারের অতিথি হয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেন। পুরীর ঠাকুর রাজা শ্রীরামচন্দ্রদেব এবং বহু লেখক ও কবিকুল সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে সেদিন সেই সভায় কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিজেদের ধন্য বলে মনে করেছিলেন। রাজা যে মানপত্র প্রদান করেন তাতে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে উল্লেখ করা ছিল এইরূপ—

> *"ভারত কবি কুলতিলক বিশ্ববরেণ্য সুধীপ্রবর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঙ্কর অসাধারণ কবি প্রতিভা সসাগরা প্রাচ্য পাশ্চাত্য ধরাপৃষ্ঠুরে প্রাচীন আর্যাবিভব মণ্ডিত ভারতবর্ষকু দেশীয় সাহিত্যকলা উৎকর্ষসাধন দ্বারা গৌরবান্বিত করি থিবারু বিশ্বকবিঙ্কু আম্ভে আনন্দিত হোই আজি এহি সর্বধর্ম সমন্বিত নীলাচল ধামরে পরমগুরু উপাধিরে ভূষিত করি শাড়ী শিরোপা আজ্ঞা দেলু। ইং তাং ২৮/০৪/ ১৩৩৯"* [২১]

বিশ্বকবিকে দেওয়া উপরোক্ত মানপত্রটি বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় অর্থাৎ রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে।

> *"১৯৩৯ সালের ৯ই মে তারিখে ঝাউবন বেষ্টিত অতিথিশালায় গুরুদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। নবকৃষ্ণ চৌধুরীর পত্নী, কবি শিষ্যা মালতী চৌধুরী কবিগুরুকে দেখাশোনার জন্য কাছাকাছি ছিলেন। মালতী সেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন। মালতী সেনের সহপাঠী ছিলেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী। ১৯২৭ সালে উভয়ে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। উভয়ে কবিগুরুর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ চৌধুরী পরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হন। অতিথিশালায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ও*

শঙ্খধ্বনির সমারোহে লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্য অনুরাগীগণ কবির জন্মদিন পালন করেন।"[২২]

এই সভায় কবি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর **'রবীন্দ্র বন্দনা'** কবিতাটি পাঠ করেন। কবিতাটির প্রথম পদটি ছিল ***'চল্লিশ কোটী ভিতরু আজি কোটীএ লোক যে ভাষা কহে, সে ভাষা কবি জনায়ে তার অন্তরর বন্দন হে।'***[২৩] সভাস্থলে রবীন্দ্রনাথ কালিন্দীচরণের পঠিত কবিতাটির সম্পর্কে বলেন যে, কবিতার অর্থ কিঞ্চিত অবোধ্য হলেও ছন্দ ও ভাষা অবোধ্য ছিলনা।[২৪] এই কথা বলার পর কবি ওড়িয়া সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ***"ওড়িয়া সাহিত্যের গতি, লেখকদের সমস্যা, সাহিত্য সংগঠন ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন আছে। কালিন্দীচরণের উপস্থিতিতে স্টেটস্‌ম্যান ও অ্যাসোসিয়েট প্রেস -এর একজন সাংবাদিক কবিগুরুর সাক্ষাৎ নিতে চাইলে কবি কথা বলতে অসম্মত হন।"***[২৫]

"১৯৩৫ - ১৯৩৬ সালে উৎকল সাহিত্য সমিতির একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের কটক যাওয়ার কর্মসূচী ছিল। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।[২৬] কবির আগমন উপলক্ষে কবি মায়াধর মানসিংহ 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তার তিন বছর পর ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ওড়িশায় এলেন তখন 'সহকার' পত্রিকায় (দ্বাবিংশ ভাগ, নবম ও দশম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়।"[২৭] কবি মানসিংহ সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী ও প্রকৃতির উপাসক কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ক্ষণিক বিমূঢ় বনিক যুগরে হে চারণ এশিয়ার, শুনাইছ তুমি চির সনাতন সত্যর সমাচার।' ওড়িশার অন্যতম কবি বিছন্দ চরণ পট্টনায়ক তাঁর **'কবীন্দ্র বন্দনা'**তে লিখলেন...

"কবিতার কুঞ্জবন এ উৎকল কলা-মরালীর লীলাসর
প্রকৃতি-কমলা-চারু-চিত্রশালা উল্লসিত আজি তা অন্তর
তুম্ভ আগমনে,
সাহিত্য সমাজ অর্ঘ্য দানে,
কোনার্ক পথর অবলা বন্দানে বন্দে পূর্ণ হুলোহুলি শুনে।"[২৮]

"কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও নবকিশোর দাস কবি পুরীর আগমনের সময় 'রবীন্দ্রবন্দনা' শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি পরের মাসে (১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ)

‘উৎকল সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মনে হয় এই কবিতায় কবির প্রতি নবকিশোরের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রীতি সর্বাপেক্ষা অধিক স্ফুরিত হয়েছে।”[২৯] যেমন —

“ক্ষুদ্র কবি পুজে ভোলে তোলি অর্চ্চনা
এ শুভ তিথি হে কবি! মধুর মূর্চ্ছনা
জাগে মম প্রাণে, মনে কী গাইবি গীতি?
ব্যক্ত নাহি হুএ হৃদ ভরা ভক্তি প্রীতি”

কবি গুরুর নোবেল প্রাপ্তির পর ভারতীয় সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রসাহিত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হতে শুরু করে। পূর্ব থেকে উৎকলের সাহিত্য সমাজের সঙ্গে কবির পরিচিত গড়ে উঠেছে। ওড়িশার সঙ্গে বাংলার আত্মিক যোগসূত্র ও ধর্মীয় যোগসূত্র মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। মধুসূদন রাও ও গোপবন্ধু দাসের পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল কবি ও প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন ১৯২৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। তার ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে অন্নদাশঙ্কর এসে গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণ করে যান। শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয় বার এসে যে অনুভূতি গ্রহণ করেন তিনি ‘শান্তিনিকেতন’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

“বর্ষক তলে যেতেবেলে আসি থিলি আশ্রম উপরে সেতে দৃষ্টি দেই ন থিলি, যেতে দেই থিলি আশ্রম প্রাণ রবীন্দ্রনাথঙ্ক উপরে। আজি সে South America রে। তাঙ্কর অভাব বিশেষ অনুভব করুছি। কিন্তু সুখর বিষয়, আশ্রমর এবে অনেক বিখ্যাত লোক অছন্তি এবং শিঘ্র অনেক আসিবে।”[৩০]

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ওড়িশায় কর্মরত বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ওড়িয়া ভাষাকে বিলোপ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা ভাষার প্রচলন করার জন্য উদ্দ্যম নিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল হন। সেই সময় এই ভাষা বিলোপের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ওড়িশাবাসীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে তাঁর **‘ভাষা বিচ্ছেদ প্রবন্ধে’** (ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ) কতকগুলি অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন, যার ফলস্বরূপ ওড়িশার কবি-সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্র বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

গ) রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ ঃ

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পর ওড়িশার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কবিগুরুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ, কর্মময় জীবন, রবীন্দ্রদর্শন ইত্যাদিকে বিষয় করে ওড়িশায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রকাশ হয়। কিন্তু সমস্ত লেখালেখি পাঠক সমাজের কাছে আসতে পারেনি। কটকের '**উৎকল সাহিত্য সমাজ**' ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে কবিকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন। '**সহকার**' সাহিত্য পত্রিকা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় নবকিশোর দাসের '**পূরবী ও কবি রবীন্দ্রনাথ**' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয়। সেই বছর '**উৎকল সাহিত্য**' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় '**ওড়িশার অতিথি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**' রবীন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ দশম সংখ্যায় '**কাবুলিওয়ালা**' ছোটগল্পটি ওড়িয়া ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। পারলাখেমুণ্ডির সাহিত্য সমিতির আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত '**রবীন্দ্র ক্ষুদ্র গল্প অনুবাদ প্রতিযোগিতা**'য় আর্তত্রাণ মিশ্র এই গল্পের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর ওড়িশার সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজের মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ওড়িশাবাসী বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সভা, আলোচনা চক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোকদিবস পালন করেন। '**দৈনিক সমাজ**', '**প্রজাতন্ত্র**', '**সহকার**' ও '**উৎকল সাহিত্য পত্রিকা**' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ও কবির সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ণ করে। '**সহকার**' পত্রিকায় (১৩৪৮, আষাঢ়-শ্রাবণ) '**রবীন্দ্র তর্পণ**' প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেদনাসিক্ত অন্তরে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন কবি দেবেন্দ্র কুমার সিংহ। গীতাঞ্জলি, নৌকাডুবি, চোখের বালি, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, বলাকা, সোনার তরী, প্রাচীন সাহিত্য, ভানুসিংহের পদাবলী, চণ্ডালিকা, বাঁশরী, চয়নিকা, ঘরে বাহিরে, বউঠাকুরানীর হাট, কড়ি ও কোমল, পূরবী, বিসর্জন, নটীর পূজা, জীবনস্মৃতি, যাত্রী, তাসের দেশ, কল্পনা, স্বদেশ, সঞ্চয়, ডাকঘর, গোরা, রাজর্ষি, কথা ও কাহিনী, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বপরিচয়, পঞ্চভূত, সাহিত্যের পথে, ব্যঙ্গকৌতুক, চিরকুমার সভা, চতুরঙ্গ, প্রবাহিনী, বিচিত্রতা, বীথিকা, শিশু ভোলানাথ, রাজা-প্রজা, ফাল্গুনী, অচলায়তন, বাল্মীকি প্রতিভা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি সৃষ্টি সম্ভারের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতা বর্ণিত হয়েছে এই কবিতায়।

ওড়িশায় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায়

প্রকাশিত হয় '**আলোকর কবি রবীন্দ্রনাথ**' নামক সংকলিত গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের লেখকদের রবীন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের ওড়িয়া অনুবাদ একত্রে সংকলিত করা হয়। পরবর্তীকালে সংকলক এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ '**আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ**' প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওড়িশা সাহিত্য একাডেমি রবীন্দ্রনাথের '**বিশ্বমানবের পথে**' প্রবন্ধ গ্রন্থটি '**বিশ্ব মানবর পথে**' শিরোনামে অনুবাদ করে। ওড়িশা মিশন প্রেস, কটক থেকে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকাংশ লেখেন ওড়িশা সাহিত্য একাডেমির তৎকালীন সভাপতি সন্তোষ কুমার সাহু। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ রচিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনূদিত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম ছিল এইরূপ — শিক্ষার ব্যবধান, রাষ্ট্র ও সমাজ, শিক্ষা সমস্যা, অতঃকিম, সভাপতিঙ্ক অভিভাষণ, পূর্ব ও পশ্চিম, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তার ইচ্ছারে কর্ম, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, শিক্ষার মিলন, সত্যর আহ্বান, কবির বিদ্যালয়, পল্লী ও শহর, সমবায়, কালান্তর, সভ্যতার সংকট। ওড়িশার গবেষক প্রাবন্ধিক কুশ নন্দ ও শান্তিসুধা নন্দ ১৯৮৫ সালে কটক থেকে প্রকাশ করেন ***'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ভক্তকবি মধুসূদন'*** নামক একটি একটি বৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ। ওড়িয়া ভাষায় তুলনামূলক রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় গ্রন্থটি অনবদ্য। অপর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ '**রবীন্দ্র সমকালীন ওড়িয়া কবিতা।**' এই গ্রন্থটির প্রকাশক হৃষিকেশ পণ্ডা। ১৯৮৮ সালে কটকের '**ওড়িশা বুক স্টোর**' থেকে প্রকাশিত হয়। ওড়িয়া ভাষায় তুলনামূলক রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় গ্রন্থটির গুরুত্ব আছে। গ্রন্থকার গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং ওড়িয়া কবি রাধানাথ রায় থেকে কুঞ্জবিহারী দাস পর্যন্ত কবিদের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্র কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অন্যতম উদ্যোক্তা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ***'Tagore in Orissa'*** একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওড়িশার সম্পর্ক নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা আছে। ***''দৈনিক প্রজাতন্ত্র' -এ গোরাচাঁদ মিশ্রের ওড়িশার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উপর ধারাবাহিক লেখা বেরিয়েছে। ড. রাধানাথ রথের কবিতাও 'দৈনিক সমাজ' -এ স্থান পেয়েছে।''*** [৩২]

ওড়িয়া ভাষায় সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের '**গীতাঞ্জলি**' কাব্য। বহু অনুবাদক '**গীতাঞ্জলি**'র ওড়িয়া অনুবাদ করেছেন। কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর অল্প সংখ্যক অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এই ধারাটি রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শুধু '**গীতাঞ্জলি**' নয় অন্যান্য রবীন্দ্রসাহিত্য ওড়িয়া ভাষায় অধিক পরিমানে অনুবাদ ও চর্চা হতে থাকে। এই ধারাটি এখন পর্যন্ত সাফল্যের সাথে বহমান। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক

গোপালচন্দ্র মিশ্র ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্য '**গীতাঞ্জলি**' কাব্য প্রাঞ্জল ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থের জন্য তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ শুভেচ্ছাপত্র প্রেরণ করেন। শুভেচ্ছাপত্রসহ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর অনুমোদনক্রমে প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র দাস কটকের মনমোহন প্রেস থেকে প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের শুভেচ্ছাবার্তাটি ছিল এইরূপ ঃ

> ***"To famillarise ourselves with his thought and writings and thus try to imbibe at least a part of his lofty idealism express in an equally lofty and excellent style; is the highest tribute we can pay to Tegore's memory."***

১৯৭৬ সালে লীলা রায়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত নির্ভর বাংলা গ্রন্থটির অনুবাদক ক্ষীতিশ রায় '**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঙ্ক জীবন চরিত**' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারত সরকারের সূচনা ও প্রকাশন মন্ত্রালয়ের প্রকাশন বিভাগ থেকে অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ষোলটি অধ্যায় বিভাজনের মাধ্যমে জীবন চরিত গ্রন্থটি বিন্যস্ত। পঁচিশে বৈশাখ, বাল্য, বিদ্যালয় জীবন, পর্বত যাত্রী, নতুন কবি, বিলাত পথে, দিব্যদৃষ্টি, দেশপ্রেমী, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, গুরুদেব, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গ্রন্থটি রচিত।

অনুবাদক ঈশ্বরচন্দ্র সামল ১৯৮৩ সালে '**গীতাঞ্জলি**' অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি বালেশ্বর থেকে প্রকাশ করেন শ্যামাপ্রসাদ বেহেরা। অনূদিত গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন ওড়িয়া কবি সচ্চিদানন্দ রাউতরায়। ভূমিকাংশটি এইরূপ ঃ

> ***''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঙ্ক অনবদ্য গীতিগুচ্ছ 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকর ওড়িয়া অনুবাদ পাঠকমণ্ডলীঙ্কু উপহার দেইছন্তি। মূল বংলাকু ভাষান্তর করিবাকু বেলে শ্রী সামল সমস্ত প্রকার জড়তা এবং ভাষাগত অসুবিধা অতিক্রম করিবাকু চেষ্টা করিছন্তি। মূল কবিতা গুটিকি গীতিধর্মী হোইথিলাকু তঁহির প্রাসঙ্গিকতা, ধ্বনিসাম্য ভাষান্তরে রক্ষা করিবা প্রকৃতরে এক সঠিক কার্য্য। সুখর কথা শ্রী সামল প্রণীত গীতিকর সাংগীতিকতা রক্ষা করিবারে বেশ সফল হইছন্তি।"***

শ্রী সামলের অনুবাদ কর্মটি যে সম্পূর্ণ ভাষানুবাদ তা অনুবাদক '**অভিজ্ঞতা**' অংশে উল্লেখ করেছেন—

"গীতাঞ্জলি আজি দেশ বিদেশর বহু ভাষারে অনুবাদ হোইছি ও তারি মধ্য অনেক সমীস্যা হইছি। ওড়িয়া ভাষারে এ অনুবাদ করিবা পাই চেষ্টা করিচি। কবিঙ্কর মূল লেখার পরিবর্তন ন করি প্রকৃত ভাবে উপস্থাপন করিবা পাই, এহা পাঠক মানঙ্কু অনুপ্রাণিত করিব বোলি আশা নেই প্রকাশ করিবার প্রয়াস করুছি।"

ওড়িশার লোককবি কৃপাময় মহাপাত্র **'গীতাঞ্জলি'**র অনুবাদ করেন ১৯৯৩ সালে। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন সুবলকিশোর মহাপাত্র। ওড়িশার কুর্লা থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অনুবাদক হরপ্রসাদ রায় কটকের বালুবাজারের ফ্রেণ্ডস পাবলিশার্স থেকে **'গীতাঞ্জলি'**র একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। পুরী থেকে অনুবাদক নারায়ণ সিংহ **'গীতাঞ্জলি'**র অনুবাদ প্রকাশ করেন ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। গ্রন্থটির প্রকাশক ক্ষণপ্রভা সিংহ। পুরীর ইউনিভার্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক নারায়ণ সিংহ Song offerings থেকে W.B. Yeats এর মুখবন্ধ বা ভূমিকা স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি সহ মূল গ্রন্থের সমান্তরালে ওড়িয়া ভাষায় তা অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটির প্রথমে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শংসাপত্র মুদ্রিত করা হয়ছে। পাঠক যাতে মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে ওড়িয়া অনুবাদটি পড়তে পারেন অনুবাদক তার জন্য এইরূপ পরিকল্পনা করেছেন। এই ভাবে বহু অনুবাদক বিভিন্ন সময়ে ওড়িয়া ভাষায় **'গীতাঞ্জলি'**র অনুবাদ করেছেন ও এখনও করে চলেছেন।

সত্তরের দশকে খ্যাতিমান অনুবাদক যুগলকিশোর দত্ত (১৯২৮ - ২০২০) অনুবাদ চর্চার মাধ্যে বাংলা ও ওড়িয়া সাহিত্যের সেতুবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে পুরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যুগলকিশোর। ওড়িয়া কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন কলেজ জীবন থেকে। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রতি তাঁর ছিল নিবিড় ভালবাসা। ১৯৭০ সালে বিমল মিত্রের **আমেরিকা**'র অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ চর্চা দিয়ে তাঁর পথ চলা শুরু করেন। তারপর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিমল মিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন সহ বহু সাহিত্যিকের সাহিত্যকে অনুবাদ করেন। তিনি মোট ৯৬টি বাংলা গ্রন্থের ওড়িয়া অনুবাদ করেন। অনুবাদ কর্মের জন্য ১৯৯৭ সালে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন। বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ করে ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার একটি দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন। কটকের বিদ্যাপুরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে — **কাবুলিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প** (২০০৩), **চারুলতা ও অন্যান্য গল্প** (২০০৩), **যোগাযোগ** (২০০৪), **গোরা** (২০১৩), **রাজর্ষি** (২০১৩), **নৌকাডুবি** (২০১৪), **আঁখির বালি** (২০০৩) ইত্যাদি। কটকের নবদিগন্ত

পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে '**ভৌতিক গল্প**' (২০০৪), কটকের সত্যনারায়ণ বুক স্টোর থেকে '**রবীন্দ্রনাথ গল্পমালা**' (২০১৩) ইত্যাদি অনূদিত রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ) ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল্যায়ণ ঃ

ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্য, জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, ব্রাহ্ম ধর্ম, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ইত্যাদিকে বিষয় করে নানা সময় ওড়িয়া ভাষায় বেশ কয়েকটি সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাৎসরিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এবং জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের লেখা প্রবন্ধ সমূহ সংকলিত রূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ এবং সংকলিত প্রবন্ধ গ্রন্থের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

১৯৬০ সালে কটকের রেবেনশ কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বল '**স্রষ্টা ও সৃষ্টি**' নামক একখানি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন শ্রীকান্ত কুমার রাউতরায়। কটকের বাঁকা বাজারের '**রাউতরায় প্রকাশনী**' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখের মতো প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অপরদিকে শেক্সপীয়ার, মিল্টন, ভলতেয়ার, গেটে, টলস্টয়ের মতো পাশ্চাত্য কবি সাহিত্যিকবৃন্দ। গ্রন্থটির মধ্যে ওড়িয়া কবি জগন্নাথ দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ ও রাধানাথ রায়ের পাশাপাশি ৬১ সংখ্যক পৃষ্ঠায় '**বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ**' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক এই প্রবন্ধে কবিগুরুর জীবন দর্শন, ধর্ম চেতনা, সাহিত্য ভাবনা, গীতাঞ্জলির স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং পিতৃ আদর্শে আদর্শায়িত রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিচালনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক ভাবনা ও বিশ্বমানবতাবোধের আদর্শ। ১৯৬১ সালে কটকের '**অরুণোদয় প্রেস**' থেকে সরলা দেবী প্রকাশ করেন '**রবীন্দ্র পূজা**' নামক একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মে বিশ্বভারতী ওড়িয়া সাহিত্য পরিষদ একখানি '**রবীন্দ্র স্মরণিকা**' প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতীর তৎকালীন ওড়িয়া বিভাগের প্রধান অধ্যাপক দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক ওড়িশার '**সমাজ**' প্রকাশন থেকে

স্মরণিকা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। মোট বারোখানি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সূচীপত্রটি নিম্নরূপ—

বিষয়	**লেখক**	**পৃষ্ঠা**
	(প্রথম পর্ব)	
শতবার্ষিকীর ভাবনা	চিত্তরঞ্জন দাস	১
রবীন্দ্রনাথ	গোপীনাথ মহান্তি	১৬
রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা ওড়িয়া	কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী	৩৯
রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসাহিত্য	কুঞ্জবিহারী দাস	৪৬
রবীন্দ্রসঙ্গীত	শ্রী দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক	৫৩
রবীন্দ্র চিত্রকলার গোটিএ দিগ	সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
জমিদার রবীন্দ্রনাথ	অন্নদাশঙ্কর রায়	৬৪
বুদ্ধিজীবি রবীন্দ্রনাথ	নরেন্দ্রনাথ মিশ্র	৭১
রবীন্দ্রনাথঙ্ক নাটক	শিবনাথ মহান্তি	৭৯
	(দ্বিতীয় পর্ব)	
রবীন্দ্রনাথঙ্কর কেতেটি কবিতা	বিনোদ রাউতরায়	৮৭
কাব্যের উপেক্ষিতা	কমলা সাহু	৯২
কর্তাঙ্কু ভুত	শ্রীনিবাস	১০০

ওড়িয়া সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি পদ্মভূষণ কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তার কয়েকটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। **'কালিন্দীচরণ প্রবন্ধ সমগ্র'** গ্রন্থটি প্রকাশ করেন শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মিশ্র কটক স্টুডেন্টস স্টোর থেকে ১৯৮৬ সালে। গ্রন্থটিতে মোট ২৯ খানি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ এবং **'বঙ্গ উৎকল দুইটি ভগিনী'** শীর্ষক বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার তুলনামূলক প্রবন্ধ একটি। রবীন্দ্র বিষয়ক দুটি প্রবন্ধের মধ্যে ৬৯ সংখ্যক পৃষ্ঠায় **'রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশ্বপ্রেম'** শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি চরণ উপস্থাপিত হয়েছে এইরূপ — ***'হৃদয় আজি মোর কেমনে গলা খুলি/জগৎ আসি তঁহি করুচি কোলাকুলি।'***

রবীন্দ্রসৃষ্টির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ যেমন করা হয়েছে পাশাপাশি 'নৌকাডুবি', গোরা ইত্যাদি উপন্যাসের পর্যালোচনাও করা হয়েছে। পাশাপাশি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। অপর প্রবন্ধটির শিরোনাম *'রবীন্দ্র গল্পের বিশেষত্ব'*। এই প্রবন্ধটি ১৯৫৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কবিগুরুর তিরোধান দিবসে আকাশবাণী কটক থেকে সম্প্রচারিত হয়। পরে প্রবন্ধটি ***'কালিন্দীচরণ প্রবন্ধ সমগ্র'***এ স্থান পায়। এই প্রবন্ধে নষ্টনীড়, মাস্টারমশাই, অতিথি, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিতপাষাণ ও কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক টলস্টয়, গোর্কি, চেকভ ও হেনরি, বালজাক প্রমুখ বিশ্বনন্দিত ছোটগল্পকারের সমান সারিতে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়া '**গীতাঞ্জলি**' কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক তারিণীচরণ দাস। অধ্যাপক দাসের গ্রন্থটির নাম '**গীতাঞ্জলি ঃ এক বিশ্লেষণ**'। ১৯৮৩ সালে প্রকাশক গোপীনাথ সাহু গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

ভুবনেশ্বরে স্থিত ওডিশা ***'রিজিওনাল কলেজ ফর এডুকেশন'***এর অধ্যাপক বসন্ত কুমার পণ্ডা ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিশেষ একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি ১৯৯৯ সালে '**ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট**' থেকে প্রকাশিত '**জাতীয় জীবন চরিতমালা**' শীর্ষক গ্রন্থ বিশেষ। অধ্যাপক পণ্ডার এই গ্রন্থটি আসলে ১৯৭১ সালে কৃষ্ণকৃপালিনী রচিত '**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**' গ্রন্থের ওড়িয়া অনুবাদ। এই অনূদিত গ্রন্থটি অধ্যাপক পণ্ডার শান্তিনিকেতন থেকে প্রাপ্ত পি-এইচ.ডি ডিগ্রির গ্রন্থরূপ। মুকুলিত কবি, হৃদয়ারণ্য, অন্বেষণ, কবিত্বর নবজন্ম, মাটির কাজ, জনগণর কবি, নিঃশঙ্ক পদাতিক, পাশ্চাত্যর মুখামুখি, দেশ ও বিশ্ব, অতিকায় ভারতীয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, যাত্রী দূত, শেষ ফসল সূর্য্যাস্ত ইত্যাদি।

ওড়িয়া কবি কুঞ্জবিহারী দাশ কয়েকজন মহাপুরুষের জীবন নিয়ে ১৯৪৯ সালে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় '**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি কীভাবে জেনেছেন ও চিনেছেন সে বিষয়ে কবি স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এছাড়া এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ও 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ২০১১ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) থেকে ***'Nameless Recognition'***শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং বিদেশি ভাষায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তার সৃষ্টি নিয়ে চর্চা হয়েছে সে বিষয়ে

প্রাবন্ধিকগণ তাদের প্রবন্ধে তথ্যবহুল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন স্বপন চক্রবর্তী। কলকাতা আনন্দমোহন কলেজের ওড়িয়া বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা ***'Impact of Rabindranath on odia literature'*** শীর্ষক একটি ইংরেজি প্রবন্ধে ওড়িশার সাথে ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং ওড়িয়া সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ কীভাবে চলছে সে সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন।

এইভাবে অনেকে নানা সময় ও উপলক্ষে রবীন্দ্র সাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদ এবং ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের চর্চা করেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এপর্যন্ত ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার ধারাটি অব্যাহত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই ধারাটির কালানুক্রমিক পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপস্থাপন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এরজন্য বিস্তর অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন এবং এটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। যদিবা সম্পূর্ণ নয় তথাপি গবেষকের পাঠানুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার একটি কালানুক্রমিক বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো ঃ

ঙ) ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলি ঃ

১. দুই বোন, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, কটক পাবলিশিং হাউস, কটক, ১৯৫০।

২. রবীন্দ্র গল্প চয়ন (নির্বাচিত গল্প), চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, সাহিত্য অকাদেটি, নিউ দিল্লি ১৯৫০।

৩. রাশিয়ার চিঠি, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, কটক পাবলিশিং হাউস, কটক, ১৯৫১।

৪. রক্তকরবী, প্রফুল্ল পট্টনায়ক অনূদিত, প্রতিভা বিকাশ ভবন, ব্রহ্মপুর, ওড়িশা, ১৯৫৭।

৫. গীতাঞ্জলি, গোপালচন্দ্র মিশ্র অনূদিত, প্রকাশক প্রফুল্লচন্দ্র দাস, ১৯৬১।

৬. ১৮৬১ - ১৯৬১ শতবর্ষ পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচিত ছোটগল্প ও কবিতার অনুবাদ, অনুবাদক তত্ত্বকন্দর মিশ্র, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৬১।

৭. চিত্রাঙ্গদা, প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কটক, ১৯৬১।

৮. চার অধ্যায়, অশোক রাও অনূদিত, প্রগতি পাবলিশার্স, কটক, ১৯৬১।

৯. একোইশ গল্প, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৬৩।

১০. বিশ্বমানবের পথে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের অনুবাদ), অনুবাদক কানুচরণ মিশ্র, ওড়িয়া সাহিত্য অকাদেমি, ভুবনেশ্বর, ১৯৬৩।

১১. যোগাযোগ, গোপীনাথ মিশ্র অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৬৬।

১২. ঘরে বাইরে, সীতাদেবী খাড়ঙ্গা অনূদিত, দশহ ব্রাদার্স, বেহরমপুর, ১৯৬৮।

১৩. বিনোদিনী (চোখের বালি), চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৭২।

১৪. নিবন্ধমালা ১ম খণ্ড (নির্বাচিত কবিতা), গৌরী কুমার ব্রহ্ম অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৭২।

১৫. শেষের কবিতা, সীতাদেবী খাড়ঙ্গা অনূদিত, স্টুডেন্টস স্টোর, কটক, ১৯৭৪।

১৬. একোত্তর শতী (নির্বাচিত কবিতা), শচী রাউতরায় অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৭৫।

১৭. জীবনচরিত, ক্ষীতিশ রায় অনূদিত, ১৯৭৬।

১৮. নিবন্ধমালা ২য় খণ্ড (নির্বাচিত প্রবন্ধ), চিন্তামণি বেহেরা অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৭৭।

১৯. পাঞ্চ নাটক (পাঁচটি নাটক), প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৭৯।

২০. বৈকুণ্ঠঙ্ক খাতা (বৈকুণ্ঠের খাতা), বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঢল অনূদিত, স্টুডেন্টস্ সেন্টার, কটক, ১৯৮০।

২১. বহু রাণী (বৌ ঠাকুরাণীর হাট), মনোজমঞ্জরী মিশ্র অনূদিত, কটক, স্টুডেন্টস্ স্টোর, কটক, ১৯৮০।

২২. গীতাঞ্জলি, ঈশ্বরচন্দ্র সামল অনূদিত, ১৯৮৩।

২৩. নৌকাডুবি, বনজা দেবী অনূদিত, গ্রন্থমন্দির, কটক, ১৯৮৩।

২৪. গীতাঞ্জলি, খগেশ্বর মহাপাত্র অনূদিত, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৭।

২৫. গীতাঞ্জলি, জগন্নাথ পাত্র অনূদিত, ওড়িশা বুক স্টোর, কটক, ১৯৯১।

২৬. গীতাঞ্জলি, অরুণ প্রশতি অনূদিত, কাহানি, কটক, ১৯৯২।

২৭. গীতাঞ্জলি, কৃপাময় মহাপাত্র অনূদিত, ১৯৯৩।

২৮. গোরা, রবীন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডা অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০২।

২৯. মুকুট, রমাকান্ত রাউত অনূদিত, শ্রদ্ধা প্রকাশনী, কটক, ২০০২

৩০. নৌকাডুবি, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩১. রবীন্দ্রনাথঙ্ক জনপ্রিয় গল্প (নির্বাচিত ছোটগল্প), রঘুনাথ মহাপাত্র অনূদিত, কটক ট্রেডিং কোম্পানি, কটক, ২০০৩।

৩২. রবীন্দ্র কবিতাগুচ্ছ, নিলাদ্রীভূষণ হরিচরণ, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩৩. নির্বাচিত গল্প (ছোটগল্পের অনুবাদ), হরিশচন্দ্র বেহেরা অনূদিত, কাহানি, কটক, ২০০৩।

৩৪. বহু ঠাকুরাণীঙ্ক হাট (বৌ ঠাকুরাণীর হাট), মমতা দাস অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩৫. বৈকুণ্ঠঙ্ক খাতা (বৈকুণ্ঠের খাতা), বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঢল, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩৬. কাবুলিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩৭. চারুলতা ও অন্যান্য গল্প, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩৮. চতুরঙ্গ, নমিতা বসু অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৩।

৩৯. গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত গল্প), রবীন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডা অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৪।

৪০. যোগাযোগ, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৪।

৪১. ভৌতিক গল্প (রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলির অনুবাদ), যুগলকিশোর দত্ত, নবদিগন্ত, কটক, ২০০৪।

৪২. তপস্বিনী ও অন্যান্য কবিতা, দীপ্তি পট্টনায়ক অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৪।

৪৩. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথঙ্ক ক্ষুদ্র কবিতা, ব্রজনাথ রথ অনূদিত, শুভশ্রী প্রকাশনী, বালেশ্বর, ২০০৪।

৪৪. গল্পগুচ্ছ (নির্বাচিত গল্প), রবীন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডা অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৬।

৪৫. গীতাঞ্জলি, নৃসিংহ মিশ্র অনূদিত, বুকল্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল, ভুবনেশ্বর, ২০০৬।

৪৬. রাজর্ষি, অমিয়বালা পট্টনায়ক অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক, ২০০৬।

৪৭. নয়নর বালি (চোখের বালি), শোভাকর দাস অনূদিত, ক্ল্যাসিক হাউস, কটক, ২০০৭।

৪৮. বিশ্বপরিচয়, মৃদুলা মিশ্র অনূদিত, সৃজন, ভুবনেশ্বর, ২০০৭।

৪৯. গীতাঞ্জলি, নারায়ণ সিংহ অনূদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ২০০৯।

চ) ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রসৃষ্টির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থাবলি ঃ

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টি (রবীন্দ্র প্রসঙ্গ), গঙ্গাধর বল, ১৯৬০।

২. রবীন্দ্র পূজা, সরলা দেবী, ১৯৬১।

৩. Tagore in Orissa, Translated (in odia) by Prabhat Mukhopadhyay, 1961.

৪. প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবন কথা, ভাবগ্রাহী মিশ্র অনূদিত, ১৯৬১।

৫. আলোকর কবি (রবীন্দ্রনাথ নির্ভর), চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯৬১।

৬. রবীন্দ্র স্মরণিকা, দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক সম্পাদিত, ১৯৬১।

৭. আমার কবি (লীলা মজুমদার রচিত), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনূদিত, ১৯৬৩।

৮. সারস্বত গৌরব, জানকী বল্লভ মহান্তি, ১৯৮৩।

৯. Tagore in Orissa, Translated (in odia) by Prabhat Mukhopadhyay, 1984.

১০. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও ভক্তকবি মধুসূদন, কুশ নন্দ, ১৯৮৫।

১১. গীতাঞ্জলি এক বিশ্লেষণ, তারিণীচরণ দাস, ১৯৮৬।

১২. রবীন্দ্র সাহিত্যরে বিশ্বপ্রেম (প্রবন্ধ), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, ১৯৮৬।

১৩. রবীন্দ্র গল্পর বিশেষত্ব (প্রবন্ধ), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, ১৯৮৬।

১৪. রবীন্দ্র সমকালীন কবিতা, হৃষিকেশ পণ্ডা, ১৯৮৮

১৫. Tagore in Orissa, Translated (in odia) by Prabhat Mukhopadhyay, 1999.

১৬. Impact of Rabindranath on odia literature, K.C. Bhunia, 2011.

ছ) ওড়িয়া 'সবুজ যুগ' -এর সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব ঃ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমকালীন ওড়িয়া সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তার উপর কীভাবে ও কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ নয়, তাঁর বহু আগে হতে ওড়িয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব বর্তেছে। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির অভিঘাত প্রতিবেশী অন্যান্য সাহিত্যের মতো ওড়িয়া সাহিত্যের উপর পড়েছে। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব যেমন ওড়িশার কবি পঞ্চসখার উপর পড়েছে তেমনি মধুসূদন দত্তের প্রভাব পড়েছে কবিবর রাধানাথ রায় ও মধুসূদন রাও -এর উপর। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পড়েছে ফকিরমোহন সেনাপতি ও অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপর। সুতরাং প্রবহমান ধারায় ওড়িয়া সাহিত্য ভাবনার উপর বাংলা সাহিত্যের একটি স্বাভাবিক প্রভাব ছিল। এর ফলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসাহিত্যের দর্শন ও শিল্প ভাবনাকে বরণ ও গ্রহণ করবার মতো একটি অনুকূল পরিবেশ ওড়িয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়েছিল। রবীন্দ্রপূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রভাব কীভাবে ও কতখানি ওড়িয়া সাহিত্যে পড়েছিল তার বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমকালে ও উত্তরকালে ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্যের আদর্শ কতখানি অনুকরণীয় হয়েছে তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আসলে ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ের শুভ

সূচনা লগ্নে লক্ষ্য করা যায়। ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে **রামশঙ্কর রায়** (১৮৫৭ - ১৯৩১) একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি নাট্যরচনায় অগ্রসর হন কটকে একটি বাংলা নাটকের অভিনয় দেখে। অল্প বয়সে তিনি কবিতার ক্ষেত্রেও পদচারণা শুরু করেছিলেন। তাঁর অল্প বয়সে লেখা কবিতা '**প্রেমতরী**' (১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত। প্রিয়রঞ্জন সেন রামশঙ্কর রায়ের কাব্যে রবীন্দ্র প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন এইরূপ ঃ

> *"তিনি প্রেমতরী নামক এক কাব্য রচনা করেন, কাব্যের ভিত্তি হইল ইংরাজ কবি গোলড্স্মিথের 'হারমিট'। রবীন্দ্রনাথের বনফুল বা ঐসময়কার অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে প্রেমতরীর বিষয়ের এবং সুরের সাদৃশ্য আছে।"*[৩৩]

রামশঙ্কর রায় তাঁর '**প্রেমতরী**' কবিতার কাহিনীবস্তু নির্বাচনে গোল্ডস্মিথের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করলেও কাব্যরূপের ক্ষেত্রে তিনি একজন অন্যতম রবীন্দ্রানুসারী কবি। ১৮৭৮ সালে ১৭ বছর বয়সে ওড়িয়া সাহিত্যে বালক কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সত্যিই বিস্ময়কর। কবি রামশঙ্কর রায়কে রবীন্দ্র প্রভাবপুষ্ট ওড়িয়া কাব্যের আদিকবি রূপে স্বীকার করে নেওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে '**সবুজপত্র**' -এর যুগে সমান্তরালভাবে ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে '**সবুজ যুগ**' বলে একটি সময়কাল চলতে থাকে। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এই সবুজযুগের কবি গোষ্ঠীকে '**সবুজ গোষ্ঠী**' বলা হয়ে থাকে। সেই সময় এই সবুজ গোষ্ঠীর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক নিন্দাবাদ ও প্রশংসা হয়েছে। একদিকে বলা হয়েছে যে, কবিগুরুর কাব্যমদিরাতে বিভ্রান্ত এই সবুজের দল '**really valuable**' কিছু আমদানি করেননি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। অপর ক্ষেত্রে সমালোচকগণ বলেছেন যে, পরবর্তীযুগের সাহিত্যিকদের উপর এই সবুজেরা কিন্তু গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা ওড়িয়া সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সবুজগোষ্ঠীর যে সকল কবিগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্র প্রভাবে পুষ্ট তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন — কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ও বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। এছাড়া কবি-ঔপন্যাসিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর নামও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রোমান্টিক কবি। ধূলিধূসর পৃথিবী হ'তে স্বপ্নমেদুর জগতে তিনি পলায়ন করতে চান। কোথাও তার হারিয়ে যাওয়ার মানা নেই, কারণ তিনি চঞ্চল, তিনি সুদূরের পিয়াসী। রবি কবির এই রোমান্টিকতা সবুজগোষ্ঠীর কবিদের প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের

রোমান্টিক আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কবি **অন্নদাশঙ্কর রায়**। তাঁর **'প্রলয়প্রেরণা'** কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের মিল লক্ষ্য করা যায়। এই কবিতায় অন্নদাশঙ্কর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ১৮ অক্ষর বিশিষ্ট 'মহাপয়ার' ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। কবি অন্নদাশঙ্কর লিখলেন —

"ঝঞ্ঝা বায়ু! ঝঞ্ঝা বায়ু,
ডাক মতে প্রলয় আহরে,
মূঢ় মূক ধরা বক্ষে
মাতিবি মুঁ সোল্লাস তাণ্ডবে।
মোতে কর বংশী তব —
বজাইবি ভৈরবী রাগিনী,
ঝঞ্ঝারাণি! মো সঙ্গীতে
মিশু তব কঙ্কন কিঙ্কিনি।
কণ্ঠে মোর বজ্রবাণী
নেত্রে মোর প্রলয় দীপন।"

এই কবিতাটির মূলসুর শেলির ***'পশ্চিমা ঝড়ের গান'*** ও রবীন্দ্রনাথের **'বর্ষশেষ'** গানের সুরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শেলি ঝড়ের কাছে প্রেরণা চেয়েছিলেন। নিজেকে সেই ঝড়ের বীণা করতে চেয়েছিলেন। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথও নিজেকে করে তুলতে চেয়েছিলেন শঙ্খ, বীণা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ রুদ্র শঙ্খের রন্ধ্রমুখে ফুৎকার দিয়ে তুলতে চেয়েছেন ***'অভ্রভেদী মঙ্গলনির্ঘোষ'***। কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ও তাঁর **'প্রলয়প্রেরণা'** কবিতায় বাঁশির মতো বাজতে চেয়েছিলেন, তুলতে চেয়েছিলেন **'ভৈরব রাগিনী'**। কবি চেয়েছিলেন জ্বলন্ত জীবন ও বজ্রবাণী কণ্ঠ। বিশ্বের যত অন্যায়, যত পাপ তিনি দূরীভূত করতে চান। ভস্মীভূত করতে চান —

"যেতে পাপ, যেতে মিথ্যা,
যেতে মোহ, যেতেপ্রবঞ্চনা,
ধর্ম নামে, নীতি নামে,
জাতি নামে যেতে আবর্জনা
বৈষম্যের ভেদরেখা,
ভণ্ডতার যেতে আচ্ছাদন

দুর্বলের হাহাকার,

পীড়িতের মরম বেদন।"

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর '**বলাকা**' কাব্যগ্রন্থের ৩৭ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন —

"যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উলঙ্ঘিয়া
ঊর্দ্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
বহুযুগ হতে জমি বায়ু কোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চির ক্ষোভ..."

অন্নদাশঙ্করের কবি ভাবনায় প্রলয় প্রেরণা আসলে স্থায়ী অভিব্যক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি জন্মরোমান্টিক। প্রলয় প্রেরণা অপেক্ষায় প্রণয় প্রেরণা অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্বাভাবিক লীলাক্ষেত্র। প্রলয়ের গান তিনি যা গেয়েছেন তা সত্য নয়, তা আকস্মিক। পরে '**সৃজন স্বপ্ন**' কবিতায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঝড়ও নন, আগুনও নন। '**সৃজন স্বপ্ন**' কবিতায় কবির স্বীকারোক্তি —

"শুনিব যদি শুনগো রাণি
সে নুহে মোর মরম বাণী
সে নুহে মন কথা মো।"

অন্যত্র '**আজি এ শুভ শারদপ্রাতে**' কবিতায়ও কবি স্বীকার করেছেন যে —

"প্রলয় কথা প্রলাপ সম
শুভুছি আজি শ্রবণে মম
কি হেব কার বিনাশে?"

কারণ কবি একজন রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী মানুষ। তাই কবি বলেন —

"জানিলি মনে নুহে মু বীর
সমর মদে চির মদির;
মুহি স্বপ্ন বিলাসী।"

সুতরাং কবির কাব্যভাবনার পরিবর্তন হয়েছে বারবার। এই কবির পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো সুদূরের অভিযাত্রী। এই বেদনা বিদীর্ণ পৃথিবীতে তাঁর অন্তরের স্বপ্ন সফল হচ্ছেনা। বাস্তবের ধূলি-মাটি ছেড়ে রোমান্টিক কল্পনাকে, সৌন্দর্যের অমরাবতীতে যাওয়ার জন্য সৌন্দর্যলক্ষ্মীর নিকট **'এবার ফিরাও মোরে'** বলে আকূতি জানিয়েছেন। আবার মেঘদূতের অলকাপুরীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম প্রিয়াকে পাবার জন্য মানস অভিসার যেমন করেছিলেন, তেমনি অন্নদাশঙ্করও বলেন —

"এ লোকে মোর বাসনা দল
ব্যর্থ বৃথা সিনা সকল
এ লোকুঁ যিবি পলাই।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর **'সোনার তরী'** কাব্যগ্রন্থে **'ব্যর্থ যৌবন'** কবিতায় বিগত যৌবনের জন্য যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। একই ভাবে **'যউবন থরে গলে আউ আসেনা'** কবিতায় কবি বিগত যৌবনের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন —

"বৃথা বিধুর পরাণপুরে
ঝুরে বাসনা—
আহা যৌবন থরে গলে
আউ আসে না।"

অন্যত্র **'পরীমহল উত্তরা'**তে কবি একই কথা বললেন —

"পুনিত আসিব ফেরি ফাল্‌গুনী জোছনা
যুগে যুগে নিশি হেব শোভনা।

সবুত রহিব, আহা ন থিবি মু একা গো!
এ মধু ধরনী মোর থরটি এ দেখা গো।
মরমে মুরুছি মরে কামনা!"

রোমান্টিক অন্নদাশঙ্কর বাস্তবের কঠোর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য মাঝে মাঝে গান ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের মত। রঙ্গময়ী কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরতে চেয়েছিলেন সংসারের কর্মক্ষেত্রে (এবার ফিরাও মোরে)। সেই ভাব-ভাষা ও ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত অন্নদাশঙ্করের '**কমল বিলাসীর বিদায়**' নামে সনেটগুচ্ছে কবি লিখলেন —

"নিষ্ঠুর বাস্তব রণে আসিছি আহ্বান।
থাঅ মুগ্ধা প্রণয়িনী, স্বপ্নালসা বাণী;
কমল বিলাসী কবি মাগই মেলাণি;
আজি মু ভুলিবি সোতে ঢালি দেবি প্রাণ।
শত স্বরে ডাকে বিশ্ব ডাকে গ্রহ তারা,
ডাকে মোতে অনন্ত জলধি কলরোল;
কেমন্তে রহিবি, কহ, স্নেহর এ কারা —
কক্ষে অলস স্বপ্ন বক্ষে হোই ভোল?
. . . বীনাপাণি
কবিতা কমল বনুঁ দিও গো মেলনি।"[৩৪]

সুধাকর চট্টোপাধ্যায় কবি অন্নদাশঙ্করের সনেট সম্পর্কে বলেছেন —

> **"রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে'র মহাপয়ারের (১৮ অক্ষর) যা বলেছিলেন তারই অনুসরণে এই (১৪ অক্ষরে) সনেটগুচ্ছে কবি ম্লান মূক মুখে ভাষা ধ্বনিত করতে চান 'উৎপীড়িত নিরুদ্ধ কণ্ঠে স্ফূরি উঠু দৃপ্ত বাণী'। রবীন্দ্রনাথের মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নেচে নেচে সত্যকে ধ্রুবতারা করে প্রাগ্রুসরণের আদর্শে অন্নদাশঙ্কর বলেন, "ধ্বংসের হিল্লোলে বাত্যাসম নাচিবি মু ছন্দহীন ছন্দে।"**[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের ছন্দনির্মাণের কৌশলকে সবুজযুগের কবি অন্নদাশঙ্কর ও অন্যান্য কবিগণ

সাগ্রহে ও সানন্দে তাঁদের কাব্যপ্রকরণ করূপে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে জানকীবল্লভ মহান্তি তাঁর **'ওড়িয়া সাহিত্য পরিক্রমা'** গ্রন্থে লিখেছেন —

> **"ওড়িয়া আধুনিক যুগ ঠারু ছন্দ ক্ষেত্ররে মধ্য বঙ্গ সাহিত্যাভিমুখী হোই অছি। ওড়িয়া কবিগণ এহি সময়রে রবীন্দ্রনাথঙ্ক প্রবর্তিত ছন্দকু অবিচার্য ভাবরে অনুকরণ কলে।"**[৩৬]

রবীন্দ্র প্রভাবিত অন্য এক ওড়িয়া কবি **বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক** (১৯০৪ - ১৯৭৯)। রবীন্দ্রনাথের প্রেমদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি কাব্য রচনা করেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রকবিতার ছন্দবিন্যাস রীতি কবি বৈকুণ্ঠনাথকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তের যে বিশেষ ছন্দে **'সোনার তরী'**র **'তোমরা ও আমরা'** কবিতা রচনা করেছেন (মাত্রা ৬+৬+২) সেই ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সবুজ কবি বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক লিখলেন —

"গন্ধ যে মনে মলয় সমীরে মিশে
তটিনী যে সনে সাগরবু যাত্র বহি
যে সমে জোছনা শ্যামপ্রান্তরে মিশে
তুমরি পরাণে মিশি যিব আজি সহি।"

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণের ফলে বৈকুণ্ঠনাথের রচনা মৌলিক ও সুন্দর হয়েছে। রবীন্দ্র কবিতার ভাব ওড়িয়া ভাষায় বহুকবির কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। বৈকুণ্ঠনাথের ছন্দবিন্যাস কৌশল লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কবি বৈকুণ্ঠনাথ রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিন্যাসকে অনুসরণ করেছেন। ৩ মাত্রার অতিপর্ব এবং ৭ মাত্রার মূলপর্ব যোগে কবি বৈকুণ্ঠনাথ কবিতার পংক্তি বিন্যাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যে এই ধরণের মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যেমন —

যেমন কালো মেঘে/অরুণ আলো লেগে/
মাধুরী ওঠে জেগে/প্রভাতে।

রবীন্দ্রনাথের ৬।৬।২ এই ধরণের কবিতার উদাহরণ —

আমরা বৃহৎ/অবোধ ঝড়ের/মত

আপন আবেগে/ছুটিয়া চলিয়া/আসি।

বিপুল আঁধঅরে/অসীম আকাশ/ ছেয়ে

টুটিবারে চাহি/আপন হৃদয়/রাশি/

(তোমরা এবং আমরা ঃ সোনারতরী)

একইভাবে ৬+৬+২ মাত্রার বিশিষ্ট চরণ বিন্যাসে কবি বৈকুণ্ঠনাথ লিখলেন — **'গন্ধ যে সনে। মলয় সমীরে। মিশে'** কবি বৈকুণ্ঠনাথের কবিপ্রেয়সী কবিতাটির ছন্দ বিন্যাস হুবহু রবীন্দ্রনাথের **'মানসী'** কাব্যগ্রন্থের **'ভুল ভাঙ্গা'** কবিতার ছন্দবিন্যাসের সঙ্গে মিলে যায়। বৈকুণ্ঠনাথের **'কবিপ্রেয়সী'** কবিতাটি প্রথমে **'উৎকল সাহিত্য'** পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে **'সবুজ কবিতা'** সংকলনে **'সমাধিস্মৃতি'** নামে অন্তর্ভূক্ত হয়। কবিতাটির ছন্দবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

প্রিয়তম কেতে/ প্রয়াস করিছি/ তুমরি কবি	৬+৬+৫
গাহিব সে গীত/ লেখিব বোলি সে/ মোহন ছবি।	৬+৬+৫
পারি নাহিঁ আগো/ পারি নাহিঁ থরে	৬+৬
নিতি নিতি গ্লানি/ অবজ্ঞা ভরে	৬+৬
নিরাশারে তুলি/ নিক্ষেপিছি গো/ যাইছি দ্রবি	৬+৬+৫
প্রিয়তম কেতে/ প্রয়াস করিছি/ তুমরি কবি।	৬+৬+৫

(সমাধিস্মৃতি ঃ বৈকুণ্ঠনাথ)

একইভাবে রবীন্দ্রনাথের **'ভুলভাঙ্গা'** কবিতায় পাই —

বুঝেছি আমার/ নিশার স্বপন/ হয়েছে ভোর।	৬+৬+৫
মালা ছিল তার/ ফুলগুলি গেছে/ রয়েছে ভোর।	৬+৬+৫
নেই আর সেই/ চুপি চুপি চাওয়া,	৬+৬
ধীরে কাছে এসে/ ফিরে ফিরে যাওয়া,	৬+৬
চেয়ে আছে আঁখি/ নাই ও আঁখিতে/ প্রেমের ঘোর।	৬+৬+৫
বাহুলতা শুধু/ বন্ধন পাশ/ বাহুতে মোর।।	৬+৬+৫

বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের কাব্যনির্মাণে রবীন্দ্রছন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য। কবি বৈকুণ্ঠনাথ তাঁর

একটি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ প্রকৌশলকে যে অনুকরণ করেছেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন—

''নবযৌবন পদ্যর ছন্দ বিন্যাস ও তার অবাধ উচ্ছ্বসিত গতি মূলরে বঙ্গীয় কবি কাজি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথঙ্ক প্রভাব পড়িথিবারু মুঁ অনুভব করে।"[৩৭]

কবি অন্নদাশঙ্কর রায় ওড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখবেন এটা বাঙালির কাছে কোন বিস্ময়ের নয়। বিস্ময়ের হলো ওড়িয়া সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আধুনিক কথাসাহিত্যিক **কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী** এককালে রবীন্দ্রপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কবিতা লিখেছিলেন। **'সবুজ কবিতা'**র সম্পাদক কালিন্দীচরণের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ থাকবেনা এটা স্বীকার করা যায় না। আমাদের এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাষা ও ছন্দের ধারানুসরণের উদাহরণরূপে কালিন্দীচরণের কবিতার নমুনা উপস্থাপনের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি কালিন্দীচরণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ হতে বিদায় নিয়ে পৃথিবীর আনন্দ বেদনার মধ্যে জীবনের স্বার্থকতার কথা বলেছিলেন। কবি বলেছিলেন —

"থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে - করো সুধাপান,
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি...''

(স্বর্গ হতে বিদায় ঃ চিত্রা ঃ রবীন্দ্রনাথ)

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর চমৎকার **'পুরী মন্দির'** কবিতার বেশ কিছু অংশে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের মিল লক্ষ্য করা যায়। যদিও কালিন্দীচরণের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র তবুও রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ প্রতিধ্বনিত করে কবি বললেন —

"বইকুণ্ঠ নাহি ভল লাগে
এ মর্ত্ত্য ভুবন
মো স্নেহ সদন

এ ধরণী

সুখমণি

. . . .

এ ধরার সুখ দুঃখ স্নিগ্ধরূপ সুন্দর কুৎসিত

অতি আদরর মোর, এ জীবনে অতি পরিচিত

কেতে আশা কেতে মোর আকাঙ্ক্ষার ধন

ছাড়ি সবু ন লোড়ই স্বরগ ভুবন,

জননীর অমৃত সেনেহ

লালিত করই এ যে দেহ

আশিস পিতার

কল্যাণ আধার

এতে প্রাণ

এতে দান''

(পুরীমন্দির ঃ কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী)

উপরোক্ত উদাহরণে রবীন্দ্রনাথের **'বলাকা'** কাব্যগ্রন্থের অসমপংক্তিক মিত্রাক্ষর ছন্দ যাকে এক ধরণের প্রবহমান পয়ার বলা হয় তার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের মতে —

''সবুজগোষ্ঠীর মধ্যে মিত্রাক্ষরে রবীন্দ্রপ্রভাবের যে সূত্রপাত, তা গদ্যকবিতার ছন্দেও পরবর্তী ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে।''[৩৮]

সুতরাং ওড়িয়া সবুজগোষ্ঠীর কবিদের উপর অনিবার্য রূপে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব পড়েছে। যেভাবে হিন্দি, অসমিয়া, কন্নড়, তেলেগু, মারাঠী ইত্যাদি প্রাদেশিক সাহিত্যের কবিগণ রবীন্দ্রনাথকে সাগ্রহে ও সানন্দ চিত্তে বরণ করে নিয়েছিলেন ঠিক অনুরূপভাবে প্রথাকে ভাঙ্গতে গিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের অতলান্ত কাব্যসুধায় অবগাহন করেছেন ওড়িয়া সাহিত্যের সবুজযুগের কবিগণ। **''রবীন্দ্র প্রভাবরে সবুজ কবিগণ নিজকু আলোকিত করিবা পাঁই চাহিথিলে। সেথি পাঁই যৎপরোনাস্তি চেষ্টা মধ্য করিথিলে। সে মানঙ্কর সাহিত্যসৃষ্টি থিলা অত্যন্ত সীমিত। সফলতা কেতে মিলিব এহা ন বিচার করি রবীন্দ্রচেতনার এই মহার্ঘ্য দিগটিকু নিজ রচনারে ফুটাইবা পাইঁ সে মানঙ্কর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়।''**[৩৯]

বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রবির আলো বাংলার সাহিত্য গগন হতে প্রতিবেশী ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে। ওড়িশার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এবং ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক অনেকটা নিবিড়। রবীন্দ্রচেতনা ওড়িশার শিল্প ও সাহিত্য জগতে বিপুল সাড়া ফেলেছে এবং ওড়িয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি রবীন্দ্র ভাবনাকে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের সাথে সাথে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওড়িয়া ভাষান্তর বিপুল পরিমান চলছে। বিশ্বভারতীর ওড়িয়া বিভাগের অধ্যাপক এবং কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনামূলক চর্চা ও রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ ও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা চক্রের আয়োজন করে থাকেন। আমাদের বিশ্বাস ওড়িয়া ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার এই ধারাটি ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.), প্রত্যয় প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৪৩০।

২. দ্রষ্টব্য ঃ অবন্তী দেবী, ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নব যুগ, পৃষ্ঠা - ১২২।

৩. দ্রষ্টব্য ঃ প্রশান্তকুমার পাল, রবীজীবনী (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪১৯, পৃষ্ঠা - ২৫১

৪. দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০৫, পৃষ্ঠা - ৬৪১।

৫. দ্রষ্টব্য ঃ মৃণালকান্তি দাস, প্রগতি ভাবনা ঃ বাংলা কবিতা ও ওড়িয়া কবিতা, দে পাবলিকেশনস্, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৮৯।

৬. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪১৭, পৃষ্ঠা - ৮৬।

৭. দ্রষ্টব্য ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ২৫।

৮. দ্রষ্টব্য ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৫।

৯. দ্রষ্টব্য ঃ শেখর ভৌমিক, ওড়িয়া উপন্যাসের ভগীরথ, রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ জুন, ২০০৮।

১০. দ্রষ্টব্য ঃ হরিহর মহাপাত্র, জীবন ও জীবিকা, নালন্দা, বিনোদবিহারী, কটক, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ৪১১।

১১. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, 'সমাজ পত্রিকা', বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৭৬ জুন, পৃষ্ঠা - ২৩।

১২. দ্রষ্টব্য ঃ মৃণালকান্তি দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ১০০।

১৩. দ্রষ্টব্য ঃ সুমিতা চক্রবর্তী, বাংলা আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ১৫৬।

১৪. দ্রষ্টব্য ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩১।

১৫. দ্রষ্টব্য ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়, সবুজপরী (কবিতা), সবুজ অক্ষর, পৃষ্ঠা - ২৯।

১৬. দ্রষ্টব্য ঃ মায়াধর মানসিংহ, ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থমন্দির, কটক, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৮৭।

১৭. দ্রষ্টব্য ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২১।

১৮. দ্রষ্টব্য ঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ২৬।

১৯. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, ওড়িয়া সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), 'কোরক' পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৪১৭, পৃষ্ঠা - ৮৭।

২০. দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ (পত্রিকা), ৮ই মে, ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ১।

২১. দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক প্রজাতন্ত্র (ওড়িয়া সংবাদ পত্র), ৩১শে জুলাই, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা - ২।

২২. দ্রষ্টব্য ঃ কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অঙ্গে যাহা নিভাইছি (আত্মকথা), কটক স্টুডেন্টস্ স্টোর, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ৪৪৫।

২৩. দ্রষ্টব্য ঃ কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, অঙ্গে যাহা নিভাইছি, কটক স্টুডেন্টস্ স্টোর, বালুবাজার, কটক, ২০০৬, পৃষ্ঠা - ৩০৭।

২৪. দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৩০৮।

২৫. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ৮৮।

২৬. দ্রষ্টব্য ঃ 'উৎকল সাহিত্য' পত্রিকা, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৪৪, পৃষ্ঠা - ৩৮।

২৭. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ৮৯।

২৮. দ্রষ্টব্য ঃ বিছন্দ চরণ পট্টনায়ক, কবীন্দ্র বন্দনা (কবিতা), উৎকল সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৪৪, বৈশাখ সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ৭।

২৯. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ৮৯।

৩০. দ্রষ্টব্য ঃ অন্নদাশঙ্কর রায়, শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ), 'সহকার' পত্রিকা, ১৩৩২, মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ২।

৩১. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ৯০।

৩২. দ্রষ্টব্য ঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ৯১।

৩৩. দ্রষ্টব্য ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, ওড়িয়া সাহিত্য, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, শ্রাবণ, পৃষ্ঠা-৫৭।

৩৪. দ্রষ্টব্য ঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ৬৩।

৩৫. দ্রষ্টব্য ঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৬৪।

৩৬. দ্রষ্টব্য ঃ জানকীবল্লভ মহান্তি, ওড়িয়া সাহিত্য পরিক্রমা, গ্রন্থমন্দির, কটক, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৮৮।

৩৭. দ্রষ্টব্য ঃ বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, বৈকুণ্ঠ গ্রন্থাবলী, 'জীবনী ও কৃতি' অংশ, উৎকল সাহিত্য সমাজ, কটক, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা - ৫৬।

৩৮. দ্রষ্টব্য ঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৭১।

৩৯. দ্রষ্টব্য ঃ স্নিগ্ধা বিশ্বাস, সবুজ কবি ও বৈকুণ্ঠনাথ, বিদ্যাপুরী, কটক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০৬, পৃষ্ঠা - ১৫৮।

1. Rabindranath Tagore, on the edges of time, Page - 43.
2. K. C. Bhunia, Impact of Rabindranath on Odia literature, Nameless Recognition, Page - 17
3. Do
4. Do
5. Do
6. Prabhat Mukherjee, Tagore in Orissa, Prajatantra Prachar Samiti, Cuttack, 1966, Page - 22.
7. K. C. Bhunia, Impact of Rabindranath on odia literature, Nameless Recognition, Page - 17.

সপ্তম অধ্যায়

ফলকথা ঃ এইকালে এই জাতীয় সাহিত্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

সপ্তম অধ্যায়
ফলকথা ঃ এইকালে এই জাতীয় সাহিত্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

এইরূপ গবেষণাকর্ম থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কী দাবি করে বা সারস্বত বাঙালির ঋদ্ধ ও প্রাপ্যবস্তু কী আছে এই গবেষণা তা সঠিক নির্ণয় করতে পেরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দ্বিভাষিক বাঙালির দ্বিতীয় ভাষা যা সরকার স্বীকৃত নয়, সেই ভাষায় চারশো বছরের একটি সাহিত্যচর্চার স্বরূপ তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে। হতে পারে ওড়িয়া ভাষা, কিন্তু সেই ভাষার উপভোক্তা মণ্ডলী বাংলার মূল ভূ-খণ্ডের অধিবাসী। মূলত অন্যভাষার সাহিত্যকে উপভোগ করবার জন্য এবং জানবার জন্য প্রতিবেশী সাহিত্যচর্চা করা হয়। কোন না কোন অনুবাদ সমিতি বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টায় এই কাজ চলতে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রতিবেশী সাহিত্যচর্চার প্রয়াস দেখতে পাই খুব বেশি হলে উনিশ শতক থেকে এর পূর্বে নয়। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান নয় একটি সংহত সমাজ তাদের সরকারি ভাষাকে ব্যবহার না করে প্রতিবেশী ওড়িয়া ভাষার দ্বারা প্রায় তিনশ বছর (দ্বিতীয় ভাষায়) সাহিত্যের চর্চা করে আসছে তার একটি দলিল এই গবেষণার দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কোন সুনাম অর্জন বা তাগিদ নয়, কোন প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য নয়, একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাগত আবেগ ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুর বা বাংলা প্রান্তবর্তী ওড়িশার জনজীবনকে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন করেছে ও করে চলেছে তা প্রতিবেশী সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে উল্লেখের দাবী রাখে বলে আমরা মনে করি।

বঙ্গপ্রদেশে ওড়িয়া ভাষার অস্তিত্ব কতখানি বা কবে থেকে বাংলার ভূখণ্ডে ওড়িয়া ভাষা তার আধিপত্য বিস্তার করেছে তার পূর্বাপর ইতিহাস আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। ওড়িয়া ভাষার প্রতি বাঙালির দৌর্বল্য তা আসলে রাজনৈতিক সীমারেখার বারম্বার পরিবর্তন জনিত ঐতিহাসিক কারণকে মূলত দেখানো হয়েছে। অপরদিকে বাংলা ভাষার প্রতি ওড়িশাবাসীর যে অনুরাগ তার অন্যতম কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রেমময় শ্রীচৈতন্যকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষাকেও যে ভালোবেসে ফেলা যায় ষোড়শ শতকে ওড়িশাবাসী তার নিদর্শন রেখেছেন তাদের ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। সুতরাং বাঙালি ওড়িয়া ভাষাকে মননের মধ্যে আজন্ম ও আবহমান কাল থেকে স্থান দিয়েছে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণের জন্য। অবশ্যই সাংস্কৃতিক কারণও আছে। অপরদিকে ওড়িশাবাসী

তাঁদের পছন্দের ও ভালোবাসার ভাষারূপে বাংলাকে বেছে নেওয়ার জন্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল অন্যতম। সাংস্কৃতিক কারণটি ছিল এইরূপ; মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি ও সম্ভার সেদিন ওড়িয়া কবিকূল তা দেখে নির্লোভ থাকতে পারেননি। অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু করেছিলেন ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্যের চর্চা এবং ওড়িয়া ভাষায় সেইসকল জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ। ওড়িশায় এই ধারাটি অবশ্য স্তিমিত হয় উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ভাষাগত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে। ধর্মীয় কারণ রূপে আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের প্রভাব ও স্পর্শে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ওড়িশাবাসীর অনুরাগের দিকটিকে। হয়তো এই প্রচেষ্টার মধ্যে বাংলাভাষার সঙ্গে ওড়িয়া শব্দের বিমিশ্রণ আছে। বিনীত ভাবে '**ভুবনমঙ্গল**' কাব্যের কবি রঘুনাথ দাস তাঁর কাব্যের এক স্থানে বলেছেন—

> **''অবনী আনন্দ হইল দিগ পরিমল।**
> **রঘুনাথ দাস ভণে ভুবনমঙ্গল।।**
> **ওড্রদেশী হইয়া কৈল বঙ্গলা বর্ণন।**
> **না লইবে বচন দোষ সব সাধুজন।।**
> **যইসনে তুলসী গান্থিয়া নিজ পটে।**
> **না লয়ে তা দোষ দেবে ভূষণ মুকুটে।।**
> **তৈছে ব্রজলীলা গান্থি ওড়িয়া বঙ্গালে।**
> **একত্র করিয়া এহু ভুবন মঙ্গলে।।"**

সুতরাং ওড্রদেশী কবি তাঁর বাংলা ভাষার বাচনিক ত্রুটীর কথা স্বীকার করে নিয়ে সাধুজনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তবে একথা সত্যি যে, ওড়িশার কবিকুল আক্ষরিকভাবে বাংলা লিখন ও পঠনের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। বাংলা ভাষা শুনে তাঁদের একটি বাচনিক দক্ষতা সৃষ্টি হয় এবং ওড়িয়া লিপিতে সেই বাচনিক দক্ষতাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সৃষ্টির এ এক অভিনব তাগিদ। আমাদের গবেষণাকর্মের মাধ্যমে এই অভিনব প্রচেষ্টাকে মূল্যায়িত করবার চেষ্টা করেছি। কঠিন পাড় বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও সেই পাড়ের সহস্র রন্ধ্রপথের মাধ্যমে দুই পুষ্করিণীর জলের যেমন পারস্পারিক আদান-প্রদানের চোরাস্রোতে চলে, দুই প্রদেশের ভাষাও ঠিক সেইভাবে সীমান্তের বেড়াজাল টপকে গমনাগমন করতে পারে বা সহিষ্ণুতার আদান-প্রদান চালাতে পারে।

আমাদের এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে দুই প্রতিবেশী ভাষার পারস্পারিক অভিমুখীনতা ও আলিঙ্গনকে আমরা স্পষ্টভাবে ধরতে পেরেছি।

একটি নির্দিষ্ট ভাষিকবৃত্তের সীমানা পেরিয়ে ভাষা যখন অপর ভাষিকবৃত্তে অনুপ্রবেশ করে তখন নতুন রাষ্ট্র বা রাজ্য সেই ভাষাকে বাচনিক ভাবে ব্যবহার করলেও তার লিপিটাকে সহজে আয়ত্ব করতে পারে না। যদিবা দীর্ঘ অভ্যাসে কোন অপরিচিত লিপিকে লেখা সম্ভব হয় — কিন্তু প্রশাসনিক তাগিদে তার কোন প্রয়োজন থাকে না। সেই আয়ত্ব করা নতুন ভাষাকে মৌখিক মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়না। দীর্ঘদিন মৌখিকভাবে ব্যবহারে ভাষার বিমিশ্রণ ঘটে। যার ফলে নবাগত ভাষার লিপ্যন্তর হয়। অনুরূপভাবে মেদিনীপুরের মানুষ ওড়িয়াকে মৌখিকভাবে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি তাকে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর করার চেষ্টা করেছে। দুই ভাষার শব্দগত আদান-প্রদান কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

> ***“ভাষায়-ভাষায় শব্দের আদান-প্রদান হয়। ভৌগোলিক বিচারে যেসব ভাষা দূরবর্তী, তাদের মধ্যেও চলে এরকম লেনদেন। অতএব যে কথা একটি লিপিতে লেখা হতো একটি ভাষায়, সেই কথাটি লেখার দরকার অন্যভাষার ব্যবহারকারীদেরও।”[১]***

ফলে অন্যভাষার ব্যবহারকারীরা তাদের লিপিতে প্রতিবেশী ভাষাকে লিপ্যন্তর করতে শুরু করে। এই কাজ সীমান্তবর্তী বাংলা ও ওড়িশার কবিরা করবার চেষ্টা করে গেছেন।

প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের ভাষা-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি এবং অতীত ইতিহাসের অনুসন্ধান। এই অধ্যায়ে রাষ্ট্র আরোপিত সরকারি ভাষা ব্যতীত বাঙালির তথা সকল ভাষাভাষীর যে একটি প্রান্তিক সত্তা থাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। সরকারিভাবে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের দ্বিতীয় ভাষা যে ওড়িয়া বা ওড়িয়া মিশ্রিত বাংলা তা এই গবেষণায় উঠে এসেছে। এই মৌখিক ভাষা সম্পূর্ণভাবে ওড়িয়া না হলেও বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্রিত একটি প্রাণবন্ত অকৃত্রিম ভাষা -যে ভাষাকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **‘সুহ্মক বাঙ্গলা’**[২] যেমন বলেছেন অপর দিকে ওড়িয়া উপভাষার শ্রেণিগত বিভাজনে একে **‘উত্তরা ওড়িয়া’** উপভাষা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাইহোক বাংলা এবং ওড়িয়া ভাষার একটি মিশ্র বৈশিষ্ট্য থাকায় এই ভাষা সাধারণ বাঙালির কাছে **‘মেদিনীপুরিয়া ওড়িয়া’** নামে পরিচিত।

আসলে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় ধ্বনিগত সাদৃশ্য প্রবল থাকায় বাঙালির কানে এই ভাষা ওড়িয়া ভাষার মতো শোনায় অপরদিকে মেদিনীপুর প্রান্তবর্তী বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ জেলায় এই ভাষা ওড়িশাবাসীর কানে বাংলা ভাষার মতো শোনায়।

ওড়িশার সীমানা বরাবর বাংলার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে ওড়িয়া ভাষায় কথোপকথন এবং ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বেশি পরিমান নারীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই এলাকায় ভাষাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে নারীর একটি ভূমিকা আছে। বৈবাহিক সূত্রে ওড়িয়া কন্যার বাঙালি বাড়িতে বধূ রূপে আগমন ঘটে এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মুখে ওড়িয়া ভাষা আরোপ হতে থাকে। অপর ক্ষেত্রে বাঙালি কন্যার ওড়িয়া পরিবারে গমন এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বাংলা ভাষা বেচে থাকে —অন্যান্য কারণগুলির সাথে এই দুটি কারণও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ওড়িশার গঙ্গো ও সূর্যবংশের রাজত্বকাল থেকে ইংরেজ শাসনকাল পর্যন্ত প্রশাসনিক সীমানার বারম্বার বিন্যাসের ফলে অর্থাৎ বাংলা ও ওড়িশার সীমারেখার রদবদল হওয়ার ফলে দুই প্রদেশের সীমান্তবর্তী সংস্কৃতির উপর প্রভাব পড়ে, প্রভাব পড়ে তার ভাষার উপর। তখন ভাষা হয় রূপান্তরধর্মী অর্থাৎ যখন যেমন তখন তেমন। মেদিনীপুরের মৌখিক ভাষার উপর এইরূপ ঐতিহাসিক অভিঘাত পড়ায় স্বতন্ত্র বর্ডার ল্যাঙ্গুয়েজ সৃষ্টি হয়েছে। সেই ভাষার মধ্যে দুই প্রদেশের দুই ভাষার মিশ্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলে এই এলাকার মানুষের কাছে তিন প্রকার ভাষাসাহিত্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, যেমন — ক. সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্য, খ. সম্পূর্ণ ওড়িয়া সাহিত্য এবং গ. বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্র সাহিত্য। এইসব সাহিত্যের প্রকাশের ক্ষেত্রে **'নীহার প্রেস'** -এর মতো ক্ষুদ্র ছাপাখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আমরা তুলে ধরতে পেরেছি। গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ওড়িয়া সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা ও ওড়িয়া মিশ্রিত সাহিত্যের বিবরণ তুলে ধরে বিশ্লেষণ করতে পেরেছি।

গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লোকসাহিত্যের ভিন্ন ধারার লিখিত রূপের পরিচয় উপস্থাপনে উঠে এসেছে সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের সমসাময়িক ঘটনা, অবৈধ সম্পর্ক, জনপ্রিয় দেব-দেবতার মাহাত্ম্য, নারী সমস্যা কেন্দ্রিক প্রসঙ্গ ইত্যাদি। এইসব সাহিত্য লোকরুচির দিক থেকে পপুলার লিটারেচার। সাহিত্যগুলির পপুলারিটি অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই জনজীবনের লোকবিনোদনের স্বরূপকে সামনে আনতে পেরেছি। বছর বছর ধরে এই জনপ্রিয় সাহিত্যগুলি মানুষের মুখে মুখে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে প্রচলিত আছে। স্বল্প শিক্ষিত প্রতিভাবান মানুষেরা

কেউ কেউ এইসব সাহিত্যকে লিখিত রূপে সংকলিত করে লোকসাহিত্য সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই প্রতিভাবান স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা গ্রন্থগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজের নাম ও পরিচিতি আড়াল করে গেছেন লোকলজ্জার ভয়ে। স্বাভাবিক ঘটনা এই যে, সমাজের অবৈধ সম্পর্কের কথা অবলীলায় উপস্থাপন করতে গেলে চক্ষুলজ্জায় পড়তে হয় — কবিরা এক্ষেত্রে তাই নিজেদের নাম পরিচিতি আড়াল করে গেছেন। এই কবিদের রুচিগত মানসিকতার তারিফ না করলেও তাঁরা যে অলিখিত লোকগানগুলির লিখিত সংকলন প্রকাশ করে লোকসংস্কৃতি চর্চার উপকার সাধন করেছেন এর জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। সাহিত্যগুলির বিষয়বস্তু বহুলাংশে পুরাণ থেকে নেওয়া হলেও কবিগণ পুরাণকে লৌকিক অনুষঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এই সাহিত্যগুলির মাধ্যম গান। গেয়রীতিতে সাহিত্যগুলি পরিবেশিত হয়। পুরাণ বিষয়ক ব্রতকথা বা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক রচনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষপথের সন্ধান দেওয়া। নারীদের মধ্যে এই ধর্মীয় সাহিত্যগুলির পাঠানুগ্রহ বেশি করে লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে লৌকিক বিষয়বস্তু ও কৌতুকপূর্ণ আদিরসাত্মক সাহিত্যগুলির উপভোক্তা মূলত পুরুষরাই ছিল। কারণ এই কৌতুকরসের সাহিত্য নারীমহলে নিষিদ্ধ ছিল। সাহিত্যগুলিকে লোকসাহিত্যের ভিন্নধারার লিখিত রূপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ এই সাহিত্যগুলি সম্পূর্ণ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞার মধ্যে পড়েনা। এই গ্রামীণ সাহিত্যগুলির মধ্যে মার্জিত ও বিদগ্ধ সংস্কৃতির ছাপও আছে। সমালোচকের ভাষায় —

> ***"এই যে গ্রামীণ সাহিত্য, একে আদিম সমাজের অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস বলতে পারিনি। একে মনে হয় মার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতির অনালোকিত শাখা বলা সঙ্গত। একটি কোন সংজ্ঞায় একে বাঁধা যাবে না বা একটি কোন ইজম্ বা 'বাদ' এর শ্রেণীতেও এদের ফেলা যাবেনা। এদের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। স্বল্পায়ু কিন্তু মূল্যহীন নয়। স্বল্পাক্ষর তো বটেই, কিন্তু এগুলির প্রভাব গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক।"[৪]***

সাহিত্যগুলির ভাষাগত গুরুত্ব স্বীকার করে তাদের সাহিত্যমূল্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যের কথা স্বীকার করে গেছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — আমাদের গবেষণার দ্বারা এই তথ্য উঠে এসেছে এবং সুনীতিকুমারের অভিমতের যাথার্থ্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি। বাংলা হরফে যে ওড়িয়া সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলি মূলত ওড়িশা সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত সেগুলিকে **'কম্যুনিটি লিটারেচার'** বলে পরিচিতি দিয়েছেন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। তিনি বলেছেন যে —

"এই শ্রেণীর গ্রামীণ সাহিত্যকে কম্যুনিটি লিটারেচার আখ্যা দেওয়া যায়। বিদেশে এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে গদ্য অন্তর্ভুক্ত কিন্তু স্বদেশে এগুলির রূপ কাব্যিক। আমার বিশ্বাস এই শ্রেণীর প্রকাশিত রচনাগুলির যথাসম্ভব সংগ্রহ আর আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়টিকে সম্পূর্ণতা দেবার একান্তই প্রয়োজন।"[৫]

ওড়িশা প্রান্তবর্তী মেদিনীপুরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গরূপ ফুটিয়ে তুলতে এই পপুলার লিটারেচার বা গ্রামীণ সাহিত্য কিংবা কম্যুনিটি লিটারেচারের বড় রকমের অবদান আছে। গবেষণা পত্রের মাধ্যমে এইসব সাহিত্যের সাংস্কৃতিক গুরুত্বটিকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে এক অভিনব সাহিত্যচর্চার নিদর্শন তুলে ধরে সেই সাহিত্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্যচর্চার তিনশ বছরের এক অভিনব প্রয়াসের মূল্যায়ণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই নতুন সাহিত্যধারার সূত্রপাত হয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্পর্শে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ওড়িয়া কবিপঞ্চকের মাধ্যমে। যাঁরা মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন এবং ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদেরকে **'পঞ্চসখা'**[৬] বলা হয়। এই **'পঞ্চসখা'** কবি ব্যতীত অন্যান্য কবিকূল ছিলেন যাঁরা ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন তাঁদের কাব্যপ্রতিভার মৌলিকতা অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছি। এই সাহিত্য ধারা সুউচ্চে অবস্থান করে সপ্তদশ শতকে এবং অষ্টাদশ শতক থেকে এই সাহিত্যধারার রেখাচিত্রটি ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হয়ে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ওড়িশার ভাষাগত জাতীয়তাবোধের অভিঘাতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

আমরা এই গবেষণায় এইরূপ সাহিত্যের উদ্ভবের সঠিক কারণগুলি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া এই ধারাটি কেনইবা ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিলীন হয়ে যায় সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি। প্রেমের ঠাকুর চৈতন্যদেবকে ভালোবাসার সাথে সাথে তার ভাষাকেও যে ভালোবেসে ফেলা যায় উৎকলের কবিরা তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মাতৃভাষা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে কাব্যরচনার নজির ভারতবর্ষের অন্যকোন প্রদেশে লক্ষ্য করা যায় না। আমরা বহিঃর্বঙ্গে অর্থাৎ আরাকান রোসাঙ রাজসভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার নিদর্শন সপ্তদশ শতকে লক্ষ্য করেছি। আরাকান রাজ্যে বাংলার ব্যবহার বা প্রচলন ছিল, কবিদের পিছনে ছিল শাষকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতা। এর ফলে রোমান্টিক প্রণয়গাথার মতো বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। সুতরাং রোসাং রাজসভায় বাংলাসাহিত্য সম্ভবের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকে ওড়িশায় বাংলাকাব্য

সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহাপ্রভু ব্যতীত দ্বিতীয় কোন অনুকূল পরিবেশ ছিলনা। একজন অম্লান পুরুষ তাঁর হীরণ্ময় দ্যুতিতে বাংলা ভাষা সাহিত্যের তিনশ বছরের ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করে যেতে পেরেছিলেন। সুতরাং এই অধ্যায়ে বহির্বঙ্গে অবাঙালি প্রতিভার দ্বারা বাংলা কাব্যচর্চার স্বতন্ত্র ধারাটিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রকম একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার পরিচয় তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য। সুতরাং গুরুত্বের কথা ভেবে সাহিত্যগুলির বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সারস্বত বাঙালির নজরে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সাহিত্যচর্চার পূর্ববর্তী গবেষক বিষ্ণুপদ পাণ্ডা তাঁর গবেষণার মাধ্যমে প্রথমে বাঙালির সমক্ষে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করলেও আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওড়িয়া কবিদের বাংলা কাব্যচর্চার ধারাটির কথা অনুল্লিখিত আছে। তাই এই গবেষণার মাধ্যমে পুনরায় বাঙালির চিন্তা-চেতনার আলোকে বিষয়টি আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। ওড়িয়া কবিদের অবদানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অধ্যাপক পাণ্ডা বলেছেন যে —

> ***"The Bengali works of the Oria poets are true to life and are successful literatures creations. By their literary work extending over a period of three hundred years, the Oria poets added a new chapter to the history of their synthetic tradition of culture and at the same time enriched the Bengali literature by their valuable contribution."***[1]

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে যেন সাহিত্য গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই গবেষণাপত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ওড়িশা ও ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ। আমরা এই আলোচনার সীমারেখা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছি। ওড়িশার মনোজগতে ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ কীরূপে প্রভাব বিস্তার করেছে তার তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যের ওড়িয়া অনুবাদের কালানুক্রমিক বিবরণ তুলে ধরে প্রতিবেশী ওড়িয়া সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবশ্যম্ভাবী গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে ওড়িয়া সাহিত্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের বিষয়টি। ওড়িয়া আধুনিক কাব্যচর্চার ধারায় **'সবুজযুগ'** -এর সাহিত্যগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনায় রবীন্দ্রচিন্তাদর্শন কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে গবেষকের স্বাধীন চিন্তাভাবনার দিকগুলি লিপিবদ্ধ আছে।

সম্প্রতিকালে ধর্মে-ধর্মে, ভাষায়-ভাষায় সংঘাতময় আবহে জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভেদ-বিচ্ছেদ লেগে আছে। বিভাষীর প্রতি অমানবিক আচরণ করে আসছে কিছু মানুষ। অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে একে অপরের প্রতি। প্রাদেশিকতা একে অন্যের মনে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই হিংসার পরিণাম কত যে ভয়ানক বিভিন্ন ভাষার আন্দেলন ও ইতিহাসে তা ধরা আছে। আজ এই অন্ধকারে মনে পড়ে বাংলা ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে থাকা ভুবনমোহন জানা, চন্দ্রশেখর ধল, কবি বনমালী, প্রাণকৃষ্ণ, ভাবুকচরণ দাস প্রমুখের কথা, যাঁরা বাংলা লিপিতে সীমান্তবর্তী ওড়িয়া সাহিত্যকে লিপ্যন্তর করে উক্ত অঞ্চলের লোকজীবনের সাহিত্য খোরাক যুগিয়েছেন। মনে পড়ে কাঁথির নীহার প্রেসের দোভাষী কর্মচারীদের কথা, যাঁরা বালেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে এবং ওড়িশা সীমান্তবর্তী মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে ওড়িয়া কাব্যের পুঁথিগুলিকে সংগ্রহ করে বাংলা লিপিতে লিপ্যন্তর করে পুস্তিকাকারে ওড়িয়া ভাষী মেদিনীপুরের সাহিত্য পিপাসু জনজীবনের হাতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। এই সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার আদান-প্রদান যোড়শ শতকের ওড়িশাবাসীরা ওড়িয়া লিপিতে বাংলা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। রায় রামানন্দ, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, ধনঞ্জয় ভঞ্জ, দ্বারিকা দাস, কবি কর্ণ, দ্বিজ রঘুরাম, রঘুনাথ দাস, সনাতন, পিণ্ডিক শ্রীচন্দন, রাজা দিব্যসিংহদেব, জগন্নাথ মহামিশ্র, কবি রামজীবন প্রমুখ যোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতকের কবিদের হৃদয়ে এই সহিষ্ণুতা যদি থাকতে পারে তাহলে একবিংশ শতকে তা কেন হারিয়ে যাবে? শুধু বাংলা-ওড়িয়া নয়, যে কোন প্রদেশের কাঁটাতারের দুদিকে দুটি ভাষার মধ্যে সহিষ্ণু মনোভাব অটুট থাকুক তা আমরা চাই — এই রকম একটি মন নিয়ে পথচলা শুরু করেছিলাম, অনুভব করেছিলাম গবেষণার প্রয়োজনীয়তা।

আমাদের এই গবেষণার দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর আমরা দুটি প্রদেশের ভাষাগত বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও সহিষ্ণুতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে কালে কালে একে অপরের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে আসছে ও আত্মীকরণ করে চলেছে তার একটি সংহতিপূর্ণ চালচিত্র খুঁজে পেলাম। কোনদিন কোন গবেষণা শেষ কথা বলতে পারেনা। কাজটির মাধ্যমে বাংলা ও ওড়িশার আন্তঃরাজ্য সাহিত্যচর্চার একটি ডকুমেন্টেশন উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছি। এই গবেষণা দুই রাজ্যের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে প্রাথমিক সোপান মাত্র। এইরূপ দ্বিতীয় ভাষায় নির্মিত সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর গবেষণার প্রয়োজন আছে। আগামী দিনে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ চিন্তা ভাবনা এই কাজের শূন্যস্থানগুলিকে পূরণ করবে — এই আশা রাখি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য ঃ

১. দ্রষ্টব্য ঃ পলাশ বরণ পাল, প্রবন্ধ ঃ দুই লিপির সংঘাত, অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৮, ১ম সংখ্যা, শারদীয় ১৪২০, পৃষ্ঠা - ১৯৫।

২. দ্রষ্টব্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা - ২৮৫-২৯৮।

৩. দ্রষ্টব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশনী, নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর। ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১১২-১২৩।

৪. দ্রষ্টব্য ঃ বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.), শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রত্যয় প্রকাশনী, পৃষ্ঠা - ৪৩৪।

৫. দ্রষ্টব্য ঃ বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.), পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা - ৪৪১।

৬. দ্রষ্টব্য ঃ নির্মলনারায়ণ গুপ্ত, ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ২২৪-২৩৫।

1. Bishnupada Panda, Orissan Culture - An unknown profile, Bookland International, Bhubaneswar, pg - 116

পরিশিষ্ট

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের প্রতিলিপি, আলোকচিত্র, ফটোকপি ইত্যাদি

১

পুথি চিত্র

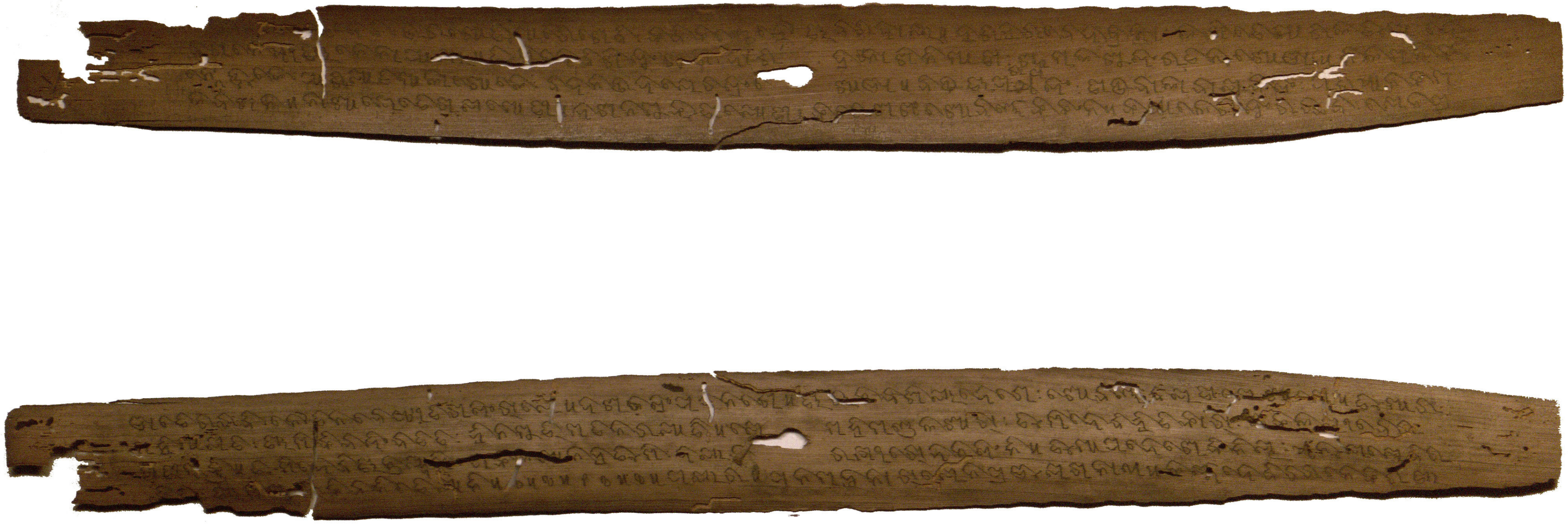

ক. ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত ধনঞ্জয় ভঞ্জ রচিত 'দ্বারিকা পালা' পুথির অংশ বিশেষ। সংগ্রহশালায় পুথিটির নিবন্ধীকৃত সংখ্যা B.50।
(দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৫০)

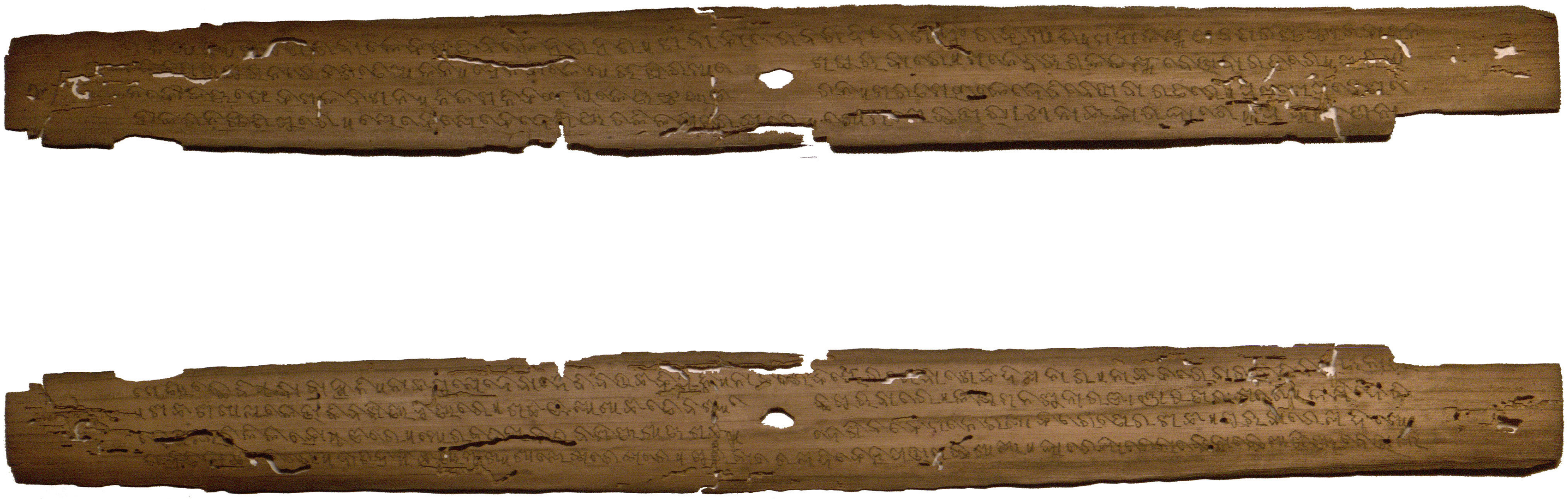

খ. ওড়িশা রাজ্য প্রদর্শশালায় সংরক্ষিত ধনঞ্জয় ভঞ্জ রচিত 'দ্বারিকা পালা' পুথির অংশ বিশেষ। সংগ্রহশালায় পুথিটির নিবন্ধীকৃত সংখ্যা B.50।
(দ্রষ্টব্য, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৫০)

২

অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ওড়িশার অংশ বিশেষ নিয়ে বৃহৎ মেদিনীপুরের মানচিত্র

(বাংলা হরফে ওড়িয়া ও ওড়িয়া হরফে বাংলা সাহিত্যচর্চার নির্দিষ্ট অঞ্চল গবেষকের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত)

ক. ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে রেনেল অঙ্কিত মানচিত্রে ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলার সীমানা পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলা বিস্তৃত ছিল তা ধরা পড়েছে। অধুনা ওড়িশার বালেশ্বর জেলার জলেশ্বর থানার অংশ বিশেষ (ওড়িয়াভাষী জনজীবন) অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি মেদিনীপুরের সীমানাভুক্ত ছিল। সম্প্রতি উক্ত অঞ্চল ওড়িশা রাজ্যের মানচিত্রে অর্ন্তভূক্ত। (দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১০-১১)

ওড়িশা সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মানচিত্র। এই অঞ্চলগুলিতে বাংলা হরফে ওড়িয়া সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত এইরূপ সাহিত্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

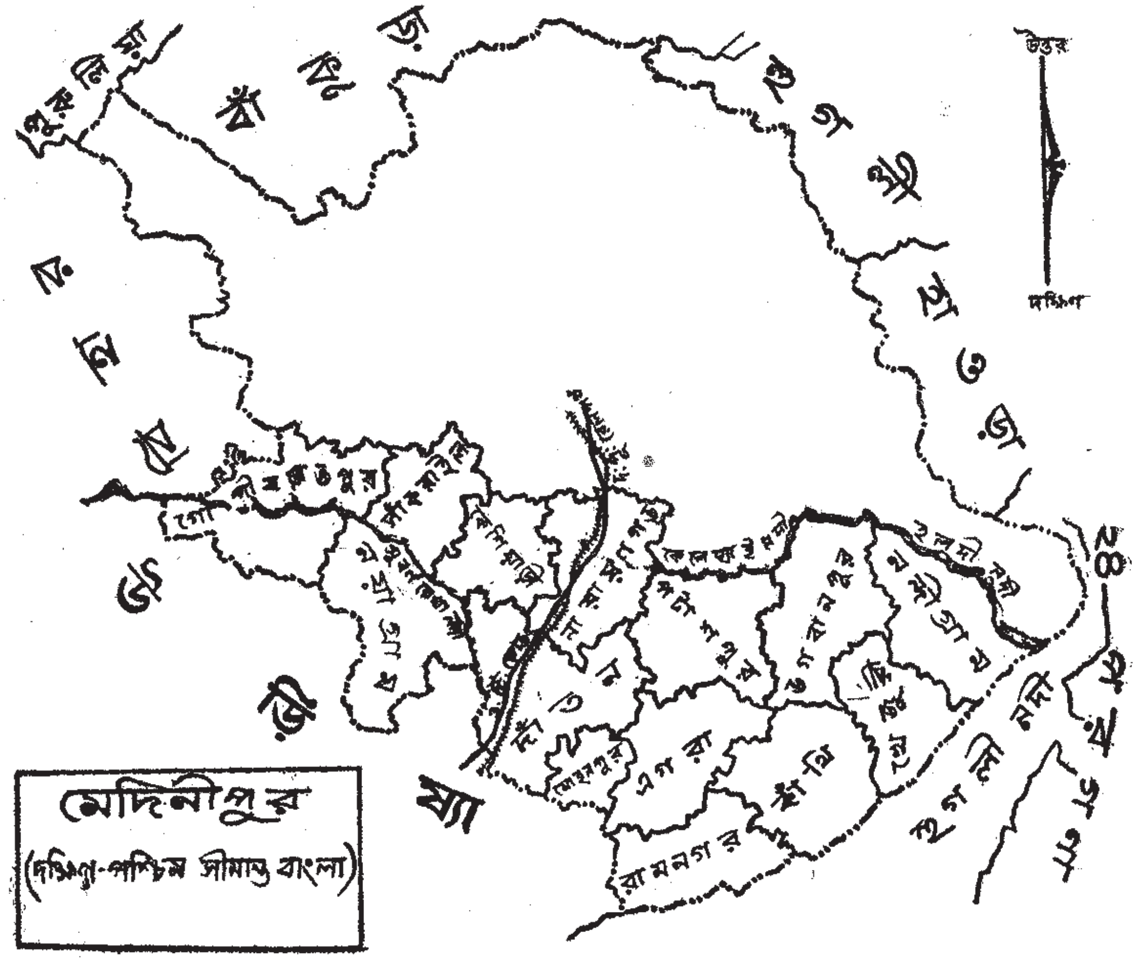

(এই অঞ্চলের মোট আয়তন ৫,৪৯৯.১ বর্গ কিমি.। ভৌগোলিক অবস্থান ২১°৩৬′ ও ২২° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°৩৩′ ও ৮৮°২২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে)

খ. মানচিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি প্রণীত 'দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি' (১৩৯৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। (দ্রষ্টব্য, প্রথম অধ্যায়, 'মৌখিক ভাষা' অংশ, পৃষ্ঠা. ১-১১ এবং 'ভাষা আন্দোলন, ধর্ম ও সাহিত্য' অংশ, পৃষ্ঠা- ১৬)

বাংলা হরফে ওড়িয়া রামায়ণ নির্ভর পুস্তিকা সমূহের প্রচ্ছদপত্র

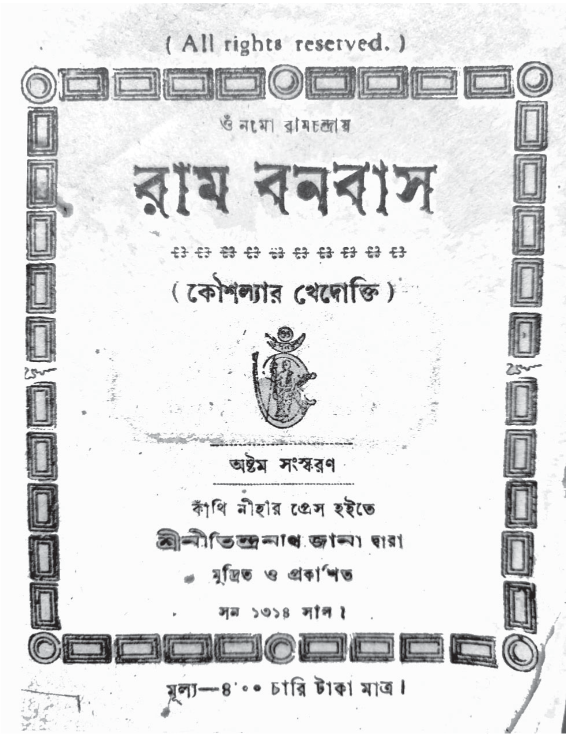

ক. ক্ষেত্রনাথ বিরচিত 'রাম বনবাস'। এই সংস্করণটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩১)

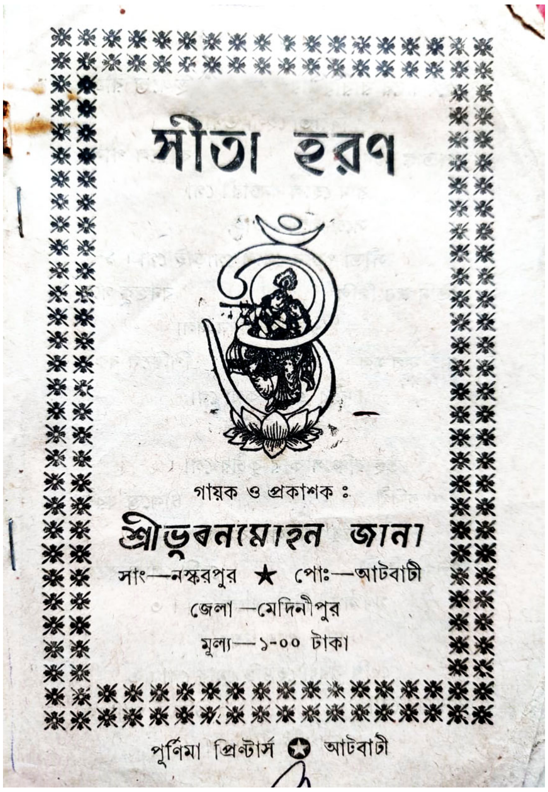

খ. 'সীতাহরণ' কাব্যের কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, আটবাটী, এগরা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩৯)

৪

বাংলা হরফে ওড়িয়া মহাভারত নির্ভর পুস্তিকা সমূহের প্রচ্ছদপত্র

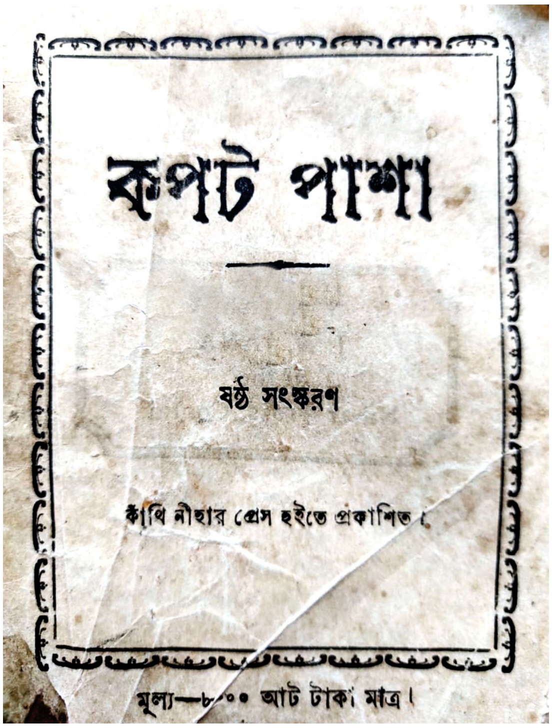

ক. ভীমা ধীবর বিরচিত ‘কপট পাশা’। প্রকাশকাল অনুল্লিখিত ও এই সংস্করণটি নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৬)

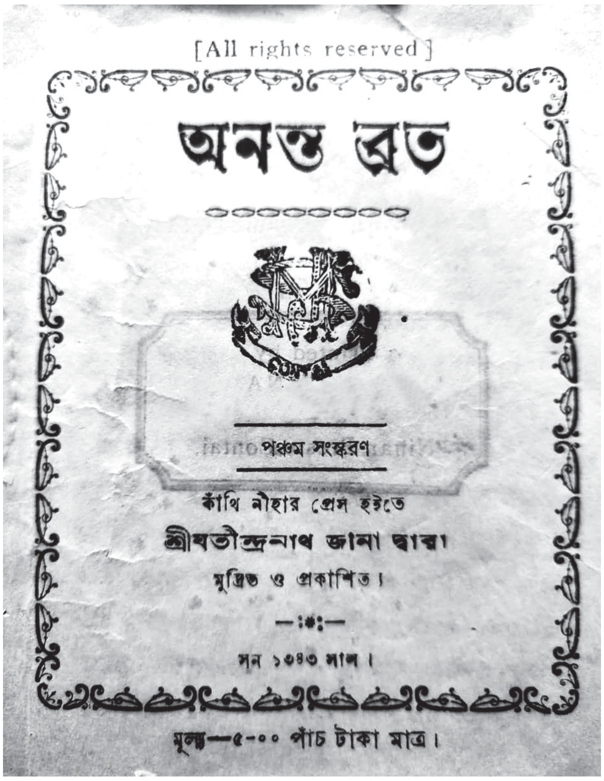

খ. দ্বিজ অনিরুদ্ধ বিরচিত ‘অনন্ত ব্রত’ এই সংস্করণটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৫৪)

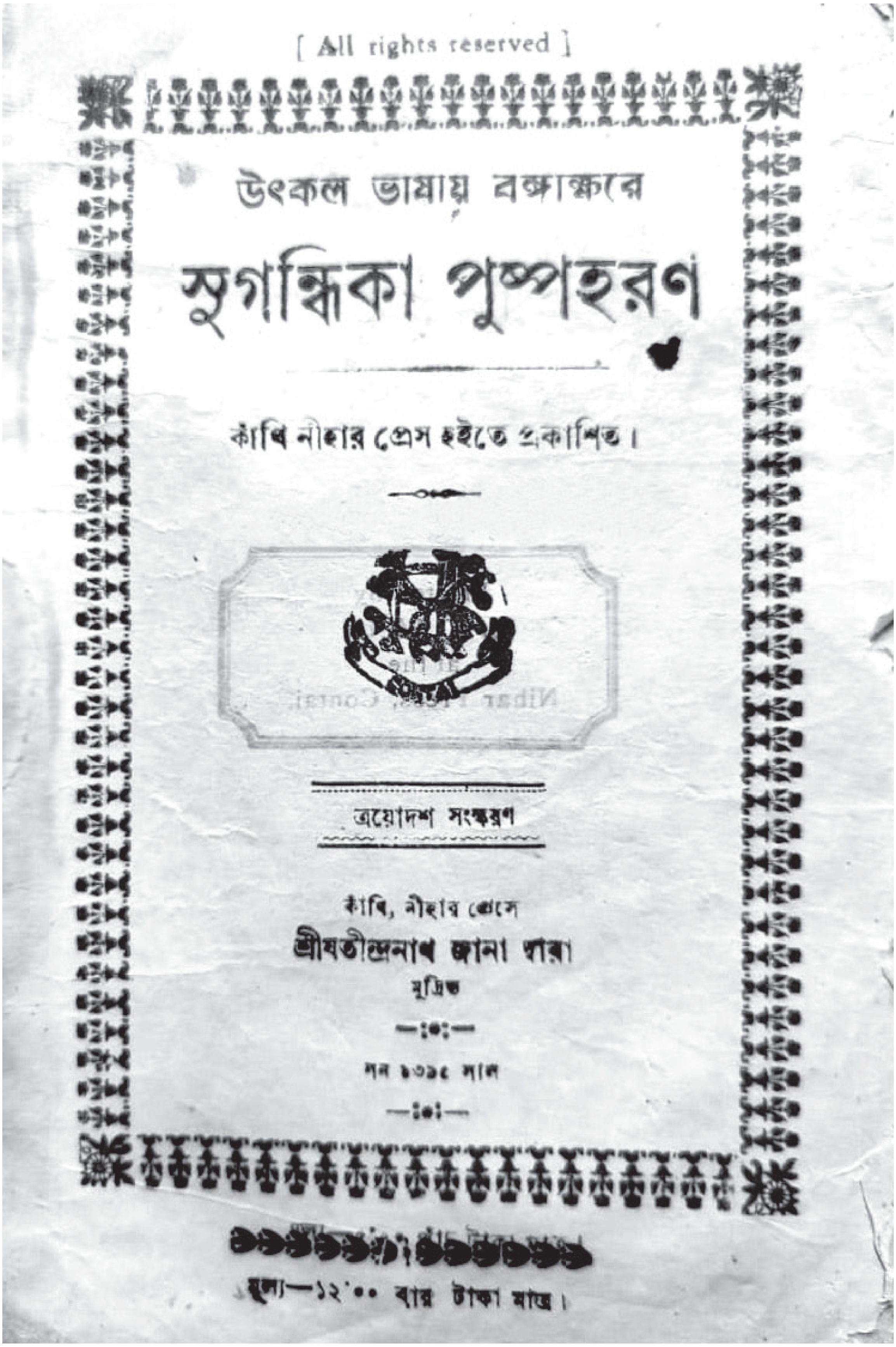
[All rights reserved]

উৎকল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে

সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ

কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত।

ত্রয়োদশ সংস্করণ

কাঁথি, নীহার প্রেসে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা
মুদ্রিত

সন ১৩৯৫ সাল

মূল্য—১২'০০ বার টাকা মাত্র।

গ. শ্রীহরি দাস বিরচিত 'সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ'। এই সংস্করণটি ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৬৩)

৫
বাংলা হরফে ওড়িয়া ভাগবত নির্ভর পুস্তিকা সমূহের প্রচ্ছদপত্র

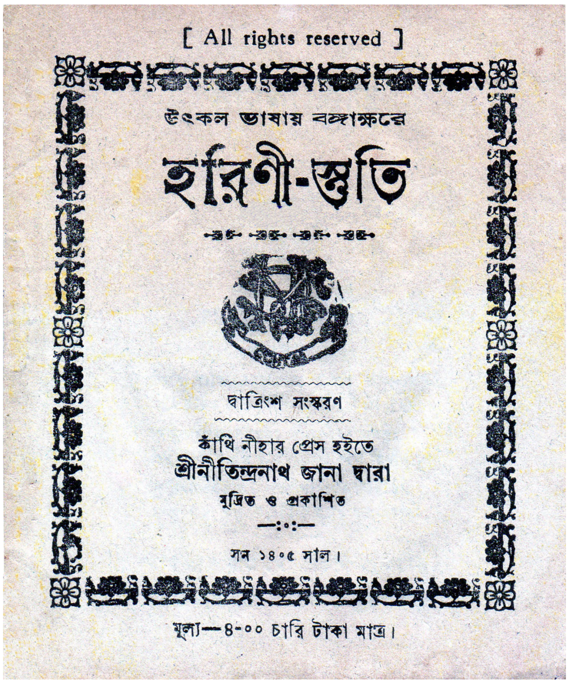

ক. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'হরিণী স্তুতি'। এই সংস্করণটি ১৪০৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৭৮-৮০)

খ. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'গজ স্তুতি'। এই সংস্করণটি ১৪০৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৮০-৮২)

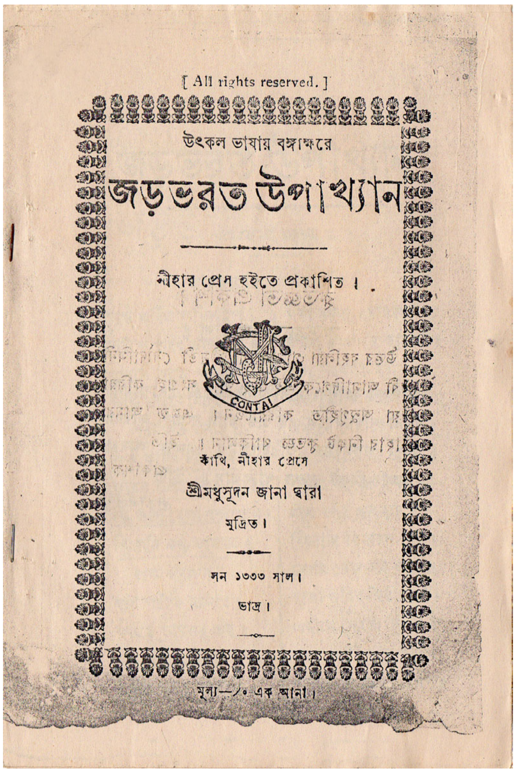

গ. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'জড়ভরত উপাখ্যান'। এই সংস্করণটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৮২-৮৩)

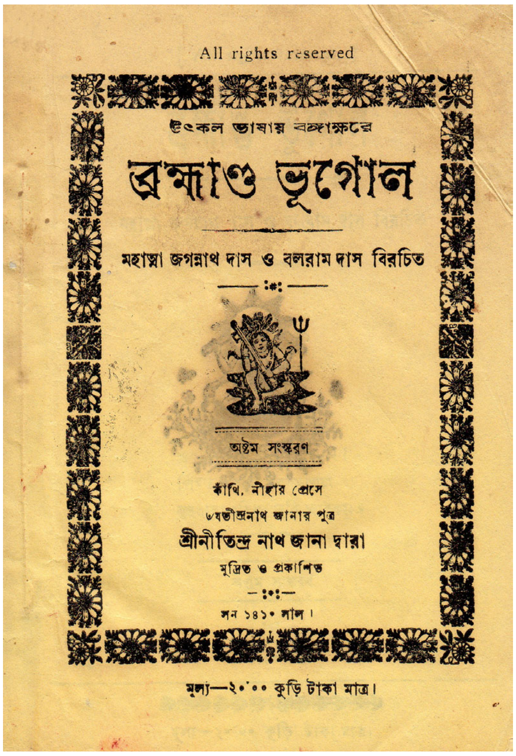

ঘ. বলরাম দাস ও জগন্নাথ দাস বিরচিত 'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল'। এই সংস্করণটি ১৪১০ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৮৩-৮৬)

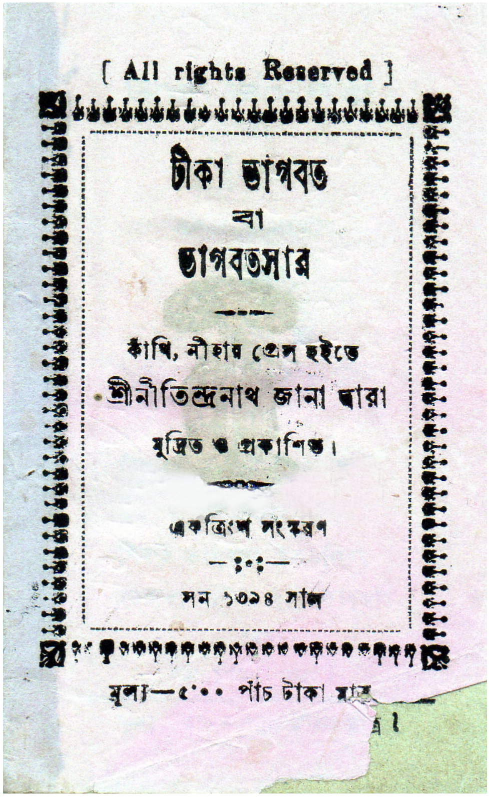

ঙ. জগন্নাথ দাস বিরচিত ‘টীকা ভাগবত বা ভাগবতসার’। এই সংস্করণটি ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৮৬-৯০)

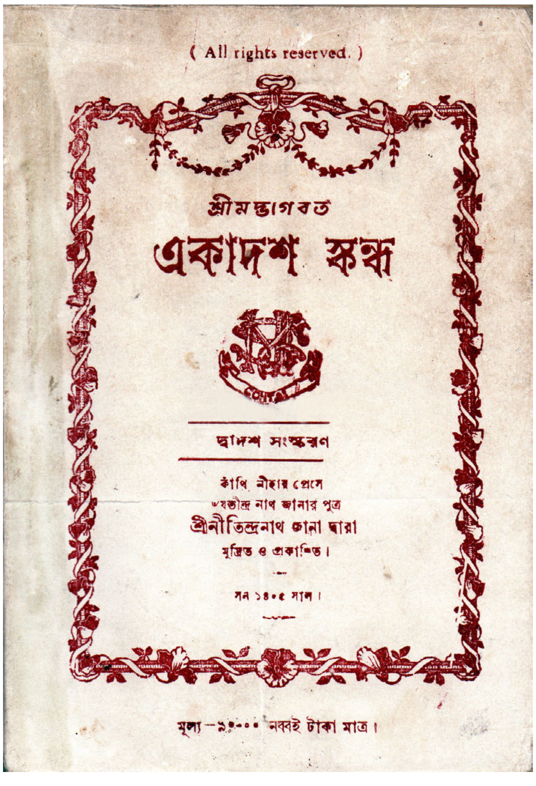

চ. জগন্নাথ দাস বিরচিত ‘শ্রীমদ্ভাগত একাদশ স্কন্দ’। এই সংস্করণটি ১৪০৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯০)

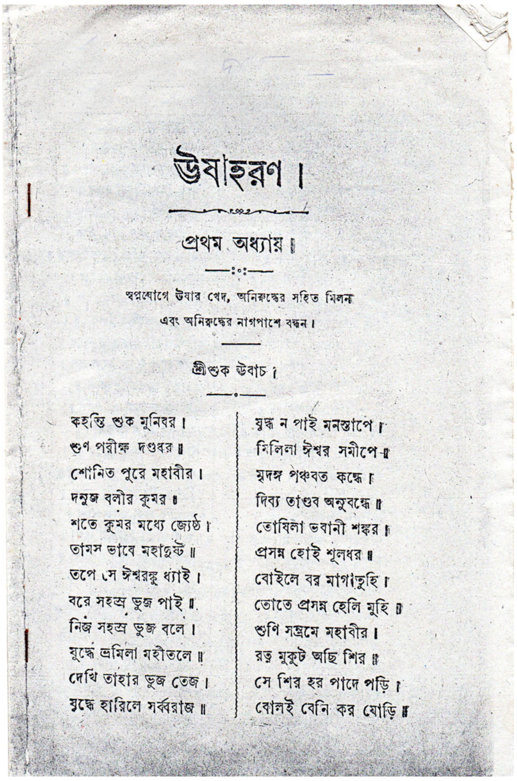

ঊষাহরণ।

প্রথম অধ্যায়।

স্বপ্নযোগে ঊষার খেদ, অনিরুদ্ধের সহিত মিলন
এবং অনিরুদ্ধের নাগপাশে বন্ধন।

শ্রীশুক উবাচ।

কহন্তি শুক মুনিবর।
শুণ পরীক্ষ দণ্ডধর॥
শোণিত পুরে মহাবীর।
দনুজ বলীর কুমর॥
শতে কুমর মধ্যে জ্যেষ্ঠ।
তামস ভাবে মহাহৃষ্ট॥
তপে সে ঈশ্বরন্কু ধ্যাই।
বরে সহস্র ভুজ পাই॥
নিজ সহস্র ভুজ বলে।
যুদ্ধে ভ্রমিলা মহীতলে॥
দেখি তাহার ভুজ তেজ।
যুদ্ধে হারিলে সর্ব্বরাজ॥
যুদ্ধ ন পাই মনস্তাপে।
মিলিলা ঈশ্বর সমীপে॥
মৃদঙ্গ পঞ্চবত কন্ধে।
দিব্য তাণ্ডব অনুবন্ধে॥
তোষিলা ভবানী শঙ্কর।
প্রসন্ন হোই শূলধর॥
বোইলে বর মাগ তুহি।
তোতে প্রসন্ন হেলি মুহি॥
শুণি সম্ভ্রমে মহাবীর।
রত্ন মুকুট অছি শির॥
সে শির হর পাদে পড়ি।
বোলই বেনি কর যোড়ি॥

ছ. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'ঊষাহরণ'। মূল পুস্তিকাটি পাওয়া যায়নি। নীহার প্রেসের সংগ্রহ থেকে ফটোকপি করে নেওয়া হয়েছে। প্রচ্ছদপত্র ছিন্ন হওয়ার কারণে এই পুস্তিকার প্রকাশকাল বা অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯০)

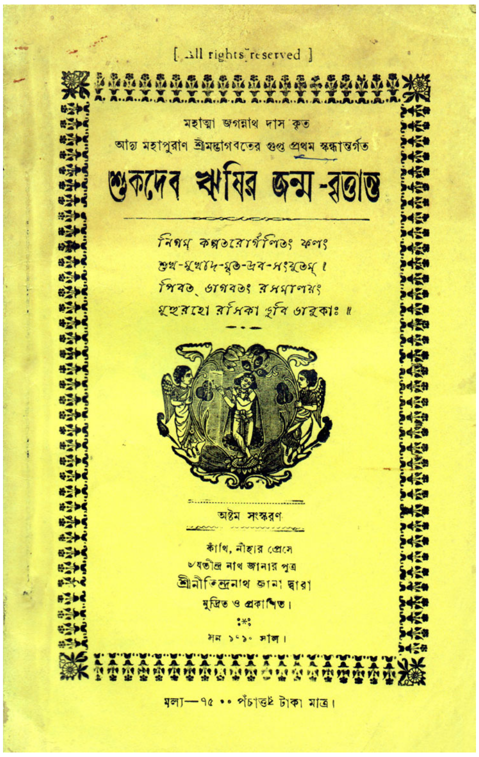

[All rights reserved]

মহাত্মা জগন্নাথ দাস কৃত
আদ্য মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের গুপ্ত প্রথম স্কন্ধান্তর্গত

শুকদেব ঋষির জন্ম-বৃত্তান্ত

নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুক-মুখাদ-মৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

অষ্টম সংস্করণ

কাঁথি, নীহার প্রেসে
৺যতীন্দ্র নাথ জানার পুত্র
শ্রীনীতিন্দ্রনাথ জানা দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৪১০ সাল।

মূল্য—৭৫ .০০ পঁচাত্তর টাকা মাত্র।

জ. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'শুকদেব ঋষির জন্ম বৃত্তান্ত'। এই সংস্করণটি ১৪১০ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯০-৯২)

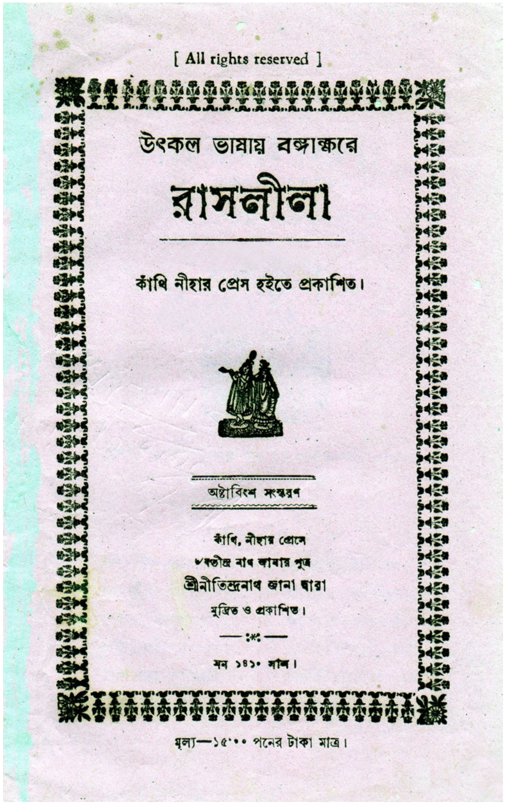

[All rights reserved]

উৎকল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে

রাসলীলা

কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত।

অষ্টাবিংশ সংস্করণ

কাঁথি, নীহার প্রেসে
৺যতীন্দ্র নাথ জানার পুত্র
শ্রীনীতিন্দ্রনাথ জানা দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৪১০ সাল।

মূল্য—১৫.০০ পনের টাকা মাত্র।

ঝ. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'রাসলীলা'। এই সংস্করণটি ১৪১০ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯২-৯৩)

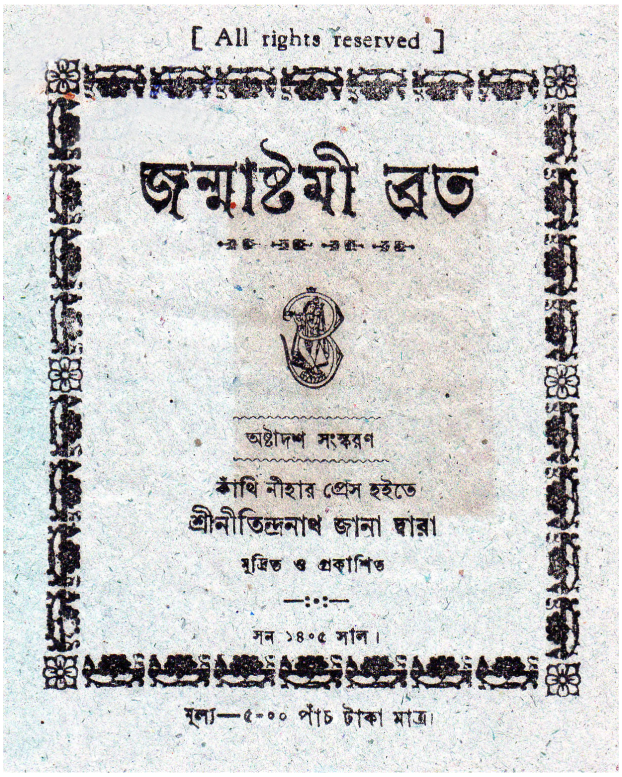

[All rights reserved]

জন্মাষ্টমী ব্রত

অষ্টাদশ সংস্করণ

কাঁথি নীহার প্রেস হইতে
শ্রীনীতিন্দ্রনাথ জানা দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১৪০৫ সাল।

মূল্য—৫.০০ পাঁচ টাকা মাত্র।

ঞ. জগন্নাথ দাস বিরচিত 'জন্মাষ্টমী ব্রত'। এই সংস্করণটি ১৪০৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯৩-৯৪)

৬
বাংলা হরফে ওড়িয়া রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা নির্ভর পুস্তিকা সমূহের প্রচ্ছদপত্র

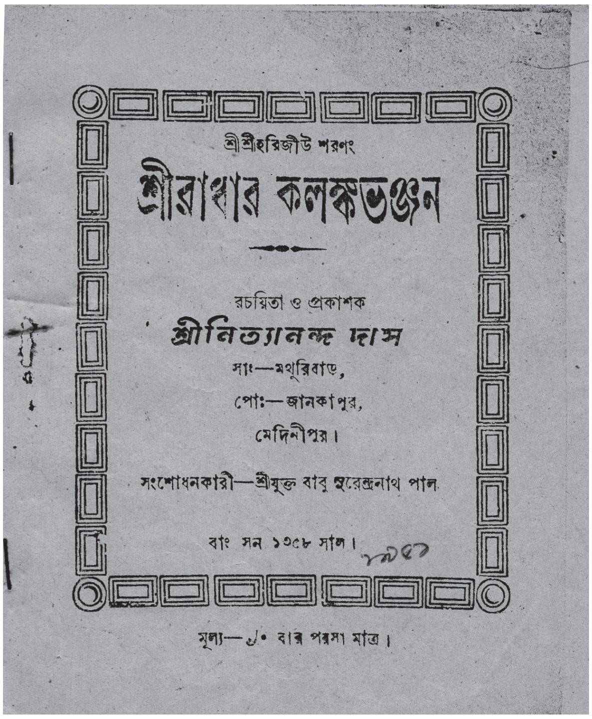
শ্রীশ্রীহরিজীউ শরণং
শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন
রচয়িতা ও প্রকাশক
শ্রীনিত্যানন্দ দাস
সাং—মথুরিবাড়,
পোঃ—জানকাপুর,
মেদিনীপুর।
সংশোধনকারী—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল
বাং সন ১৩৫৮ সাল।
মূল্য—।৶০ বার পয়সা মাত্র।

ক. নিত্যানন্দ বিরচিত 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন'। এই সংস্করণটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৯৭-১০৮)

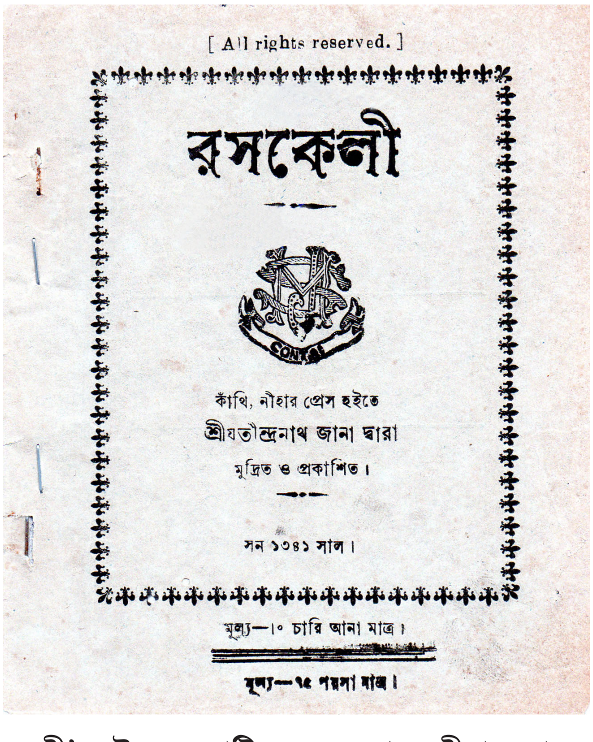
[All rights reserved.]
রসকেলী
CONTAI
কাঁথি, নীহার প্রেস হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩৪১ সাল।
মূল্য—।০ চারি আনা মাত্র।
মূল্য—২৫ পয়সা মাত্র।

খ. দ্বিজ মুরারি বিরচিত 'রসকেলী'। এই সংস্করণটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১০৮-১১৭)

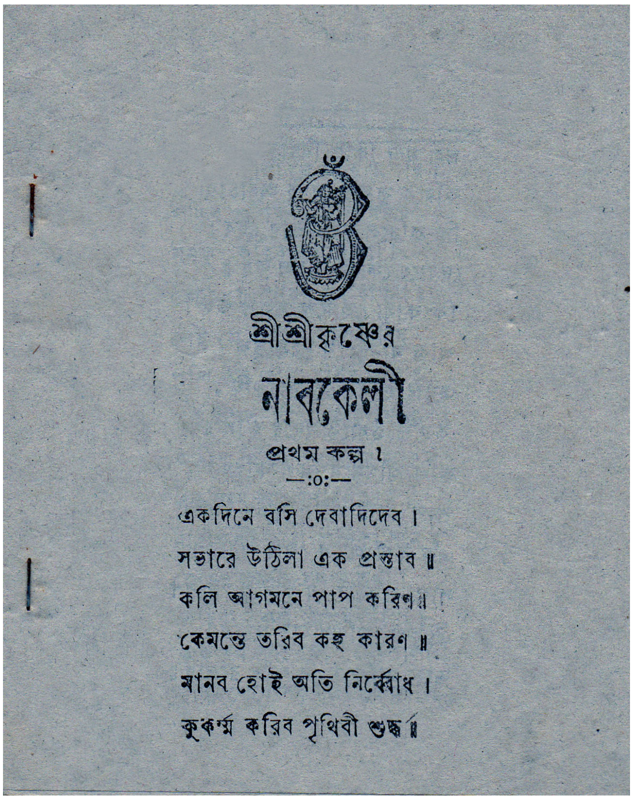

গ. দ্বিজ মুরারি বিরচিত 'নাবকেলী'। প্রচ্ছদপত্র না পাওয়ায় (ছিন্ন হওয়ার কারণে) সংস্করণ, মূল্য এবং অন্যান্য তথ্য জানা যায়নি। (দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১১৮-১২৭)

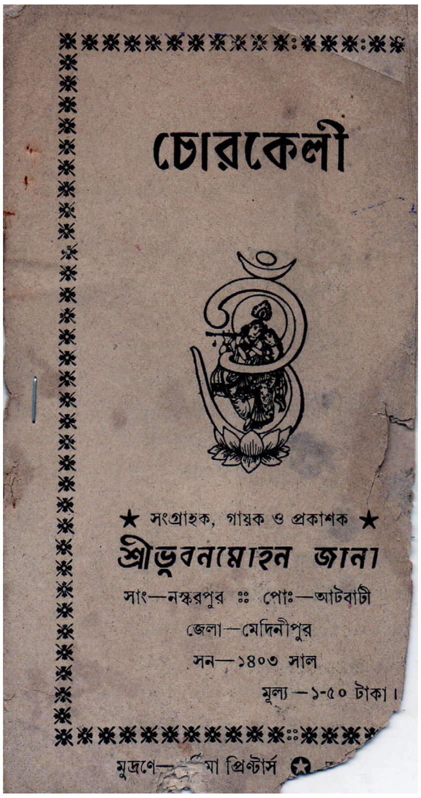

ঘ. 'চোরকেলী' কাব্যের কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, আটবাটী, এগরা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১২৭-১৩৫)

৭

বাংলা হরফে ওড়িয়া লৌকিক বিষয়বস্তু নির্ভর পুস্তিকা সমূহের প্রচ্ছদপত্র

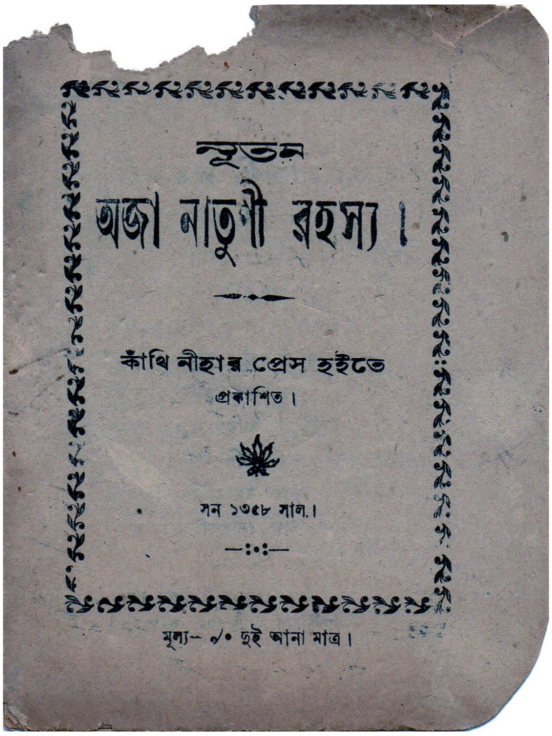

ক. ‘অজা নাতুনী রহস্য’ পুস্তিকাটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। এই সংস্করণটি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৪২-১৪৮)

খ. ‘মাই ভনজা নটুচুরি’ পুস্তিকাটি লোককবি ও পুস্তক বিক্রেতা ভুবনমোহন জানার কাছ থেকে সংগৃহীত। পূর্ণিমা প্রিন্টার্স, আটবাটী, এগরা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গায়ক ও প্রকাশক রূপে ভুবনমোহন জানার নামঙ্কিত। এই সংস্করটি ১৪০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৪৮-১৫৮)

গ. ‘ত্রিনাথ মেলা’ পুস্তিকাটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। এই সংস্করণটি ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৫৮-১৭১)

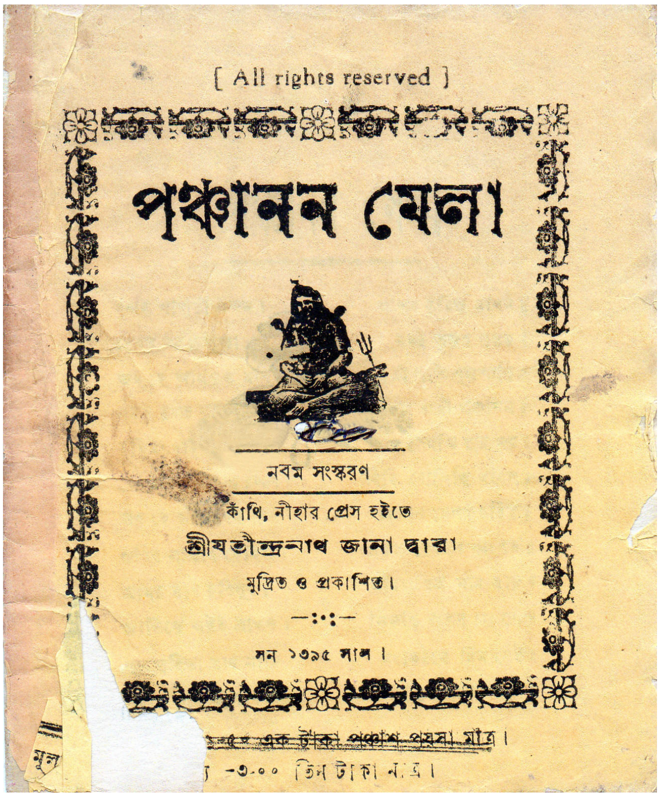

ঘ. ‘পঞ্চানন মেলা’ পুস্তিকাটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। এই সংস্করণটি ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৭১-১৮৫)

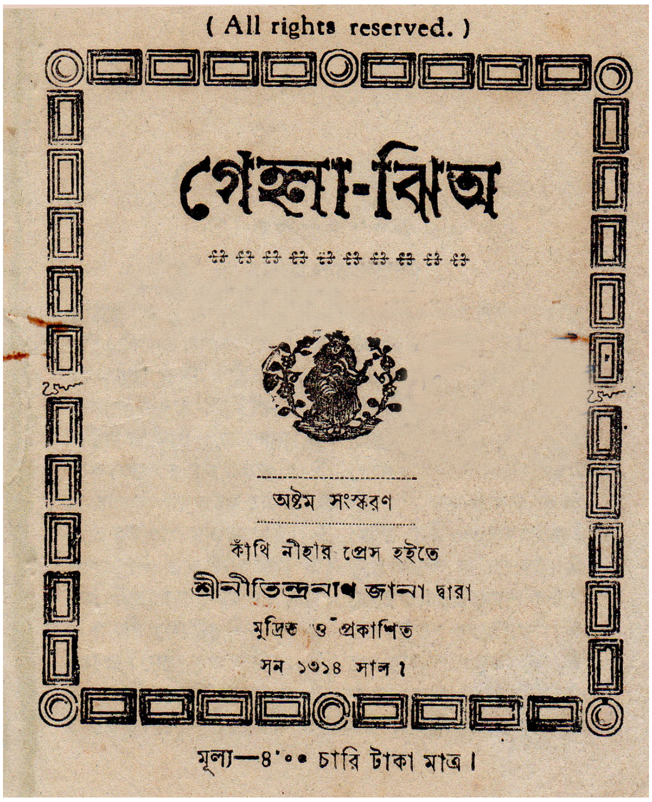

ঙ. কবি চন্দ্রমোহন ধলের লেখা ‘গেল্লা-ঝিঅ’। এই সংস্করণটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৮৫-১৯৭)

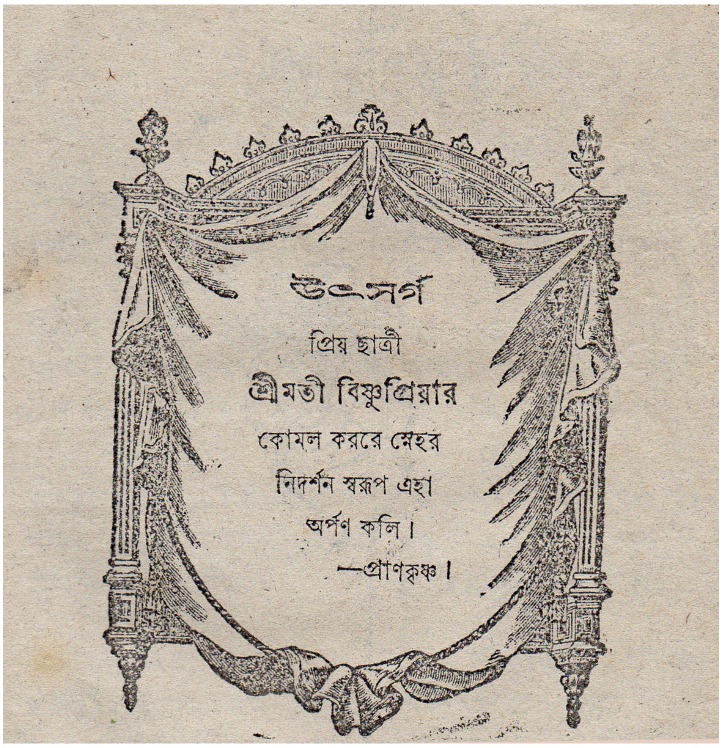

চ. ‘সুনা ঝিঅ’ পুস্তিকাটিতে কবি পরিচিতি অনুপস্থিত। এই সংস্করণটি প্রচ্ছদপত্র বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মূল কাব্যাংশটি আমাদের সংগ্রহে আছে। পুস্তিকাটির সংস্করণ, প্রকাশকাল, প্রকাশক, মূল্য জানা সম্ভবপর হয়নি। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৯৭-২০৫)

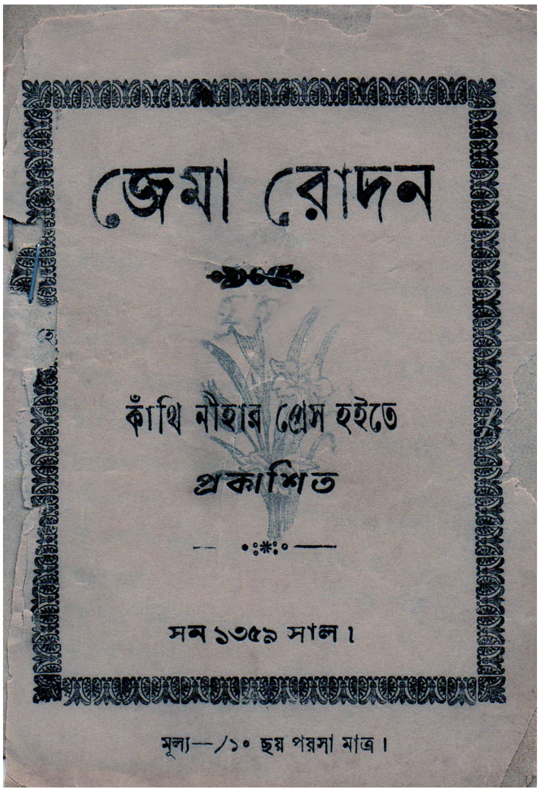

ছ. কবি বনমালী রচিত 'জেমা রোদন' ও 'অলসী বহু গীত' শীর্ষক দুটি রচনা একত্রে এই পুস্তিকায় মুদ্রিত। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে নীহার প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২০৫-২১৮)

জ. কবি ভাবুকচরণ দাস রচিত 'পরশমণি'। পুস্তিকাটি ১৪১৪ বঙ্গাব্দে লোককবি ও পুস্তক বিক্রেতা ভুবনমোহন জানা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার ভবানীচক বাজারের পূর্ণিমা প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত করেন ও প্রকাশ করেন। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২১৮-২২৪)

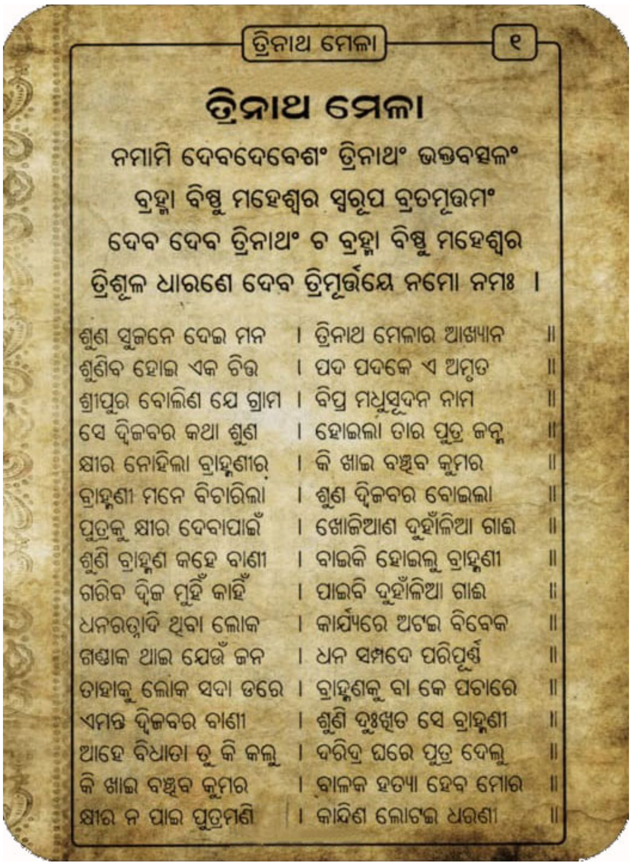
ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ୧

ତ୍ରିନାଥ ମେଳା

ନମାମି ଦେବଦେବେଶଂ ତ୍ରିନାଥଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଳଂ
ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରତମୁତ୍ତମଂ
ଦେବ ଦେବ ତ୍ରିନାଥଂ ଚ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର
ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣେ ଦେବ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମୋ ନମଃ ।

ଶୁଣ ସୁଜନେ ଦେଇ ମନ । ତ୍ରିନାଥ ମେଳାର ଆଖ୍ୟାନ ॥
ଶୁଣିବ ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ । ପଦ ପଦକେ ଏ ଅମୃତ ॥
ଶ୍ରୀପୁର ବୋଲିଣ ଯେ ଗ୍ରାମ । ବିପ୍ର ମଧୁସୂଦନ ନାମ ॥
ସେ ଦ୍ୱିଜବର କଥା ଶୁଣ । ହୋଇଲା ତାର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ॥
କ୍ଷୀର ନୋହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର । କି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ କୁମର ॥
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନେ ବିଚାରିଲା । ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜବର ବୋଇଲା ॥
ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାପାଇଁ । ଖୋଜିଆଣ ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ ॥
ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ବାଣୀ । ବାଇକି ହୋଇଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ॥
ଗରିବ ଦ୍ୱିଜ ମୁହିଁ କାହିଁ । ପାଇବି ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ ॥
ଧନରତ୍ନାଦି ଥିବା ଲୋକ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟଇ ବିବେକ ॥
ଗଣ୍ଡାକ ଥାଇ ଯେଉଁ ଜନ । ଧନ ସମ୍ପଦେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ॥
ତାହାକୁ ଲୋକ ସଦା ଡରେ । ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବା କେ ପଚାରେ ॥
ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱିଜବର ବାଣୀ । ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ॥
ଆହେ ବିଧାତା ତୁ କି କଲୁ । ଦରିଦ୍ର ଘରେ ପୁତ୍ର ଦେଲୁ ॥
କି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ କୁମର । ବାଳକ ହତ୍ୟା ହେବ ମୋର ॥
କ୍ଷୀର ନ ପାଇ ପୁତ୍ରମଣି । କାନ୍ଦିଣ ଲୋଟଇ ଧରଣୀ ॥

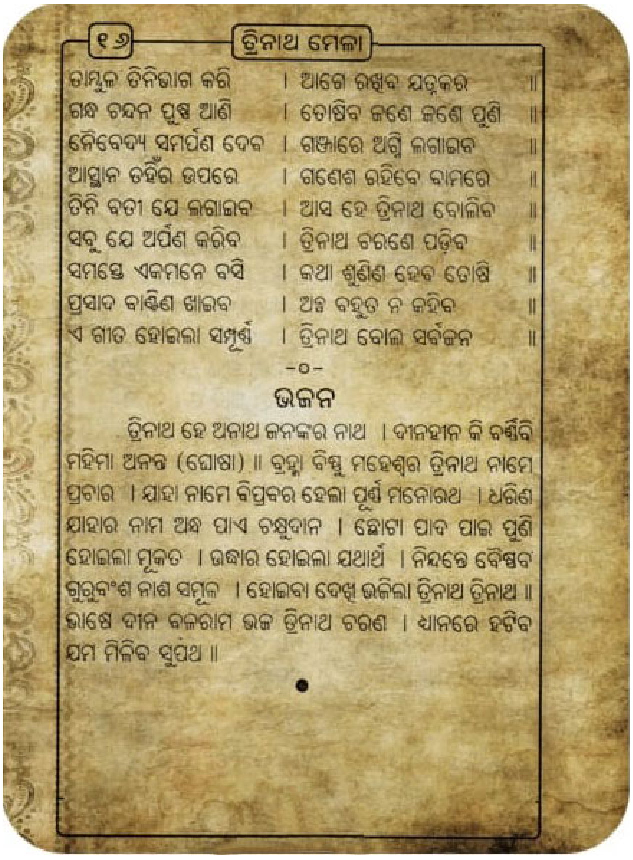
୧୬ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା

ତାମ୍ବୁଳ ତିନିଭାଗ କରି । ଆଗେ ରଖିବ ଯତ୍ନକରି ॥
ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଆଣି । ତୋଷିବ ଜଣେ ଜଣେ ପୁଣି ॥
ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ ଦେବ । ଗଞ୍ଜାରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବ ॥
ଆସ୍ଥାନ ତହିଁର ଉପରେ । ଗଣେଶ ରହିବେ ବାମରେ ॥
ତିନି ବତୀ ଯେ ଲଗାଇବ । ଆସ ହେ ତ୍ରିନାଥ ବୋଲିବ ॥
ସବୁ ଯେ ଅର୍ପଣ କରିବ । ତ୍ରିନାଥ ଚରଣେ ପଡ଼ିବ ॥
ସମସ୍ତେ ଏକମନେ ବସି । କଥା ଶୁଣିଣ ହେବ ତୋଷି ॥
ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଣ ଖାଇବ । ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ କହିବ ॥
ଏ ଗୀତ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତ୍ରିନାଥ ବୋଲ ସର୍ବଜନ ॥

-୦-

ଭଜନ

ତ୍ରିନାଥ ହେ ଅନାଥ ଜନଙ୍କର ନାଥ । ଦୀନହୀନ କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ମହିମା ଅନନ୍ତ (ଘୋଷା) ॥ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିନାଥ ନାମେ ପ୍ରଚାର । ଯାହା ନାମେ ବିପ୍ରବର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ । ଧରିଣ ଯାହାର ନାମ ଅନ୍ଧ ପାଏ ଚକ୍ଷୁଦାନ । ଛୋଟା ପାଦ ପାଇ ପୁଣି ହୋଇଲା ମୁକତ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଲା ଯଥାର୍ଥ । ନିନ୍ଦନ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁବଂଶ ନାଶ ସମୂଳ । ହୋଇବା ଦେଖି ଭଜିଲା ତ୍ରିନାଥ ତ୍ରିନାଥ ॥ ଭାଷେ ଦୀନ ବଳରାମ ଭଜ ତ୍ରିନାଥ ଚରଣ । ଧ୍ୟାନରେ ହଟିବ ଯମ ମିଳିବ ସୁପଥ ॥

ঝ. কবি দীন বলরাম রচিত এবং ওড়িশায় বহুল প্রচলিত 'ত্রিনাথ মেলা' শীর্ষক পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠা। (দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৬০)

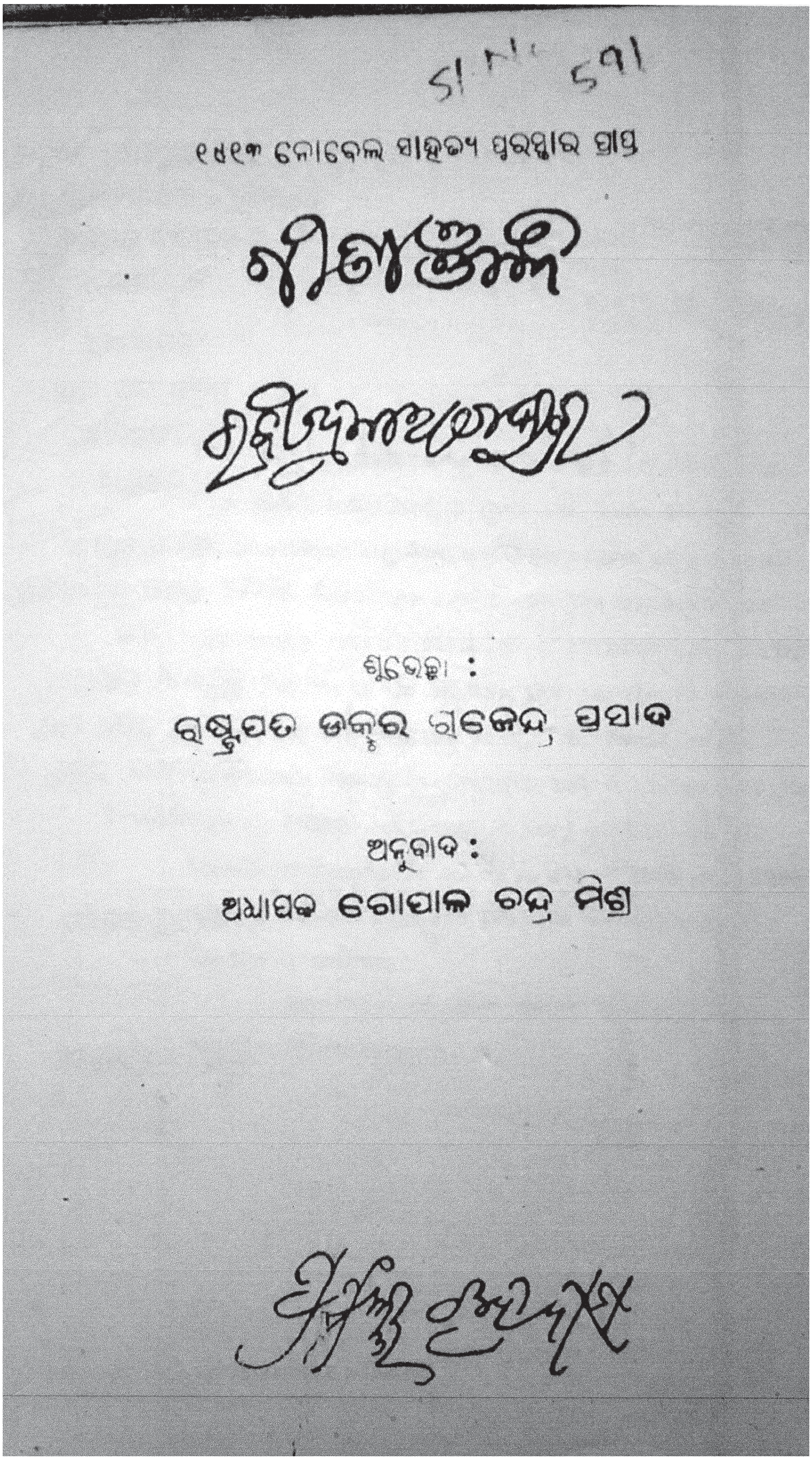

୧୯୧୩ ନୋବେଲ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ

ଗୀତାଞ୍ଜଳି

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

ଶୁଭେଚ୍ଛା :

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ

ଅନୁବାଦ :

ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ক. গোপাল চন্দ্র মিশ্র অনূদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'। প্রকাশক প্রফুল্ল রায়, ১৯৬১। (দ্রষ্টব্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৯৭-২৯৮)

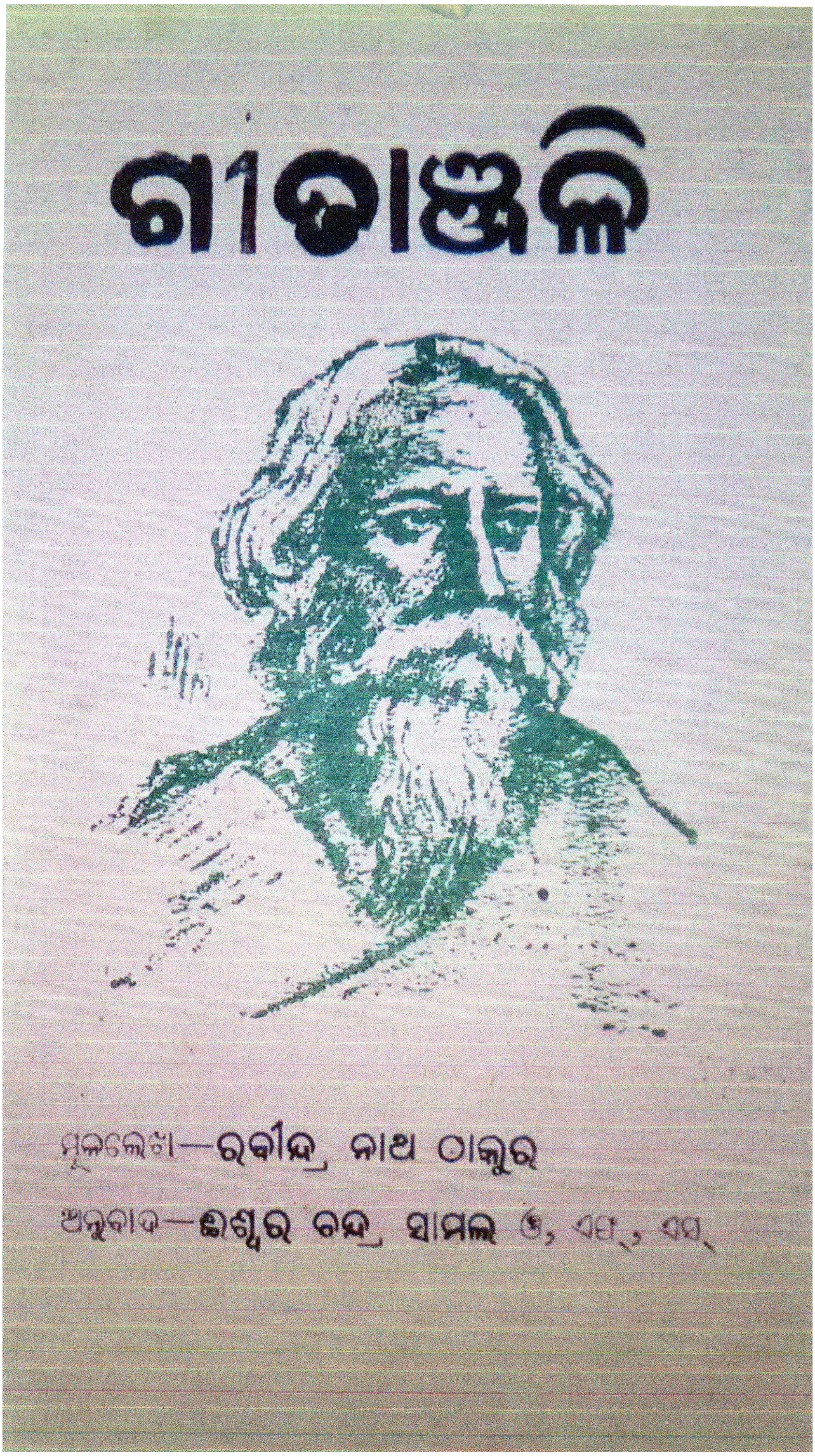

খ. ঈশ্বর চন্দ্র সামল অনূদিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’। প্রকাশক শ্যামাপ্রসাদ বেহেরা, সাবিত্রী প্রিন্টার্স, ১৯৮৩। (দ্রষ্টব্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৯৭-২৯৮)

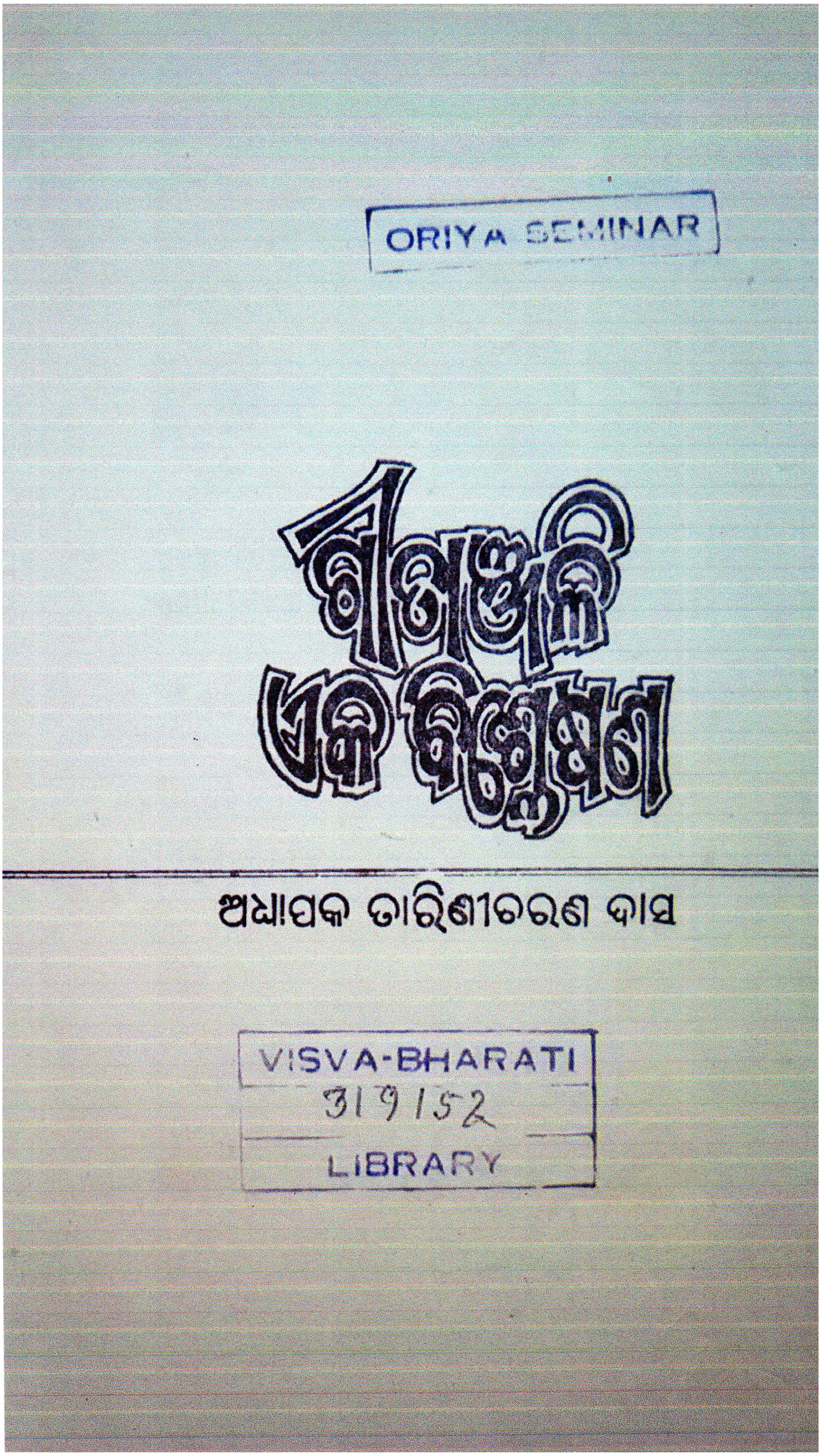

গ. তারিণীচরণ দাস প্রণীত 'গীতাঞ্জলি এক বিশ্লেষণ', গদ্যভাষা সমবায় প্রকাশন, ১৯৮৬। (দ্রষ্টব্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩০১)

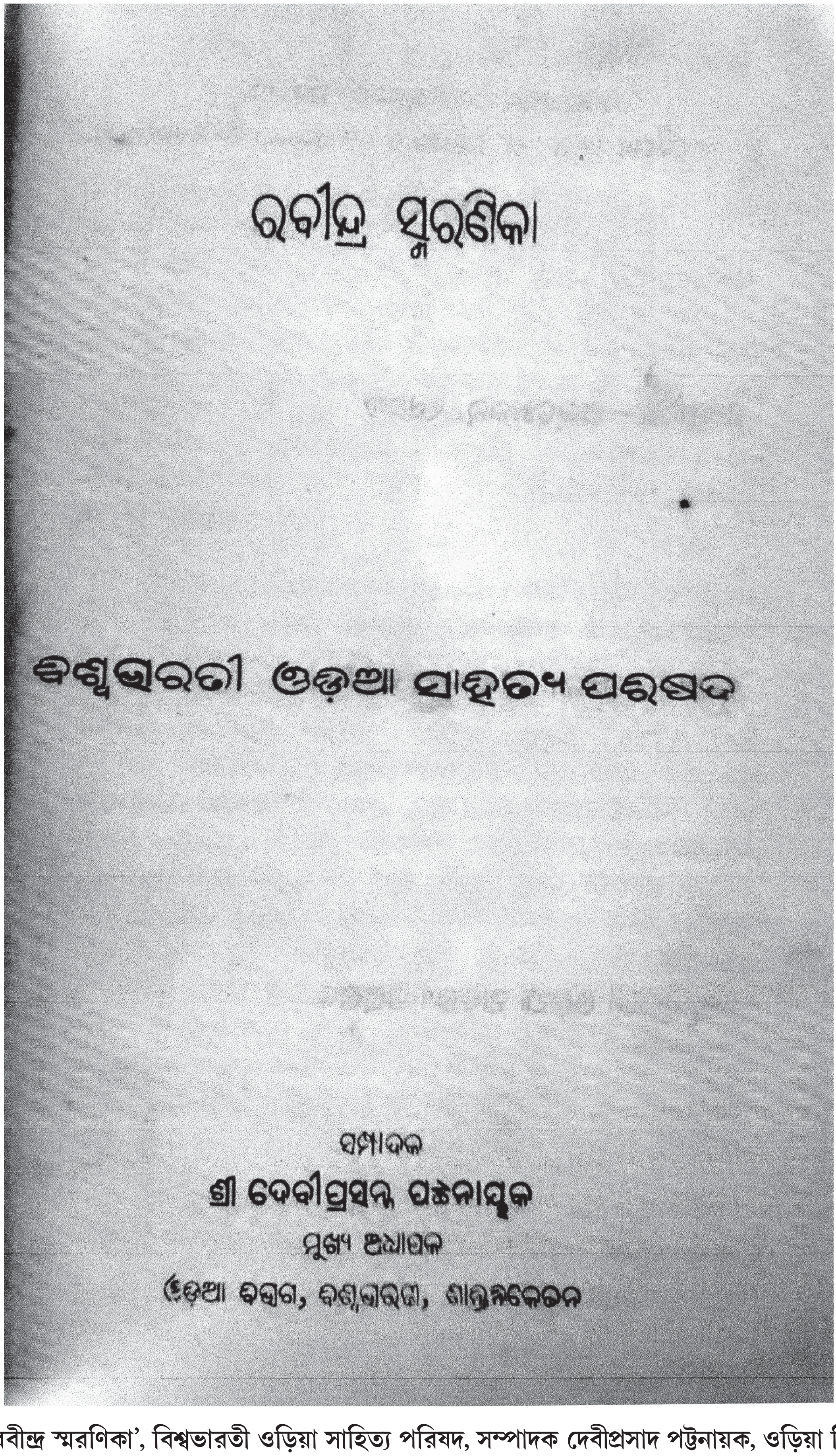
ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରଣିକା

ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ

ସମ୍ପାଦକ

ଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ

ঘ. ‘রবীন্দ্র স্মরণিকা’, বিশ্বভারতী ওড়িয়া সাহিত্য পরিষদ, সম্পাদক দেবীপ্রসাদ পট্টনায়ক, ওড়িয়া বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ১৯৬১। (দ্রষ্টব্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৯৯-৩০০)

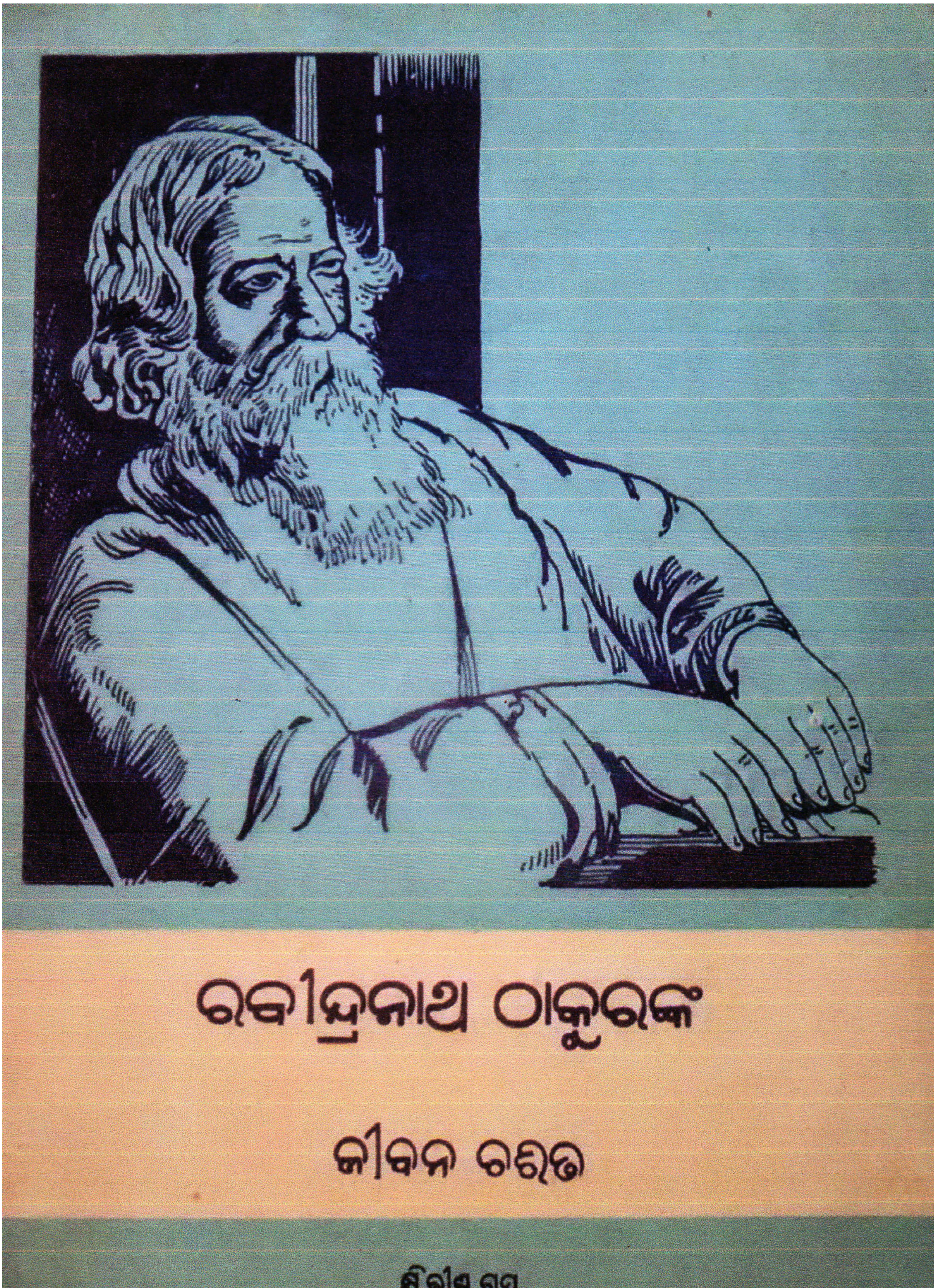

৬. ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঙ্ক জীবন রচিত’, ক্ষিতীশ রায়, ভারতীয় সাহিত্য স্রষ্টা গ্রন্থমালা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৬। (দ্রষ্টব্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৯৭)

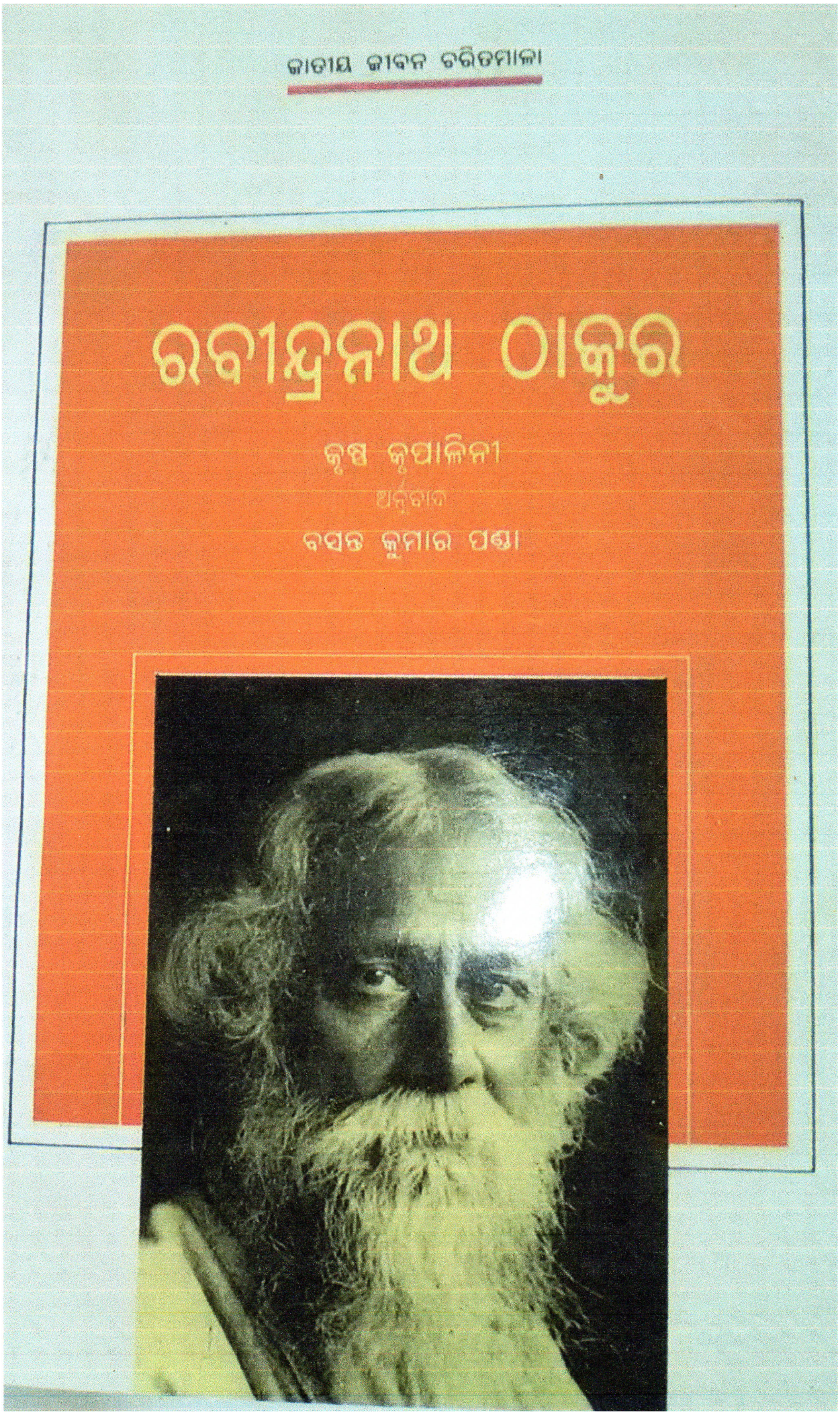

চ. 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' কৃষ্ণকৃপালিনী প্রণীত। অনুবাদক বসন্ত কুমার পণ্ডা, জাতীয় জীবন চরিতমালা, ১৯৯৯। (দ্রষ্টব্য, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩০১)

গ্রন্থপঞ্জি

(ক)

আকর গ্রন্থ (Text)

(বাংলা গ্রন্থাবলী)

(কালানুক্রমিক)

১৩১৪ ঃ চন্দ্রমোহন ধল, গেহ্লা ঝিঅ, ৮ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩১৪ ঃ ক্ষেত্রনাথ, রাম বনবাস, ৮ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৩৩ ঃ জগন্নাথ দাস, জড়ভরত উপাখ্যান, ১ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৪১ ঃ দ্বিজমুরারি, রসকেলী, ১ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৪৩ ঃ দ্বিজ অণিরুদ্ধ, অনন্ত ব্রত, ৫ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৫৮ ঃ নিত্যানন্দ দাস, শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন ১ম সংস্করণ।

১৩৫৮ ঃ কবি পরিচিতি অনুপস্থিত, অজা নাতুনী রহস্য, ১ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৫৮ ঃ পঞ্চানন দাস, কটকিআনী বহু, ১ম সংস্করণ, অজ্ঞাত প্রকাশনা।

১৩৫৯ ঃ কর্ত্তিকচন্দ্র জানা, কনিআ বউ, ৩য় সংস্করণ, অজ্ঞাত প্রকাশনা।

১৩৫৯ ঃ কবি পরিচিতি অনুপস্থিত, জেমা রোদন ও অলসী বহু গীত (একত্রে গ্রন্থিত), ১ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৬২ ঃ জগন্নাথ দাস, ধ্রুব চরিত্র, ৪র্থ সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৯৪ ঃ জগন্নাথ দাস, টীকা ভাগবত বা ভাগবতাসার, ৩১তম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৯৫ ঃ দ্বিজ অণিরুদ্ধ, সাবিত্রী ব্রতকথা, ৭ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৯৫ ঃ শ্রীহরি দাস, সুগন্ধিকা পুষ্পহরণ, ১৩শ সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৯৫ ঃ কবি পরিচিতি অনুপস্থিত, ত্রিনাথ মেলা, ৩২তম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৩৯৫ ঃ অর্জুন, পঞ্চানন মেলা, ৯ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪০৩ ঃ ভুবনমোহন জানা (প্রকাশক), চোরকেলী, ১ম সংস্করণ।

১৪০৩ ঃ ভুবনমোহন জানা, মাই ভণজা ও নটুচুরি, ১ম সংস্করণ, পূর্ণিমা প্রিন্টার্স।

১৪০৫ ঃ জগন্নাথ দাস, হরিণী স্তুতি, ৩২তম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪০৫ ঃ জগন্নাথ দাস, গজস্তুতি, ৯ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪০৫ ঃ জগন্নাথ দাস, শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্দ, ১২শ সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪০৫ ঃ জগন্নাথ দাস, জন্মাষ্টমী ব্রত, ১৮শ সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪১০ ঃ জগন্নাথ দাস ও বলরাম দাস, ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল, ৮ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪১০ ঃ জগন্নাথ দাস, শুকদেব ঋষির জন্মবৃত্তান্ত, ৮ম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪১০ ঃ জগন্নাথ দাস, রাসলীলা, ৩২তম সংস্করণ, নীহার প্রেস।

১৪১৪ ঃ ভাবুকচরণ দাস, পরশমণি, ১ম সংস্করণ, পূর্ণিমা প্রিন্টার্স।

প্রকাশকাল/রচনাকাল অনুল্লিখিত
(বর্ণানুক্রমিক)

জগন্নাথ দাস ঃ উষাহরণ, নীহার প্রেস।

দ্বিজ মুরারি ঃ নাবকেলী, নীহার প্রেস।

ভীমা ধীবর ঃ কপটপাশা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নীহার প্রেস।

ভুবনমোহন জানা (প্রকাশক) ঃ সীতাহরণ, ১ম সংস্করণ, পূর্ণিমা প্রিন্টার্স।

(‘সুনা ঝিঅ’ শিরোনামে একটি পুস্তিকার প্রচ্ছদপত্র বিচ্ছিন্ন থাকায় কিংবা মূল রচনাংশে কবি/কাব্যকাল সম্বন্ধে কোন তথ্য না থাকায় কালানুক্রমিক বা বর্ণানুক্রমিক তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা গেল না।)

ওড়িয়া গ্রন্থাবলী
(কালানুক্রমিক)

১৯৫০ ঃ দ্বিভৌনি (দুইবোন), চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, কটক পাবলিশিং হাউস, কটক।

১৯৫১ ঃ রবীন্দ্রগল্প চয়ন, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, কটক পাবলিশিং হাউস, কটক।

১৯৫১ ঃ রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, কটক পাবলিশিং হাউস, কটক।

১৯৫৭ ঃ রক্তকরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র পট্টনায়ক অনূদিত, প্রতিভা প্রকাশন, বেহরম পুর।

১৯৬১ ঃ চার অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অশোক রাও অনূদিত, প্রগতি পাবলিশার্স, কটক।

১৯৬১ ঃ চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কটক।

১৯৬৩ ঃ একোইশ গল্প (রবীন্দ্রনাথের একুশটি গল্পের অনুবাদ), কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনূদিত,

সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি।

১৯৬৩ঃ বিশ্বমানবর পথে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বমানবের পথে' প্রবন্ধের অনুবাদ), কানুচরণ মিশ্র অনূদিত, ওড়িয়া সাহিত্য আকাডেমি, ভুবনেশ্বর।

১৯৬৬ঃ যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপীনাথ মিশ্র অনূদিত, সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি।

১৯৬৮ঃ ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সীতাদেবী খাড়ঙ্গা অনূদিত, দশহ ব্রাদার্স, বেহরম পুর।

১৯৭২ঃ নিবন্ধমালা ১ম খণ্ড (নির্বাচিত রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদ), গৌরীকুমার ব্রহ্ম অনূদিত, সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি।

১৯৭২ঃ বিনোদিনী (রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের অনুবাদ), চিত্তরঞ্জন দাস অনূদিত, সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি।

১৯৭৪ঃ শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সীতাদেবী খাড়ঙ্গা অনূদিত, স্টুডেন্টস স্টোর, কটক।

১৯৭৫ঃ একোত্তর শতী (নির্বাচিত রবীন্দ্রকবিতা), শচী রাউতরায় অনূদিত, সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি।

১৯৭৬ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঙ্ক জীবনচরিত (রবীন্দ্রনাথের 'জীবনচরিত'), ক্ষিতিশ রায় অনূদিত, ভারতীয় সাহিত্য স্রষ্টা গ্রন্থমালা, প্রকাশন বিভাগ, সূচনা ও প্রকাশন মন্ত্রালয়, ভারত সরকার, নিউদিল্লি।

১৯৭৭ঃ নিবন্ধমালা ২য় খণ্ড (নির্বাচিত রবীন্দ্রকবিতার অনুবাদ, চিন্তমণি বেহেরা অনূদিত, সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি)।

১৯৭৯ঃ পাঞ্চনাটক (নির্বাচিত পাঁচটি রবীন্দ্রনাটক), প্রভাত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, সাহিত্য অকাডেমি, নিউদিল্লি।

১৯৮০ঃ বহুরানী (রবীন্দ্রনাথ 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাস) মনোজমঞ্জরী মিশ্র অনূদিত, স্টুডেন্টস্ সেন্টার, কটক।

১৯৮৩ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বর চন্দ্র সামল অনূদিত, সাবিত্রী প্রিন্টার্স, বালেশ্বর।

১৯৮৩ঃ নৌকাডুবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনজা দেবী অনূদিত, গ্রন্থমন্দির, কটক।

১৯৮৭ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খগেশ্বর মহাপাত্র অনূদিত, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

১৯৯১ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগন্নাথ পাত্র অনূদিত, ওড়িশা বুক স্টোর, কটক।

১৯৯২ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরুণ প্রুশতি অনূদিত, কাহানি, কটক।

১৯৯৩ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃপাময় মহাপাত্র অনূদিত, উৎকল প্রিন্টার্স, কুর্লা।

২০০২ঃ গোরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডা অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০২ঃ মুকুট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাকান্ত রাউত অনূদিত, শ্রদ্ধা প্রকাশনী, কটক।

২০০৩ঃ কাবুলিওয়ালা ও অন্যান্যগল্প, যুগলকিশোর দত্ত, অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৩ঃ চতুরঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নমিতা বসু অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৩ঃ চারুলতা ও অন্যান্য গল্প, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৩ঃ নির্বাচিত গল্প (নির্বাচিত রবীন্দ্রগল্প), হরিশচন্দ্র বেহেরা অনূদিত, কাহানি, কটক।

২০০৩ঃ রবীন্দ্রনাথঙ্ক জনপ্রিয় গল্প (নির্বাচিত রবীন্দ্রকবিতা), নিলাদ্রিভূষণ হরিচরণ অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৪ঃ গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রপ্রসাদ পণ্ডা অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৪ঃ তপস্বিনী ও অন্যান্য কবিতা (নির্বাচিত রবীন্দ্রকবিতা), দীপ্তি পট্টনায়ক অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৪ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথঙ্ক ক্ষুদ্র কবিতা (নির্বাচিত রবীন্দ্রকবিতা), ব্রজনাথ রথ অনূদিত, শুভশ্রী প্রকাশনী, বালেশ্বর।

২০০৪ঃ ভৌতিক গল্প (নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প), যুগলকিশোর দত্ত, বুকল্যাণ্ড ইন্টার ন্যাশনাল, ভুবনেশ্বর।

২০০৬ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৃসিংহ মিশ্র অনূদিত, বুকল্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল, ভুবনেশ্বর।

২০০৬ঃ রাজর্ষি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয়বালা পট্টনায়ক অনূদিত, বিদ্যাপুরী, কটক।

২০০৭ঃ নয়নর বালি (চোখের বালি), শোভাকর দাস অনূদিত, ক্ল্যাসিক হাউস, কটক।

২০০৭ঃ বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৃদুলা মিশ্র অনূদিত, সৃজন, ভুবনেশ্বর।

২০০৯ঃ গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ সিংহ অনূদিত, প্রকাশক ক্ষণপ্রভা সিংহ, জাদুয়ানী চক, পুরী।

২০১৩ঃ রবীন্দ্রনাথ গল্পমালা (নির্বাচিত রবীন্দ্রগল্প), যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, সত্যনারায়ণ বুক স্টোর, বিনোদবিহারী, কটক।

২০১৪ঃ আঁখির বালি (চোখের বালি), যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, বালুবাজার, কটক।

২০১৪ঃ যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, বালুবাজার, কটক।

২০১৪ঃ নৌকাডুবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুগলকিশোর দত্ত অনূদিত, বিদ্যাপুরী, বালুবাজার কটক।

খ

সহায়ক গ্রন্থ (Refference)

(বাংলা গ্রন্থাবলী)

(বর্ণানুক্রমিক)

অচিন্ত্য বিশ্বাস ঃ	বাংলা পুথির কথা, বিদ্যা, ২০১১, কলকাতা।
অচিন্ত্য বিশ্বাস ঃ	লোকসাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য, অঞ্জলি পাবলিসার্স, ২০০৮, কলকাতা।
অদ্রীশ বিশ্বাস ঃ	বটতলার বই, ১ম খণ্ড, গাঙচিল, ২০১১, কলকাতা।
অদ্রীশ বিশ্বাস ঃ	বটতলার বই, ২য় খণ্ড, গাঙচিল, ২০১১, কলকাতা।
অমিত চৌধুরী ঃ	সত্যপির সাহিত্যচর্চা, সোম পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ঃ	মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রত্নাবলী, ২০১৩, কলকাতা।
অলোক মৈত্র ঃ	বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধানে, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, কলকাতা।
অলোক রায় ঃ	উনিশ শতকের বাংলা, পারুল, ২০১৮, কলকাতা।
অবন্তী দেবী ঃ	ভক্তকবি মধুসূদন ও উৎকলে নবযুগ, জিজ্ঞাসা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দে, কলকাতা।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৬৮, কলকাতা।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ২০০৬, কলকাতা।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৬৬, কলকাতা।
আসরাফ সিদ্দিকী ঃ	লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, গতিধারা, ২০০৮, ঢাকা।
কামিনীকুমার রায় ঃ	লৌকিক শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), লোকভারতী, ১৯৭১, কললকাতা।

কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা ঃ মাদলা পাঁজি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১০, নতুন দিল্লি।

গোপীজনবল্লভ দাস ঃ শ্রীরসিকমঙ্গল, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর সংস্করণ, গোপীবল্লভপুর, প. মেদিনীপুর, ৪৫৫ গৌরাব্দ।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ঃ বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮, কলকাতা।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ঃ ভাগবতের কথা, প্রাচী, ১৯৯৭, কলকাতা।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী ঃ ভাগবত পুরাণ, নবপত্র, ২০০২, কলকাতা।

তরুণদেব ভট্টাচার্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, ১৯৭৯, মেদিনীপুর

তরুণ মুখোপাধ্যায় ঃ প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্য ও আধুনিক পাঠক, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, কলকাতা।

তাপস বসু ঃ শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, কলকাতা।

তাপস মাইতি ঃ জঙ্গলমহল কথা, উপত্যকা, ২০১৬, মেদিনীপুর।

তুহিন মুখোপাধ্যায় ঃ চৈতন্যের শেষপ্রহর, পত্রলেখা, ২০১৮, কলকাতা।

ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ঃ ভাগবত, হরফ, ১৯৮৮, কলকাতা।

দীপঙ্কর সেন ঃ মুদ্রণচর্চা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৩, কলকাতা।

দুলাল চৌধুরী ঃ বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ, অকাদেমি অব ফকলোর, ২০০৪, কলকাতা।

দোলগোবিন্দ দাস ঃ কাঁথি মহকুমার কথ্যভাষার রূপ ও রীতি, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, বিদিশা, নারায়ণগড়, প. মেদিনীপুর।

নিতাই জানা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলা ভাষা, দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৬, কলকাতা।

নির্মল দাস ঃ মধ্যযুগের কাব্যপাঠ, ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ২০১৬, কলকাতা।

নির্মলনারায়ণ গুপ্ত ঃ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য, রত্নাবলী, ১৯৬৪, কলকাতা।

পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পা.) ঃ পুঁথি পরিচয়, ২য় খণ্ড বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, শান্তিনিকেতন।

পবিত্র সরকার ঃ ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ, ২০১৫, কলকাতা।

প্রণব রায় (সম্পা.) ঃ মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, ২০০২, কলকাতা।

প্রণব রায় (সম্পা.) ঃ মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, চতুর্থ খণ্ড, সাহিত্যলোক, ২০০২, কলকাতা।

প্রবোধকুমার ভৌমিক ঃ আমাদের মেদিনীপুর, বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৭, কলকাতা।

প্রবোধকুমার ভৌমিক ঃ বাংলার লোকউৎসব, প্রকাশক অর্পিতা ভট্টাচার্য, ২০১০, কলকাতা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলায় ধর্মসাহিত্য (লৌকিক), ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঃ শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ফার্মা কে. এল. এস প্রাঃ লিঃ, ১৯৮০, কলকাতা।

প্রশান্তকুমার পাল ঃ রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

প্রিয়রঞ্জন সেন ঃ ওড়িয়া সাহিত্য, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮, কলকাতা

প্রেমানন্দ প্রধান ঃ দক্ষিণ মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসাহিত্য (প্রবন্ধ), কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত, ২০১২, কাঁথি।

বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশনী, ১৯৯০, নারায়ণগড়, প. মেদিনীপুর।

বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি ঃ সুবর্ণরেখা অববাহিকায় লোকায়ত সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ২০১৮, কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী ঃ গীতিকা ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট, পুস্তক বিপণি, ২০০৩, কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী ঃ বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, ১৯৯৫, কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী ঃ লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পুস্তক বিপণি, ২০০৩, কলকাতা।

বরুণকুমার চক্রবর্তী ঃ লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০, কলকাতা।

বিনোদশঙ্কর দাস (সম্পা.) ঃ মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, ১৯৮৯, কলকাতা।

বিনোদশঙ্কর দাস (সম্পা.) ঃ মেদিনীপুর ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, ১৯৯৮, কলকাতা।

বিপ্লব চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, কলকাতা।

বিমানবিহারী মজুমদার ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫৫৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ কবি ধনঞ্জয় ভঞ্জের দ্বারিকাপালা, মারাংবুরু প্রেস, ১৯৮৮, মেছেদা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ বৈষ্ণব পদসঞ্চয়ন, বসুমতী কর্পরেশন লিমিটেড, ১৯৯০, কলকাতা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত, মঞ্জুষা, ১৯৮৬, কলকাতা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ রঘুনাথ দাস কৃত ভুবনমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬, কলকাতা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০, কলকাতা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৯, কলকাতা।

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ঃ সনাতন কৃত প্রকাশ চৈতন্যরত্ন, মারাংবুরু প্রেস, ১৯৮৭, মেছেদা।

বুধদেব চৌধুরী (সম্পা.) ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, প্রত্যয় প্রকাশনী, ১৯৮৮, কলকাতা।

বৈদ্যনাথ ত্রিপাঠী ঃ কবি পিণ্ডিক শ্রীচন্দনকৃত বসন্তরাস, কালিমাটি (অনলাইন সংস্করণ), ২০০৯, কটক।

ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ আচার প্রবন্ধ, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রী কাশীনাথ ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, হুগলী।

মঞ্জুশ্রী রায় ঃ ওড়িয়া লিপিতে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী, প্যাপিরাস, ২০০৪, কলকাতা।

মানস মজুমদার ঃ লোকঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, কলকাতা।

মীর রেজাউল করীম ঃ পুথি গবেষণার সহজপাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, কলকাতা।

মোহিনীমোহন সরদার ঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ঃ বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, কোডেক্স, ২০১০, কলকাতা।

মৃণালকান্তি দাস ঃ প্রগতি ভাবনা ঃ বাংলা কবিতা ও ওড়িয়া কবিতা, দে পাবলিকেশনস্, ২০১৩, কলকাতা।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ঃ মেদিনীপুরের ইতিহাস, সাহিত্যলোক, ১৯৩৮, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

রামেশ্বর শ' ঃ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, ২০১২, কলকাতা।

ললিতমোহন সামন্ত ঃ দাঁতনের ইতিহাস, নন্দন, ২০১৬, কলকাতা।

শঙ্কর বিশাই ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী লোকসংস্কৃতি, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, কলকাতা।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী ও পুরুষ চরিত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১১, কলকাতা।

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পুস্তক বিপণি, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

শান্তিপদ নন্দ ঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন (স্মারক গ্রন্থ), বিষ্ণুপদ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, ২০১৯, এগরা, পূ. মেদিনীপুর।

শিবনারায়ণ রায় ঃ বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৮৫, কলকাতা।

শেখ মকবুল ইসলাম ঃ বাংলার জগন্নাথ সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, কলকাতা।

শ্যামল বেরা ঃ কবি দয়ারাম ঃ পঞ্চানন্দের গীতি, মনফকিরা, ২০০৭, কলকাতা।

শ্রীপান্থ ঃ যখন ছাপাখানা এল, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬, কলকাতা।

সনৎকুমার নস্কর ঃ প্রবাসীর প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৭।

সনৎকুমার নস্কর ঃ লোকসংস্কৃতিচর্চার মেথডলজি, পুস্তক বিপণি, ২০০৭, কলকাতা।

সারদাচরণ মিত্র ঃ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয়শ্রী প্রকাশনী, ২০১৮, কলকাতা।

সুকুমার সেন ঃ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৩, কলকাতা।

সুকুমার সেন ঃ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ, ২০১৫, কলকাতা।

সুকুমার সেন ঃ বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, আনন্দ, ২০১৫, কলকাতা।

সুকুমার সেন ঃ রামকথার প্রাক্-ইতিহাস, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, জিজ্ঞাসা, ২০০৩, কলকাতা।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কো. প্রা. লি., ১৯৬৬, কলকাতা।

সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য, ভাস্বতী, ২০০১, কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫, কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঙালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমী, কলকাতা, ২০০৫।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, জিজ্ঞাসা, ২০০৩, কলকাতা।

সুনীলকুমার ঘোষ ঃ কাঁথির পুরাবৃত্ত, প্রান্তিক, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

সুবিকাশ জানা ঃ লোকনাট্য পরিক্রমায় মেদিনীপুর, শিলালিপি, ২০১০, কলকাতা।

সুবীর মণ্ডল ঃ বাংলালিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, কলকাতা।

সুভাষ বন্দোপাধ্যায় ঃ দক্ষিণ সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, প্রত্যয় প্রকাশনী, ১৯৭৯, কলকাতা।

সুমিতা চক্রবর্তীঃ বাংলা আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, ১৯৯২, কলকাতা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬, নিউদিল্লি।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ, ২য় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭, নিউদিল্লি।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঃ গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, কলকাতা।

হেনা বিশ্বাস ঃ চৈতন্যভাগবত সমাজ ভাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, কলকাতা।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ হিন্দুদের দেবদেবী ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., ১৯৬০, কলকাতা।

ক্ষিতিমোহন সেন ঃ সাধক ও সাধনা, প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুনশ্চ, ২০১০, কলকাতা।

ক্ষেত্র গুপ্ত ঃ বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, প্রকাশক চিন্ময় মজুমদার, ১৯৯৯, কলকাতা।

(ওড়িয়া গ্রন্থাবলী)
(বর্ণানুক্রমিক)

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ সবুজ অক্ষর, কিতাব মহল, ১৯৮৮, কটক।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ঃ অঙ্গে যাহা নিভাইছি, কটক স্টুডেন্টস্ সেন্টার, ১৯৭৩, কটক।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ঃ আমর কবি (লীলা মজুমদারের গ্রন্থের অনুবাদ), কটক স্টুডেন্টস্ স্টোর, ১৯৬৩, কটক।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ঃ কালিন্দীচরণ প্রবন্ধ সমগ্র, কটক স্টুডেন্টস্ স্টোর, ১৯৪৬, কটক।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ঃ সবুজ কবিতা, সবুজ সাহিত্য সমিতি, নিউ প্রেস, ১৯৬৮, কটক।

কুঞ্জবিহারী দাস ঃ আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের ভূমি ও ভূমিকা, ওড়িশা সাহিত্য আকাডেমি, ১৯৬২, ভুবনেশ্বর।

কুঞ্জবিহারী দাস ঃ জীবনী ও জীবন, ওড়িশা বুক স্টোর, ১৯৮৯, কটক।

গগনেন্দ্রনাথ দাস ঃ ওড়িয়া ভাষা সুরক্ষা আন্দোলন, কটক স্টুডেন্টস্ স্টোর, ১৯৯৩, কটক।

গঙ্গাধর বল ঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টি, রাউতরায় প্রকাশনী, ১৯৬০, কটক।

জানকীবল্লভ মহান্তি ঃ ওড়িয়া সাহিত্য পরিক্রমা, গ্রন্থমন্দির, ১৯৭৬, কটক।

তত্ত্বকন্দর মিশ্র ঃ ১৮৬১ - ১৯৬১ শতবর্ষ পরে, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬১, নিউদিল্লি।

তারিণীচরণ দাস ঃ গীতাঞ্জলি এক বিশ্লেষণ, কটক স্টুডেন্টস্ সেন্টার, ১৯৮৩, কটক।

দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক ঃ রবীন্দ্র স্মরণিকা, সমাজ, ১৯৬১, কটক।

নটবর সামন্তরায় ঃ ওড়িয়া সাহিত্যর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তক্ষশিলা, ১৯৬১, কটক।

পঠানি পট্টনায়ক ঃ ওড়িয়া সাহিত্যর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তক্ষশিলা, ১৯৯৭, কটক।

বসন্ত কুমার পণ্ডা (অনূদিত) ঃ কৃষ্ণকৃপালিনী রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,

১৯৯১, নিউদিল্লি।

বৃন্দাবন আচার্য্য ঃ ওড়িয়া সাহিত্যর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গ্রন্থমন্দির, ২০০১, কটক।

বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক ঃ বৈকুণ্ঠ গ্রন্থাবলী, 'জীবনী ও কৃতি অংশ', উৎকল সাহিত্য সমাজ, ১৯৭৬, কটক।

ভাবগ্রাহী মিশ্র ঃ রবীন্দ্র জীবনকথা (প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের অনুবাদ), ১৯৬১, কটক।

মায়াধর মানসিংহ ঃ ওড়িয়া সাহিত্যর ইতিহাস, গ্রন্থমন্দির, ১৯৯৬, কটক।

মুরারিমোহন জেনা ঃ ওড়িয়া সাহিত্যর সবুজযুগ, ওড়িশা বুক স্টোর, ১৯৭০, কটক।

শঙ্কর রাও ঃ উৎকল ব্রাহ্ম সমাজ, আত্মকথা, কৃষ্ণকুটীর, ১৯৭৮ , কটক।

সরলা দেবী ঃ রবীন্দ্র পূজা, অরুণোদয় প্রেস, ১৯৬১, কটক।

স্নিগ্ধা বিশ্বাস ঃ সবুজ কবি ও বৈকুণ্ঠনাথ, বিদ্যাপুরী, ২০০৬, কটক।

হরিহর মহাপাত্র ঃ জীবন ও জীবিকা, নালন্দা, বিনোদবিহারী, ১৯৮৭, কটক।

হৃষিকেশ পণ্ডা ঃ রবীন্দ্র সমকালীন ওড়িয়া কবিতা, ওড়িশা বুক স্টোর, ১৯৮৮, কটক।

Bishnupada Panda : Orian Culture and Unknown Profile, Bookand International, 1989, Bhubaneswar.

Kunjabihari Das : A study of Orrissan folk-lore, Visvabharati, 1953, Santiniketan.

Mayadhar Mansinha : A History of Oriya Literature, Sahitya Akademi, 2012, New Delhi.

Prabhat Mukharjee : Tagore in Orissa, Prajatantra Prachar Samiti, 1966, Cuttack.

Rathindranath Tagore : On the edge of time, Visvabharati, 2010, Kokata.

Sukumar Sen : A History of Bengali Literature, Sahitya Academy, 1971, New Delhi.

Suniti Kumar Chatterji : The Origin and Development of Bengali Language, Calcutta University Press, 1926, Kolkata.

Swapan Chakravorty : Nameless Recognition, National Library, Govt. of India, 2015, Kolkata.

গ

সহায়ক পত্র-পত্রিকা (Refference)

(বাংলা পত্র-পত্রিকা)

(বর্ণানুক্রমিক)

অনুষ্টুপ ঃ শারদীয়, ১৪২০।

আজকাল ঃ সম্পাদকীয়, ১২ অক্টোবর, ২০১৮।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ মফঃস্বল সংখ্যা, ১৮ই বৈশাখ, বাংলা ১৩৩৬ সাল।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ রবিবাসরীয়, ২৪ জুন, ২০১৮।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ কড়চা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ জুন, ২০১৮।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ কড়চা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি, ২০২০।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ সম্পাদকীয়, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

এষণা ঃ অষ্টম প্রকাশনা, ১৯৯৬, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।

এষণা ঃ নবম প্রকাশনা, ১৯৯৭, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর।

কোরক ঃ শারদ সংখ্যা, ১৪১৭।

কৌলাল ঃ অষ্টম বর্ষ, ডিসেম্বর, ২০১৮ সংখ্যা।

তবু একলব্য ঃ ১৪ বর্ষ, ১ম সংখ্য, ‘মঙ্গলকাব্য’ সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৯।

তেহাই ঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ, ২০০৯।

দণ্ডভূক্তি ঃ প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, দাঁতন, ২০১৮।

পরিকথা ঃ ‘ভারতীয় সাহিত্য’ বিশেষ সংখ্যা, বিংশতি বর্ষ, মে, ২০১৮।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ৮ই মে, ১৯৯২ সংখ্যা।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ঃ তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭০।

‘বহুবচন পত্রিকা’ ঃ ‘কানুকথা লোকমুখে’ (প্রবন্ধ), দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ১৯৯১।

রাঢ়কথা ঃ সত্যপির-সত্যনারায়ণ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৪২১।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), বৈশাখ, ১৩১২ সংখ্যা।

সৌরভ ঃ কেদারনাথ মজুমদার (সম্পা.), ময়মনসিংহ, কার্তিক, ১৩৩৪ সংখ্যা।

(ওড়িয়া পত্র-পত্রিকা)

(বর্ণানুক্রমিক)

উৎকল সাহিত্য পত্রিকা ঃ	বৈশাখ, ১৩৪৪ সংখ্যা
দৈনিক প্রজাতন্ত্র ঃ	বৈশাখ, ১৩৪৪ সংখ্যা
দৈনিক সংবাদপত্র ঃ	৩১শে জুলাই, ১৯৭৫।
সমাজ ঃ	জুন, ১৯৭৬ সংখ্যা।
সহকার ঃ	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৩২ সংখ্যা।
Orrissa Review :	May, 2017